সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৫তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১৫তম খন্ড

সূরা আন নামল
থেকে
আর রোম

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন
(১৫তম খন্ড সূরা আন নামল হতে সূরা আর রোম)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭/এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা-১২১৭
৩৮/৩ বাংলাবাজার, কম্পিউটার মার্কেট (দোতলা), স্টল নং-২১৫, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৯

১০ম সংস্করণ
শাওয়াল ১৪৩১, সেপ্টেম্বর ২০১০, আশ্বিন ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা

Bengali Translation of Tafseer
'Fi Zilalil Quran'
Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
15th Volume
(Surah An Namal to Surah Ar Rome)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director, Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street, London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Rail Gate Masjid (1st Floor), Moghbazar, Dhaka-1217
38/3 Banglabazar Computer Market (1st Floor), Stall No-215, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition 1999
10th Edition
Shawal 1431, November 2010
Price Tk. 200.00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN NO-984-8490-26-4

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ্ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আন নামল

আয়াত ৯৩ রুকু ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ① هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑤

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑥

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. ত্বা-সীন। এগুলো হচ্ছে কোরআনেরই আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব (-এর কতিপয় অংশ), ২. ঈমানদারদের জন্যে (এটা হচ্ছে) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী (গ্রন্থ), ৩. (তাদের জন্যে,) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কেয়ামত দিবসের ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। ৪. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড আমি (সুন্দর) শোভন করে রেখেছি, ফলে তারা উদ্ভ্রান্তের মতো (আপন কর্মকান্ডের চারপাশে) ঘুরে বেড়ায়; ৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব, আর পরকালেও এ লোকেরা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ৬. (হে নবী,) নিশ্চয়ই প্রবল প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাকে (এ) কোরআন দেয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরা মক্কী। সূরা শুয়ারার পরই এটা নাযিল হয়। এর বর্ণনাভংগিও সূরা শোয়ারার মতোই। সূরার আলোচ্য বিষয় একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারে স্থান পেয়েছে। একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারের মাঝখানে কেসসা-কাহিনী দ্বারা আলোচ্য বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব কেসসা-কাহিনীতে মক্কার মোশরেক গোষ্ঠী ও পূর্ববর্তী বিবিধ জাতির চরিত্রের সাদৃশ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে আল্লাহর শাশ্বত নীতি এবং ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের চিরন্তন রীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়।

অন্যান্য সকল মক্কী সূরার মতোই এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় আকীদা বিশ্বাস তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁরই এবাদাত করা, আখেরাত এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করা, ওহীর প্রতি বিশ্বাস করা, অদৃশ্য বিষয় যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তিনি ছাড়া কেউ জানে না— একথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র স্রষ্টা, জীবিকাদাতা,

নেয়ামত ও সম্পদ সম্পত্তির একমাত্র দাতা, তা বিশ্বাস করা, মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, আল্লাহ তায়ালাই যে সকল শক্তির উৎস ও মালিক এবং তাঁর ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই, একথা মেনে নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

এই সমস্ত বিষয়কে সমর্থন করা, যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে তাদের পুরস্কার এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার জন্যেই স্থানে স্থানে কেসসা কাহিনী আলোচিত হয়েছে।

সূরার ভূমিকার অংশের পর পরই হযরত মূসা (স.)-এর কাহিনীর একাংশ আলোচিত হয়েছে। কাহিনীর এ অংশের বর্ণনা দেয়ার জন্যেই কেসসাটি আলোচিত হয়েছে।

সূরায় ভূমিকায় কাহিনীর এই অংশে রয়েছে হযরত মূসার আগুন দর্শন ও আগুনের কাছে গমন, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধন ও ফেরাউনের কাছে তাকে নবী হিসেবে যাওয়ার আদেশদান। অতপর অতিদ্রুত গতিতে ফেরাউন ও তার দলবলের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টা জানানো হয়েছে। অথচ তারা সবাই নিশ্চিতভাবে জানতো যে, হযরত মূসা সত্যিই নবী। এই সত্য অস্বীকার করার শাস্তি কী, তাও তারা জানতো। 'তারা নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করলো, অথচ তাদের মন তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলো। তারা এটা করলো নিছক যুলুম ও ঔদ্ধত্য সহকারে। অতএব, দেখে নাও নৈরাজ্যবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।' পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর ব্যাপারেও মক্কার মোশরেকরা অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিলো।

হযরত মূসার কাহিনীর পর পরই এসেছে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে দেয়া আল্লাহর অসাধারণ নেয়ামতের কথা, তারপর রয়েছে পিঁপড়ে, হুদহুদ পাখি, সাবা জাতি ও তার রাণীর সাথে হযরত সোলায়মানের কাহিনী। এ সূরার মধ্যেই রয়েছে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের পাওয়া আল্লাহর নেয়ামত ও তার জন্যে তাঁর শোকরের বিবরণ। তাঁর প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান, রাজত্ব, নবুওত এবং জ্বিন ও পাখির তাঁর অনুগত হওয়া। এই সাথে এর ভেতর প্রকাশ করা হয়েছে সেই মৌলিক আকীদা ও আদর্শ, যার প্রতি প্রত্যেক নবী আহ্বান জানাতেন। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে সাবা জাতি ও তার রাণী কর্তৃক হযরত সোলায়মানের চিঠির প্রতি জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার কথা- যদিও তিনি আল্লাহর বান্দাদেরই একজন। পরিশেষে কোরায়শ কর্তৃক আল্লাহর কেতাবের বিরূপ অভ্যর্থনার কথা। কোরায়শরা নবীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর সাবা ও তার রাণী ঈমান এনেছিলো ও বশ্যতা স্বীকার করেছিলো। হযরত সোলায়মানকে যা কিছু দেয়া হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালাই তা দিয়েছিলেন, যা কিছু তার অনুগত করা হয়েছিলো আল্লাহ তায়ালাই করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু জানেন। হযরত সোলায়মানের রাজত্ব ও জ্ঞান আল্লাহর এই সীমাহীন রাজত্ব ও জ্ঞানের সমুদ্রেরই একটা বিন্দু মাত্র ছিলো।

এরপর এসেছে সামুদ জাতির সাথে হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে হযরত সালেহ ও তার পরিবারকে হত্যার ষড়যন্ত্র। তারপর দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সে জাতির বিরুদ্ধে পাল্টা ষড়যন্ত্র করেছেন, সামুদ জাতি ও তার কুচক্রীদের ধ্বংস করেছেন এবং হযরত সালেহ ও তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের রক্ষা করেছেন। .... কোরায়শও রসূল (স.)-কে হত্যা ও নির্যাতন করার জন্যে চক্রান্ত আঁটতো, যেমনটি আঁটা হতো হযরত সালেহ ও তার সাথী মোমেনদের বিরুদ্ধে।

সূরার কাহিনী অধ্যায় শেষ হয়েছে হযরত লূত ও তাঁর জাতির কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তারা হযরত লূতকে 'পবিত্র মানুষ' হওয়ার অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলো। হযরত লূত যখন তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন, তারপর তাদের কী পরিণতি হয়েছিলো, সেটা ছিলো এ সূরার সর্বশেষ কাহিনী।....... কোরায়শও তাঁর হিজরতের সামান্য আগে রসূল (স.)-কে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।

কেসসা-কাহিনী শেষ হয়ে গেলে শুরু হয়েছে উপসংহার। 'বলো, আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তায়ালা ভালো, না যাদর তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা?' ...... অতপর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানব সত্ত্বার ভেতরকার দৃশ্যসমূহ দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিশ্ব বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, জীবিকা সরবরাহকারী এবং অদৃশ্য বিষয়ে অবগত একমাত্র সত্তা মহান আল্লাহর কুশলী হাতের কৃতিত্ব। বলা হয়েছে যে, সবাইকে একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতপর তাদের কাছে কেয়ামতের একটা আলামত, কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্য এবং সেদিন কাফেরদের জন্যে যে আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা এমন এক বক্তব্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে, যা তার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। বক্তব্যটা হলো, 'আমাকে তো কেবল এই নগরীর প্রতিপালকের এবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাকে তিনি সংরক্ষিত ও সম্মানিত করেছেন, তাঁরই জন্যে সব কিছু, আর আমাকে আত্মসমর্পণকারী হবার আদেশ দেয়া হয়েছে।........ আর তোমার প্রভু তোমাদের কাজ সম্পর্কে উদাসীন নন।'

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো এলেম বা জ্ঞান। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় জিনিস, বিশেষত অদৃশ্য বিষয় ও মানুষের কাছে প্রকাশিত প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান, হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে প্রদত্ত জ্ঞান, হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পাখির ভাষার জ্ঞানদান এবং এ দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করার বিষয়টি এর আওতাভুক্ত। এ জন্যে সূরার ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাকে কোরআন শেখানো হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।' আর উপসংহারে বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে তা তারা জানে না, বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। ....' 'তোমার প্রভু যা তারা গোপন করে ও প্রকাশ করে তা জানেন।' .... সবার শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবেন, তখন তোমরা তা জানবে।' হযরত সোলায়মানের কাহিনীতে বলা হয়েছে, 'দাউদ ও সোলায়মানকে আমি জ্ঞান দান করেছি....... ' হযরত সোলায়মানের উক্তি! 'হে মানবসকল, আমাদের পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে।' অনুরূপভাবে হুদহুদের উক্তিতে আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ' যিনি আসমান ও যমীনের সকল গোপন বস্তু বের করে আনেন এবং তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো তা জানেন।' আর যখন হযরত সোলায়মান সাবার রাণীর সিংহাসন হাযির করতে চান, তখন একটি জ্বিন জাতীয় দানব সে সিংহাসনকে চোখের পলকে হাযির করতে পারলো না, 'বরং আল্লাহ তায়ালা কেতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে' এমন একজন জ্বিনই ওটা চোখের পলকে হাযির করতে পারলো।

এভাবে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা প্রসংগে জ্ঞানেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং সমগ্র সূরা এই আবহের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। আর এটা অগ্রসর হয়েছে আমাদের ইতিপূর্বে প্রদত্ত ধারাক্রম অনুসারেই। এবার বিস্তারিত তাফসীর আলোচনার পালা।

তাফসীর

আয়াত ১-৬

'ত-সীন', এই অক্ষরগুলোর উদ্ধৃতি দেয়ার উদ্দেশ্য হলো এই সূরা ও সমগ্র কোরাআন যে মূল উপাদান দিয়ে রচিত, সেই আরবী বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ বর্ণমালা দিয়ে পুস্তক রচনা করার সুযোগ সকল আরবী ভাষাভাষীরই ছিলো, কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্তেও কেউ এই কোরআনের মতো কোনো পুস্তক রচনা করতে পারেনি।

এই দৃষ্টি আকর্ষণের পরই কোরআন সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে,

'এগুলো হচ্ছে কোরআন ও একটা সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।' (আয়াত-১)

এখানে 'কেতাব' বা গ্রন্থ বলে খোদ কোরআনকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআনকে 'কেতাব' বলে আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, এ দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কেতাবকে মোশরেকরা যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং সাবার রাণী ও তার জাতি হযরত সোলায়মানের 'কেতাব' (বিধি)-কে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, এই দুই অর্ভথ্যনার বৈপরীত্য স্পষ্ট করে দেখাতে চেষ্টা করা হবে। হযরত সোলায়মান আল্লাহর এক বান্দা হওয়া সত্তেও তার বিধি পড়ে সাবার রাণী ও তার জাতি ইসলাম গ্রহণ করে।

কোরআন থেকে হেদায়াতপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত

পরবর্তী আয়াতে কোরআন বা কেতাবকে বিশেষিত করা হচ্ছে এই বলে, 'ঈমানদারদের জন্যে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ।' (আয়াত-২)

এ কথাটা 'এতে রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ' বলার চেয়েও তাৎপর্যবহ। এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে, তা স্বয়ং কোরআনকেই মোমেনদের জন্যে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদে পরিণত করছে। অর্থাৎ কোরআনে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ রয়েছে- তা নয়, বরং খোদ কোরআনই ঈমানদারদের জন্যে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ। কেননা কোরআন ঈমানদারদের প্রত্যেক পথে ও প্রত্যেক পথের মোড়ে দিকনির্দেশনা দেয়। অনুরূপভাবে সে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় সুসংবাদ দান করে।

পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্যে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করার মধ্যে একটা গভীর এবং বিরাট রহস্য রয়েছে। সেটা এই যে, কোরআন কোনো তাত্বিক বা ফলিত বিদ্যার গ্রন্থ নয় যে, যে কেউ তা অধ্যয়ন করলেই উপকৃত হবে; বরং কোরআন হচ্ছে এমন এক পুস্তক, যা সর্বপ্রথম মানুষের হৃদয়কে সম্বোধন করে এবং একমাত্র সেই মুক্ত হৃদয়কেই সে তার দীপ্তি ও সৌরভ বিতরণ করে, যা বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে তাকে গ্রহণ করে। হৃদয় যতোই ঈমানী রসে সিক্ত হবে, ততোই তা বেশী করে কোরআনের স্বাদ লাভ করবে, তার সেই সুগভীর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করবে, যা কোনো নীরস ও প্রত্যয়হীন হৃদয় উপলব্ধি করতে পারে না, তার জ্যোতি থেকে সে এতো দিকনির্দেশনা পাবে, যা কোনো বেঈমান ও অবিশ্বাসী হৃদয় পায় না এবং এর সাহচর্য থেকে এতো উপকার পাবে, যা কোনো বিকৃতমনা ও বিবেকবেচা ব্যক্তি পায় না।

মানুষ দ্রুততার সাথে উদাসীনভাবে কোরআনের কোনো আয়াত বা সূরা বহুবার পড়া সত্তেও দেখা যায় তার ভেতরে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু এক সময়ে আকস্মিকভাবে তার হৃদয়ে আলোগুলো জ্বলে ওঠে। ফলে তার সামনে এমন বহু অভিনব জগত উদ্ভাসিত হয়, যা একটু আগেও তার কল্পনায় আসেনি। সেই আলো তার জীবনে অলৌকিকভাবে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। সেই আলো তাকে এক মতবাদ থেকে আরেক মতবাদে এবং এক জীবন ব্যবস্থা থেকে আর এক জীবন ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত করে।

কোরআনে যতো আইন, বিধান ও নীতিপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে সবেরই সর্বপ্রথম ভিত্তি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই, যে ব্যক্তি কোরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী বলে গ্রহণ করে না এবং কোরআনে যা কিছু বিধান আছে তাকে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত বিধানরূপে বিশ্বাস করে না। সেই কোরআন দ্বারা যথোচিতভাবে পথনির্দেশনা বা হেদায়াত লাভ করে না এবং এর সুসংবাদগুলোকে যথার্থ সুসংবাদ মনে করে না।

পবিত্র কোরআনে হেদায়াত বা পথনির্দেশনা তত্ত্ব ও তথ্য, আদেশ ও নিষেধের বিরাট ভান্ডার রয়েছে। একমাত্র ঈমানই এই ভান্ডারের চাবি। কোরআনের ভান্ডারগুলো ঈমানের চাবি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে খোলা যায় না। যারা সত্যিকার ঈমান এনেছে, তারা এই কোরআন দিয়ে বহু অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কোরআন যখন থেকে নিছক সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করা শুরু হয়েছে, তখন থেকে তা শুধু কান পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়, হৃদয় পর্যন্ত আর পৌঁছে না। এখন আর কোরআন থেকে কেউ উপকৃত হয় না এবং কোরআন দিয়ে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয় না। কেননা কোরআন এখন এমন একটা ভান্ডার হিসেবে রয়ে গেছে, যা খোলার জন্যে কোনো চাবি নেই।

পরবর্তী আয়াতে সেসব মোমেনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যারা কোরআনকে হেদায়াত ও সুসংবাদের উৎস হিসাবে মেনে নেয়।

'যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করে।' (আয়াত-৩)

নামায কায়েম করার অর্থ যথোচিতভাবে নামায আদায় করা, নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত মনে করে একাগ্র চিত্তে নামায পড়া। 'যাকাত দেয়।' অর্থাৎ যাকাত দিয়ে মনকে কৃপণতার নোংরামি থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে, অর্থ সম্পদের মোহ ও আসক্তি থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দেয়, আল্লাহর দেয়া সম্পদের কিছুটা দান করে নিজের দ্বীনী ভাইদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং তারা যে ইসলামী সমাজের সদস্য, সেই ইসলামী সমাজের প্রাপ্য পরিশোধ করে।

'এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আখেরাতের প্রতি কারো বিশ্বাস থাকলে সেখানে হিসাবের চিন্তায় মন অস্থির ও উদ্বিগ্ন থাকবে, প্রবৃত্তির লালসা থেকে নিবৃত্ত থাকবে, মন আল্লাহর ভয়ে কম্পিত থাকবে এবং তাঁর সামনে অবাধ্য ও নাফরমান বান্দার মতো জীবন যাপন করতে লজ্জাবোধ হবে।

আল্লাহকে স্মরণকারী, আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনকারী, তাঁর কাছে জাববদিহি ও শাস্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, তাঁর সন্তোষ ও পুরস্কার লাভের আশা পোষণকারী এসব ঈমানদার বান্দার মনই কোরআনের হেদায়াত ও সুসংবাদ গ্রহণের জন্যে উদগ্রীব উন্মুক্ত থাকে। তাই কোরআন তাদের জন্যে হেদায়াত ও সুসংবাদ হয়ে বিরাজ করে। হৃদয়ে প্রেরণার উৎস হিসাবে অবস্থান করে, নিরন্তর সৎ ও পুণ্যময় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে পথের সম্বল হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

আখেরাতের উল্লেখ করার পর তার ওপর অধিকতর জোর দিয়ে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা হচ্ছে, 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের কাজগুলো আমি তাদের কাছে সুদৃশ্য বানিয়েছি, ফলে তারা গোমরাহীতেই লিপ্ত থাকে ..... ।' (আয়াত ৪-৫)

বস্তুত আখেরাতের প্রতি ঈমানই মানুষের প্রবৃত্তির উদ্দাম লালসা এবং অদম্য ঝোঁক নিয়ন্ত্রিত ও দমিত করে এবং জীবনে মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্য নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতে

বিশ্বাস করে না, সে নিজের প্রবৃত্তির লালসা ও ঝোঁক কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সে মনে করে, জীবনে আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসের যেটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তা আর ফিরে নাও আসতে পারে। সুতরাং লালসা চরিতার্থ করার এ সুযোগ কেনই বা হাতছাড়া করবো? তাকে যে আল্লাহর কাছে দাঁড়িয়ে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে, সে চিন্তা তার মাথায়ই আসে না। কেয়ামতের দিনের কোনো হিসাব নিকাশ ও কর্মফলের আশা বা আশংকা সে করেই না।

এ জন্যেই আখেরাতে অবিশ্বাসীর কাছে প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার প্রতিটি কাজই সুন্দর ও চমকপ্রদ মনে হয়। তাই এ ধরনের কাজ করতে কোনো ভয় বা লজ্জাই তাকে বাধাগ্রস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত করে না। প্রবৃত্তির স্বভাবই এই যে, যা মজাদার ও আরামদায়ক, তা তার কাছে ভালো লাগে এবং তা সে ভালোবাসে। তবে যে মুহূর্তে সে আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর আয়াতসমূহ দ্বারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই মুহূর্ত থেকেই সে অন্য ধরনের কাজকর্মে স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করতে আরম্ভ করে এবং তার সামনে দৈহিক ও ঐন্দ্রিক স্বাদ আনন্দের কাজগুলো খুবই তুচ্ছ ঘৃণ্য মনে হতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যদি তা হেদায়াতের সাক্ষ্য প্রমাণগুলোকে সাবলীলভাবে গ্রহণ করে তাহলে তা হেদায়াত লাভে সক্ষম হয়। আর যদি তার উপলব্ধি ও গ্রহণ ক্ষমতা কোনো কারণে বিকল থাকে, তাহলে তা বিপথগামী হবার যোগ্য হয়। আর যে বিধান অনুসারে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তদনুসারে হেদায়াত ও গোমরাহী উভয় অবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর হয়ে থাকে। এ জন্যেই আখেরাতে যারা বিশ্বাস করে না, তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে, 'তাদের কাজগুলো আমি সুদৃশ্য বানিয়েছি, ফলে তারা গোমরাহীতেই লিপ্ত আছে।' অর্থাৎ তারা ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর ইচ্ছা ও নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপ ও আবেগ অনুভূতি তাদের জন্যে ভালো এবং সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুদৃশ্য বানানোর এটাই হচ্ছে তাৎপর্য। তারা গোমরাহীতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে যায় যে, ভালো বা মন্দের বাছবিচার করার কোনো ক্ষমতা তাদের থাকে না। ফলে তারা সৎপথের সন্ধান পায় না।

মন্দ ও খারাপ কাজকে যার কাছে সুদৃশ্য এবং সুন্দর বানানো হয়, তার পরিণাম যে কি রকম, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বলা হয়েছে, 'তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আযাব .... ' এই নিকৃষ্ট আযাব দুনিয়াতেও হতে পারে, আখেরাতেও হতে পারে। আর আখেরাতের সর্বাত্মক ক্ষয়ক্ষতি তো খারাপ কাজে লিপ্ত হবারই ফল।

সূরার ভূমিকার সমাপ্তি ঘটছে আল্লাহর সেই উৎস উল্লেখের মাধ্যমে, যেখান থেকে রসূল (স.)-এর কাছে এই কোরআন নাযিল হয়েছে।

'তোমাকে কোরআন শেখানো হচ্ছে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে।'

'তোমাকে শেখানো হচ্ছে' এই কথাটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই কোরআন মহান আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, যিনি প্রতিটা কাজ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে করেন এবং প্রতিটা কাজের ব্যবস্থাপনা করেন বিজ্ঞতার সাথে। তাঁর সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান (এলেম ও হেকমত) এই কোরআন ও কোরআনের আনীত জীবন বিধান এবং আইন কানুনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে এর বিষয়বস্তুর চমৎকার সমন্বয় থেকে। এরপর শুরু হয়েছে কেসসা কাহিনীর পালা, যা আল্লাহর জ্ঞান কুশলতার ও সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন। (আয়াত ৭-১৪)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝٧ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝١٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝١٢ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا

৭. (স্মরণ করো,) যখন মূসা তার পরিবারের লোকজনদের বলেছিলো, অবশ্যই আমি আগুন (সদৃশ কিছু) দেখতে পেয়েছি; সেখান থেকে আমি এক্ষুণি তোমাদের কাছে হয় (পথঘাটের ব্যাপারে) কোনো খোঁজ খবর কিংবা (তোমাদের জন্যে) একটি অংগার নিয়ে আসবো, যাতে করে তোমরা (এ ঠান্ডার সময়) আগুন পোহাতে পারো। ৮. অতপর সে যখন (আগুনের) কাছে পৌঁছুলো, তখন তাকে (অদৃশ্য থেকে) আওয়ায দেয়া হলো, বরকতময় হোক সে (নূর), যা এ আগুনের ভেতর (আলোকিত হয়ে) আছে, বরকতময় হোক সে (মানুষ) যে এর আশেপাশে রয়েছে; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা কতো পবিত্র প্রশংসিত। ৯. (আওয়ায এলো,) হে মূসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ১০. হে মূসা, তুমি তোমার (হাতের) লাঠিটা (যমীনে) নিক্ষেপ করো; অতপর সে যখন তাকে দেখলো, তা যমীনে (জীবিত) সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, তখন সে (কিছুটা ভীত হয়ে) উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগলো, পেছনের দিকে ফিরেও তাকালো না (তখন আমি বললাম); হে মূসা (ভয় পেয়ো না), আমার সামনে (নবী) রসূলরা কখনো ভয় পায় না, ১১. হ্যাঁ, (যদি) কেউ কখনো কোনো অন্যায় করে (তাহলে তা ভিন্ন কথা), অতপর সে যদি অন্যায়ের পর তার বদলে (পুনরায়) নেক আমল করে, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাত দুটো তোমার জামার (বুক) পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দাও, (বের করে আনলে দেখবে) কোনো রকম দোষত্রুটি ব্যতিরেকেই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। (এ মোজেযাগুলো সে) নয়টি নিদর্শনেরই অন্তর্গত, যা ফেরাউন ও তার জাতির জন্যে আমি (মূসার সাথে) পাঠিয়েছিলাম; ওরা অবশ্যই ছিলো একটি গুনাহগার জাতি। ১৩. অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ হাযির হলো তখন

مُبۡصِرَةً قَالُوۡا هٰذَا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۳﴾ وَجَحَدُوۡا بِهَا وَاسۡتَیۡقَنَتۡهَاۤ اَنۡفُسُهُمۡ

ظُلۡمًا وَّعُلُوًّا ؕ فَانۡظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُفۡسِدِیۡنَ ﴿۱۴﴾

তারা বললো, এ তো হচ্ছে স্পষ্ট যাদু, ১৪. তারা যুলুম ও ঔদ্ধত্যের কারণে তার সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এসব (নিদর্শন) সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলো; অতপর (হে নবী), তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কি পরিণাম হয়েছিলো!

আয়াত ৭-১৪

হযরত মূসার কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত অংশটা 'তোমাকে কোরআন শেখানো হচ্ছে .... ' এই বক্তব্যটার পরে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ দ্বারা প্রকারান্তরে রসূল (স.)-কে বলা হচ্ছে যে, তোমাকেই প্রথম শেখানো হচ্ছে না, ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কেও শেখানো হয়েছে এবং তাকে ফেরাউনের কাছে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আর তোমার জাতি যে তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে সেটাও নতুন নয়। হযরত মূসা (আ.)-এর জাতিও তাকে সত্যবাদী বলে বুঝতে পেরেও নিছক একগুঁয়েমি ও হঠকারিতাবশে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। 'অতএব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো দেখো।' অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের কী পরিণতি হয় তা দেখার জন্যে তোমার জাতি একটু অপেক্ষা করুক।

মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কথপোকথন

'যখন মূসা তার পরিবারকে বললো, আমি আগুন দেখেছি, আমি শিগগিরই তোমাদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো খবর নিয়ে আসবো...........'। *(আয়াত-৭)*

সূরা ত্ব-হাতে এই অংশটা এসেছে। সেখানে এই অংশটাকে হযরত মূসার মাদইয়ান থেকে মিসর প্রত্যাবর্তনের সময়কার ব্যাপার বলা হয়েছে। তখন তাঁর স্ত্রী হযরত শোয়ায়বের কন্যা তাঁর সাথে ছিলেন।(১) এক হিমেল অন্ধকারময় রাতে তারা চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এটা প্রমাণিত হয় তাঁর এ উক্তি থেকে, 'আমি শিগগিরই সে আগুনের জায়গা থেকে তোমাদের জন্যে কোনো খবর আনতে পারবো, অথবা তোমাদের জন্যে কোনো জ্বলন্ত অংগার আনতে পারবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।' এই আগুনটা তূর পর্বতের দিকে দেখা যাচ্ছিলো। তৎকালে নৈশকালীন পথচারীদের পথের সন্ধান দেয়ার উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে উঁচু টিবির ওপর আগুন জ্বালানো হতো। আগুন দেখে পথচারীরা আগুনের কাছে আসতো এবং সেখানে আগুন পোহায়ে খানিকটা চাংগা হতো, কিছুটা আপ্যায়নও পেতো অথবা পথের সন্ধান পেতো।

'আমি আগুন দেখেছি,' এটা হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি। তিনি দূর থেকে আগুন দেখেছিলেন এবং এই ভেবে আশান্বিত হয়েছিলেন যে, ওখানে গেলে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে, নিদেনপক্ষে দু'এক টুকরো জ্বলন্ত অংগার তো নিয়ে আসা যাবে, যা দ্বারা মরুভূমিতে এই গভীর রাতে আগুন পোহায়ে তার পরিবার পরিজন চাংগা হতে পারবে। অতপর হযরত মূসা (আ.) যে

(১) এখানে এই মর্মে কোনো অকাট্য উক্তি নেই যে, হযরত শোয়ায়েই সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, যার চাকুরি করে হযরত মূসা তার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, তবে কেননা কোরআনের যেখানেই হযরত শোয়ায়েবের কিসসা আসে, সেখানে তার পরই হযরত মূসার কিসসা বর্ণিত হয়। এ থেকে মনে হয়, তাঁরা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন, কিংবা হযরত শোয়ায়েবের পরেই হযরত মূসা নবী হয়েছিলেন।

আগুন দেখেছেন সেদিকে এগিয়ে গেলেন কোনো খবর পাওয়ার আশায়, কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্রই সর্বোচ্চ মহিমাময়ের আওয়ায শুনতে পেলেন। আগুনের কাছে আসামাত্রই মূসাকে ডেকে বলা হলো, 'আগুনের ভেতরে ও আশপাশে যারা আছে, তাদের সকলের কল্যাণ হোক এবং বিশ্বজাহানের প্রভু মহিমান্বিত ও পবিত্র।'

এটা সেই ডাক, যার প্রতি সমগ্র প্রকৃতি সাড়া দেয়, সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী যার সাথে একাত্ম হয়, সমগ্র সৃষ্টিজগত যার প্রতি বিনয়াবনত হয় এবং যে ডাকে প্রত্যেকের অন্তরাত্মা ও বিবেক শিহরিত রোমাঞ্চিত হয়। এটা সেই ডাক, যার মাধ্যমে আকাশ পৃথিবীর সাথে একাত্ম হয়, ক্ষুদ্র কণাও তার মহান স্রষ্টার আহ্বান লাভ করে এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহে দুর্বল ও মরণশীল মানুষ তাঁর সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হবার মতো মর্যাদায় উন্নীত হয়।

'আগুনের কাছে আসামাত্রই মূসাকে ডেকে বলা হলো' ক্রিয়ার কর্তা সুপরিচিত হওয়া সত্তেও তা উহ্য রাখা হয়েছে। যিনি ডেকে বলছেন সেই মহান সত্ত্বার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই এর উদ্দেশ্য।'

'ডেকে বলা হলো যে, আগুনের ভেতরে ও আশেপাশে অবস্থানকারীর কল্যাণ হোক।'

প্রশ্ন হলো, আগুনের ভেতরে ও আশেপাশে কে অবস্থান করছিলো? সর্বাধিক অগ্রগণ্য মত এই যে, আমরা সচরাচর যে আগুন জ্বালাই, সে আগুন তা ছিলো না। বরঞ্চ ওটা ছিলো মানব জাতির দুনিয়া আখেরাতের সর্ববৃহৎ ও সর্বময় কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহর ফেরেশতাদের জ্বালানো আগুন। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতারাই ছিলেন সে আগুনের প্রজ্বলনকারী। এটা পার্থিব আগুনের মতো দেখা যাচ্ছিলো এবং পবিত্র আত্মা ফেরেশতারাই তার ভেতরে ছিলেন। আর পাশে ছিলেন হযরত মূসা। 'কল্যাণ হোক' কথাটার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বরকত ও কল্যাণের ধারা ফেরেশতা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর বর্ষণের ঘোষণা দেয়া হলো। আর সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি এই মহান দানকে লিপিবদ্ধ করে রাখলো। সেই থেকে এই পুণ্যময় ভূখন্ডটা প্রকৃতির খাতায় কল্যাণময় ও পবিত্র ভূখন্ড হিসেবে লিখিত হয়ে রইলো। আল্লাহর জ্যোতি তার ওপর বিচ্ছুরিত হতে থাকলো এবং তা সর্বোচ্চ কল্যাণ ও বরকতের আধার হয়ে বিরাজ করতে লাগলো।

সমগ্র সৃষ্টিজগত মহান আল্লাহর অবশিষ্ট ঘোষণাটা শুনলো, 'আর বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র। হে মূসা, ওই ঘোষণাদানকারী আমি, মহাপরাক্রমশালী মহাকুশলী আল্লাহ।'

আল্লাহ নিজ সত্ত্বাকে যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত ও নিজেকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রভু ঘোষণা করলেন এবং তার বান্দাকে জানালেন, যে গায়েবী আওয়ায তুমি শুনতে পাচ্ছো ওটা মহান আল্লাহরই আওযায। এখানে সমগ্র মানব জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠলো সেই মহমান্বিত ও জ্যোতির্ময় প্রেক্ষাপটে। হযরত মূসা (আ.) যে আগুন দেখেছিলেন তার কাছে গিয়ে খবর একটা পেলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ খবর। অঙ্গার একটা পেলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিলো সরল সোজা ও সত্য পথের সন্ধানদানকারী হেদায়াতের মশাল। যে আওয়াযটা শোনা গিয়েছিলো তা ছিলো হযরত মূসা (আ.)-কে নবীরূপে বরণ করে নেয়ার ঘোষণা। আর এই বরণ করার উদ্দেশ্য ছিলো হেদায়াতের বাণীসহ সেকালের পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাচারী রাজার কাছে তাঁকে প্রেরণ করা। তাই তাঁর প্রতিপালক তাঁকে প্রস্তুত করতে এবং শক্তি সাহস যোগাতে শুরু করলেন,

'আর তুমি তোমার লাঠিটা ছুঁড়ে মারো।'

এখানে ঘটনাটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। সূরা ত্ব-হাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর যে দীর্ঘ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা এখানে করা হয়নি। কেননা যে শিক্ষাটা দেয়া এখানে উদ্দেশ্যে, তা হলো, হযরত মূসাকে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দায়িত্বের শিক্ষা দান। 'যখন মূসা লাঠিকে সাপের মতো ছুটাছুটি করতে দেখলো, তখন পেছন ফিরে পালালো, ফিরেও তাকালো না।'

আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত মূসা (আ.) লাঠি ছুঁড়ে মারতেই তা 'জান' নামক ক্ষুদ্রাকৃতির অথচ দ্রুতগামী সাপের ন্যায় জোরে জোরে দৌড়াতে লাগলো। হযরত মূসা ছিলেন কিছুটা ভীরু স্বভাবের। তাই তিনি অভাবিত এই আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেলেন এবং সাপ থেকে এমনভাবে দূরে ছুটতে লাগলেন যেন ফিরে আসার চিন্তাও করছেন না। এটা এমন এক ধরনের আচরণ, যা হযরত মূসা (আ.)-এর স্বভাবের লোকদের মধ্যে প্রচন্ড আকস্মিক আতংক ফুটিয়ে তোলে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-কে আশ্বস্ত করার জন্যে সম্বোধন করলেন এবং তাকে অচিরেই যে দায়িত্ব দেয়া হবে, তার প্রকৃতি জানিয়ে দিলেন, 'হে মূসা, ভয় পেয়ো না। আমার কাছে রসূলরা ভয় পায় না।'

অর্থাৎ ভয় পেয়ো না। কারণ তুমি রসূল। আর রসূলরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পায় না।

'কিন্তু শুধু তারা, যারা অন্যায় করেছে, অতপর খারাপের পর ভালো কাজ দিয়ে তা পরিবর্তন করেছে। আমি তাদের জন্যে ক্ষমাশীল দয়ালু।' অর্থাৎ ভয় পায় শুধু তারাই যারা অন্যায় করেছে, আর অন্যায় অত্যাচারের পর ভালো কাজ করেছে, অত্যাচারকে সুবিচারে, শেরেককে ঈমানে এবং অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করেছে, তাদের জন্যে আমার ক্ষমা ও দয়া সুপ্রশস্ত।

এবার হযরত মূসা (আ.) কিছুটা আশ্বস্ত ও শান্ত হলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাকে দ্বিতীয় মোজেযা দিয়ে প্রস্তুত করলেন, কিন্তু তখনো তিনি হযরত মূসাকে জানাননি কোথায় গিয়ে তাকে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। দ্বিতীয় মোজেযাটা ছিলো,

'তোমার হাত তোমার পকেটে ঢুকাও, (দেখবে) হাত সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু সেটা কোনো অশুভ ব্যাপার হবে না।'

সত্যিই এরূপ ঘটেছিলো। হযরত মূসা (আ.) তার হাত পকেটে ঢুকালেন। অমনি হাত সাদা হয়ে বেরুলো। এটা কোনো রোগব্যাধির কারণে হয়নি। এটা ছিলো একটা মোজেযা। এ ধরনের নয়টা মোজেযা দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করবেন বলে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই নয়টার মধ্য হতে দুটো হলো অলৌকিক লাঠি এবং হাত। এই পর্যায়ে আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে কী উদ্দেশ্যে ডেকেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন, তা জানালেন।

'নয়টা মোজেযার অন্যতম যা ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠানো হয়েছিলো, সে দুটো ছিলো মূসা (আ.)-এর লাঠি ও তার শুভ্র হাত। এ দুটো মোজেযাসহ তাতে পাঠাতে ফেরাউন ও তার জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে বলে দেয়া হলো,। তারা ফাসেক গোষ্ঠী।'

এখানে অবশিষ্ট সাতটা মোজেযার উল্লেখ করা হয়নি, সূরা আরাফে করা হয়েছে। সেগুলো হলো, দুর্ভিক্ষ, ফসলহানি, বন্যা, পংগপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। এখানে সে সাতটার উল্লেখ না করার কারণ এই যে, এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্য শুধু মোজেযার শক্তি, স্পষ্টতা ও ফেরাউনের গোষ্ঠী কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যানের বিবরণদান।

'অতপর যখন আমার নিদর্শনগুলো আসলো, তখন তারা বললো, এ তো হচ্ছে প্রকাশ্য যাদু। (আয়াত ১৩ ও ১৪)

এই মোজেযাগুলো এতো স্পষ্ট ও সত্য উদঘাটক ছিলো যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই তা দেখতে পেতো। এই নিদর্শনগুলো নিজেকে 'প্রদর্শনকারী' বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা এগুলো মানুষকে পথ প্রদর্শন ও হেদায়াতের দিকে আকৃষ্ট করতো। তথাপি তারা বললো, 'এটা তো প্রকাশ্য যাদু।' এ কথাটা তারা নিশ্চিত হয়ে বা সন্দেহের বশে নয়, বরং 'হঠকারিতা ও যুলুম'বশত বলতো, অথচ তাদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, এগুলো সত্য। 'তাদের মন এগুলোকে সত্য বলে জানতো।' তাহলে তারা কেন বললো, বললো নিছক হঠকারিতা ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত। কারণ তারা ঈমান আনতেই চায়নি, তাই তারা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণেরও দাবী জানায়নি। কারণ তারা নিজেদের সত্যের ঊর্ধ্বে মনে করতো এবং এভাবে সত্যের প্রতি ও নিজেদের প্রতি যুলুম করতো।

কোরায়শ নেতারাও কোরআনকে এভাবেই গ্রহণ করতো। একে নিশ্চিতভাবে সত্য জেনেও অস্বীকার করতো এবং রসূল (স.) তাদের এক আল্লাহর এবাদাতের যে দাওয়াত দিতেন, তাও প্রত্যাখ্যান করতো। কারণ যে সমাজ ব্যবস্থার অধীন তারা জীবন যাপন করতো এবং যেসব কায়েমী স্বার্থ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো, সেগুলোকে তারা তাদের জীবনদর্শন অনুসারে টিকিয়ে রাখতে চাইতো। এই সমাজ ব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থ সবটাই টিকেছিলো বাতিল আকীদা বিশ্বাসের ওপর। তাই ইসলামী দাওয়াতের ফলে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে তারা আশংকা করতো। তাদের পায়ের নীচের মাটি কাঁপছে বলে তারা অনুভব করতো। তাদের বিবেক প্রবলভাবে আলোড়িত হতো এবং সুস্পষ্ট সত্যের হাতুড়ি ভিত্তিহীন বাতিলকে ভেংগে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়ার উপক্রম করতো।

সত্য অস্বীকারকারীরা তা এ জন্যে অস্বীকার করে না যে, তারা একে চেনে না; বরং সত্যকে চেনে বলেই অস্বীকার করে। সত্য সম্পর্কে তাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকার কারণেই তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। কেননা তারা এতে নিজেদের ও নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা এবং কায়েমী স্বার্থের নিশ্চিত ধ্বংস দেখতে পেতো। তাই তারা চরম হঠকারিতার সাথে সত্য প্রতিহত করতে সচেষ্ট হতো, যা সুস্পষ্ট ও অকাট্য।

'অতএব দেখে নাও। নৈরাজ্যবাদীদের কী পরিণতি হয়।'

ফেরাউন ও তার জাতির পরিণতি সুবিদিত। কোরআনের অন্যান্য সূরায় তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শুধু ইংগিত করেই ক্ষান্ত থেকেছে। হয়তো এটুকুই ইসলাম অস্বীকারকারীদের চেতনা সঞ্চারে যথেষ্ট হবে। ফেরাউনের ও তার সাংগ-পাংগদের ধ্বংসের পরিণতি হয়তোবা নব্য নৈরাজ্যবাদীদের একই পরিণতির সম্মুখীন হবার আগে সচকিত করে তুলতে সক্ষম হবে। (আয়াত ১৫ -৪৪)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى

كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ

الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ

ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ

بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى

রুকু ২

১৫. আমি অবশ্যই দাউদ এবং সোলায়মানকে (দ্বীন দুনিয়ার) জ্ঞান দান করেছিলাম; তারা উভয়েই বললো, যাবতীয় তারীফ আল্লাহ তায়ালার, যিনি তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৬. (দাউদের মৃত্যুর পর) সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো, (উত্তরাধিকার পেয়ে) সে (তার জনগণকে) বললো, হে মানুষরা, আমাদেরকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পাখীদের বুলি (পর্যন্ত) শেখানো হয়েছে, (এ ছাড়াও) আমাদেরকে (দুনিয়ার) প্রতিটি জিনিসই দেয়া হয়েছে; এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার এক) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। ১৭. সোলায়মানের (সেবার) জন্যে মানুষ, জ্বিন ও পাখীদের মধ্য থেকে এক (বিশাল) বাহিনী সমবেত করা হয়েছিলো, এরা আবার বিভিন্ন ব্যূহে সুবিন্যস্ত ছিলো। ১৮. (সোলায়মান একবার অভিযানে বের হলো,) তারা যখন পিপীলিকা (অধ্যুষিত) উপত্যকায় পৌঁছালো, তখন একটি স্ত্রী পিপীলিকা (তার স্বজনদের) বললো, হে পিপীলিকার দল, তোমরা (দ্রুত) নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো, (দেখো) এমন যেন না হয়, সোলায়মান ও তার বাহিনী নিজেদের অজান্তে তোমাদের পায়ের নীচে পিষে ফেলবে। ১৯. তার কথা শুনে সোলায়মান একটু মৃদু হাসি হাসলো এবং বললো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে তাওফীক দাও যাতে করে (এ পিপীলিকাটির ব্যাপারেও আমি অমনোযোগী না হই এবং) আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যেসব নেয়ামত দান করেছো, আমি যেন (বিনয়ের সাথে) তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, আমি যেন এমন সব নেক কাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো, (অতপর) তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। ২০. (একবার) সে তার পাখী (বাহিনী) পর্যবেক্ষণ (করতে শুরু) করলো এবং (এক পর্যায়ে) বললো (কি ব্যাপার),

الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ

لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ

بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً

تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ সাজদা قَالَ سَنَنْظُرُ

أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ

'হুদহুদ' (নামক পাখীটা) দেখছি না যে! অথবা সে কি (আজ সত্যিই) অনুপস্থিত? ২১. হয় সে (এই অনুপস্থিতির) কোনো পরিষ্কার ও সংঘত কারণ নিয়ে আমার কাছে হাযির হবে, না হয় তাকে আমি (অবহেলার জন্যে) কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা (বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে) তাকে আমি হত্যাই করে ফেলবো। ২২. (এ খোঁজাখুঁজির পর) বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, সে (পাখীটি ছুটে এসে) বললো (হে বাদশাহ), আমি এমন এক খবর জেনেছি, যা তুমি এখনো অবগত হওনি, আমি তোমার কাছে 'সাবা' (জাতি)-র একটি নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি (আমার অনুপস্থিতির এ হচ্ছে কারণ)। ২৩. আমি সেখানে এক রমণীকে দেখেছি, তাদের ওপর সে রাজত্ব করছে (দেখে মনে হলো), তাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি জিনিসই (বুঝি) দেয়া হয়েছে, (তদুপরি) তার কাছে আছে বিরাট এক সিংহাসন। ২৪. আমি তাকে এবং তার জাতিকে (এমন অবস্থায়) পেলাম যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে সূর্যকে সাজদা করছে, (মূলত) শয়তান তাদের (এসব পার্থিব) কর্মকান্ড তাদের জন্যে শোভন করে রেখেছে এবং সে তাদের (সৎ) পথ থেকেও নিবৃত্ত করেছে, ফলে ওরা হেদায়াত লাভ করতে পারছে না, ২৫. (শয়তান তাদের বাধা দিয়েছে,) যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করতে না পারে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (উদ্ভিদসহ সব) গোপন জিনিস বের করে আনেন, (তিনি জানেন) তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো। ২৬. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের অধিপতি। ২৭. (এটা শুনে) সে বললো, হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি দেখছি, তুমি কি সত্য কথা বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন! ২৮. তুমি আমার এ চিঠি নিয়ে যাও, এটা

تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ

তাদের কাছে ফেলে আসো, তারপর তাদের কাছ থেকে (কিছুক্ষণের জন্যে) সরে থেকো, অতপর তুমি দেখো তারা কি উত্তর দেয়? ২৯. (সোলায়মানের চিঠি পেয়ে সাবা জাতির) মহিলা (সম্রাজ্ঞী পারিষদদের ডেকে) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে, ৩০. তা (এসেছে) সোলায়মানের কাছ থেকে এবং তা (লেখা হয়েছে) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে, ৩১. (চিঠির বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আমার অবাধ্যতা করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা আমার কাছে হাযির হও।

রুকু ৩

৩২. (চিঠি পড়ে) সে (রাণী) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার (এ) বিষয়ে তোমরা আমাকে একটা অভিমত দাও, আমি তো কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত কোনো আদেশ দেই না, যতোক্ষণ না তোমরা (সে সিদ্ধান্তের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদান না করো। ৩৩. তারা বললো (একথা ঠিক), আমরা অনেক শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু (তারপরও সোলায়মানের সাথে বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণের (চূড়ান্ত) ক্ষমতা তো তোমারই হাতে, অতএব চিন্তা করে দেখো, (এ পরিস্থিতিতে) তুমি আমাদের কি আদেশ দেবে? ৩৪. সে (রাণী) বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে (বিজয়ীর বেশে) প্রবেশ করে তখন তা তছনছ করে দেয়, সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে ছাড়ে, আর এরাও (হয়তো) তাই করবে। ৩৫. আমি বরং (সরাসরি হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই না বলে) তার কাছে কিছু তোহফা পাঠিয়ে দেখি দূতেরা কি (জবাব) নিয়ে আসে! ৩৬. সে (দূত হাদিয়া নিয়ে) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তখন সে বললো, তোমরা কি এ ধন সম্পদ (পাঠিয়ে তা) দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? (অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আমাকে দিয়েছেন তা (তিনি) তোমাদের যা দিয়েছেন তার তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট,

بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا

قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا

اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ

الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ

يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ

لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ

رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ

الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

তোমরা তোমাদের এ উপঢৌকন নিয়ে এতোই উৎফুল্লবোধ করছো! ৩৭. তোমরা (বরং এগুলো নিয়ে) তাদের কাছেই ফিরে যাও (যারা তোমাদের পাঠিয়েছে এবং গিয়ে তাদের বলো), আমি অবশ্যই ওদের মোকাবেলায় এমন এক বাহিনী নিয়ে হাযির হবো, (তাদের যা আছে) তা দিয়ে যার প্রতিরোধ করার শক্তি ওদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদের সে জনপদ থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো, (পরিণামে) ওরা সবাই অপমানিত হবে। ৩৮. সে (নিজের মন্ত্রণা) পরিষদকে বললো, হে আমার পারিষদরা, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার আগেই তার (গোটা) সিংহাসন আমার কাছে (তুলে) নিয়ে আসতে পারে এমন কে (এখানে) আছে ? ৩৯. বিশাল (বপুবিশিষ্ট) এক জ্বিন দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা বর্তমান স্থান থেকে উঠবার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো, এ বিষয়ের ওপর আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ক্ষমতাবান। ৪০. আরেক জ্বিন– যার কাছে আল্লাহ তায়ালার কেতাবের (কিছু বিশেষ) জ্ঞান ছিলো, (দাঁড়িয়ে) বললো (হে বাদশাহ), তোমার চোখের (পরবর্তি) পলক তোমার দিকে ফেলার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো; (কথা শেষ না হতেই) সে যখন দেখলো– তা (সিংহাসন সব কিছুসহ) তার সামনেই দাঁড়ানো, তখন সে বললো, এ তো হচ্ছে (আসলেই) আমার মালিকের অনুগ্রহ; এর মাধ্যমে তিনি আমার পরীক্ষা নিতে চান (এর মাধ্যমে তিনি দেখতে চান), আমি কি শোকর আদায় করি, না না-শোকরী করি; (মূলত) যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে (তো) করে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (তা) প্রত্যাখ্যান করে (সে যেন জেনে রাখে), তোমার মালিক সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত ও একান্ত মহানুভব। ৪১. সে বললো, তোমরা (এবার) তার সিংহাসনের আকৃতিটা একটু বদলে দাও, আমরা দেখি সে সত্যিই তা টের পায় কিনা, না সেও তাদের দলে শামিল হয়ে যায়, যারা পথের দিশা পায় না।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

৪২. অতপর (যখন) সে (রাণী) এলো (তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো), তোমার সিংহাসন কি (দেখতে) এমন ধরনের (ছিলো)? সে বললো হ্যাঁ, (মনে হয়) এ ধরনেরই (ছিলো, আসলে) এ ঘটনার আগেই আমাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে গেছে এবং আমরা (সে মর্মে) আত্মসমর্পণও করেছি। ৪৩. তাকে যে জিনিসটি (ঈমান আনতে এ যাবত) বাধা দিয়ে রেখেছিলো; তা ছিলো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যের গোলামী করা; তাই (এতো দিন পর্যন্ত) সে ছিলো কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ৪৪. (অতপর) তাকে বলা হলো, যাও, এবার প্রাসাদে প্রবেশ করো, সে যখন (প্রাসাদের আয়নাসম বারান্দা) দেখলো তখন তার মনে হলো, এ যেন (স্বচ্ছ জলাশয়) এবং (এটা মনে করেই) সে তার উভয় হাঁটু পর্যন্ত কাপড় টেনে তুলে ধরলো; (তার এ আচরণ দেখে) সে (সোলায়মান) বললো, এটি হচ্ছে স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ; সে (মহিলা) বললো, হে আমার মালিক, আমি (এতোদিন) আমার নিজের ওপর যুলুম করে এসেছি, আজ আমি (আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে) সোলায়মানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলাম।

তাফসীর

আয়াত ১৫-৪৪

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর উল্লিখিত অংশটার পর হযরত দাউদ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত ও হযরত সোলায়মান সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা হচ্ছে। এরা তিন জনই ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী। এ সূরার সূচনা হয়েছে কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে। আর পরবর্তীতে একটা আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যেসব বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত এই কোরআন বনী ইসরাঈলের কাছে তার অধিকাংশ বর্ণনা করে।'

হযরত সোলায়মানের কাহিনী এই সূরায় যতোটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ততোটা আর কোনো সূরায় হয়নি। অবশ্য এ সূরায় তার জীবনের কেবল একটা অংশই বর্ণনা করা হয়েছে। এ অংশটা হুদহুদ পাখি ও সাবার রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট। ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সোলায়মান জনসমক্ষে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পাখির ভাষা শিখিয়েছেন, সকল জিনিসের অংশ বিশেষ দান করেছেন এবং আল্লাহর এই অনুগ্রহের জন্যে তিনি তার শোকর আদায় করছেন। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে জ্বিন, মানুষ ও পাখির সমবায়ে গঠিত তাঁর বাহিনীর কথা, এক পিঁপড়ে কর্তৃক স্বজাতিকে এই বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করার কথা। হযরত সোলায়মান কর্তৃক পিঁপড়ের এই বক্তব্য অনুধাবন, আল্লাহর এই অনুগ্রহের জন্যে তাঁর শোকর আদায়, আল্লাহর দেয়া যে কোনো সম্পদই যে পরীক্ষাস্বরূপ, তা হযরত সোলায়মান কর্তৃক উপলব্ধি করণ। অতপর

হযরত সোলায়মানের এই মর্মে দোয়া যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে শোকর করার ও এই পরীক্ষায় পাস করার ক্ষমতা দান করেন।

সূরার শুরুতে কোরআনের যে প্রসংগ আলোচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে এক আয়াতে যে বলা হয়েছে, এই কোরআন বনী ঈসরাঈলের পারস্পরিক বিরোধ ও মতভেদের অধিকাংশই তাদের অবহিত করে-সেই পেক্ষাপটেই এই সূরায় এসব কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আর হযরত মূসা, দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনী যে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সে কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের এই পর্যায় ও তার পটভূমির সাথে এই সূরার আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক কী তা এই কাহিনী ও এই সূরার বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। যেমন,

সূরার ভূমিকায় আমি উল্লেখ করেছি যে, এ সূরার একটা কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে জ্ঞান, আর হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনীতেও সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞানের কথা, 'আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি।' এ ছাড়া হযরত সোলায়মান তাকে দেয়া আল্লাহর যেসব নেয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যেও সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন পাখির ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞানের কথা। তিনি বলেছেন! হে জনমন্ডলী, আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে।' আর হুদহুদ পাখি নিজের অনুপস্থিতির বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছে তারও সূচনা হয়েছে এভাবে, 'আপনি যা জানেন না, আমি তা জেনেছি এবং সাবা জাতির কাছ থেকে সুনিশ্চিত তথ্য নিয়ে আপনার কাছে হাযির হয়েছি।' আর চোখের পলকে সাবার রাণীর সিংহাসন হাযির করতে চেয়েছিলো যে জ্বিন, তারও বৈশিষ্ট্য এই যে, সে আল্লাহর কেতাবের জ্ঞান রাখতো।

সূরার শুরুতে মোশরেকদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট কেতাব কোরআন নাযিল করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। অথচ এই কেতাবকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, এই কাহিনীতে হযরত সোলায়মানের চিঠি সাবার রাণী কর্তৃক গ্রহণের এবং অনতিবিলম্বেই তার ও তার জনগণের আত্মসমর্পণ করে উপস্থিত হওয়ার বিবরণ রয়েছে। কেননা জ্বিন, মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে গঠিত যে বিশাল বাহিনীকে তারা হযরত সোলায়মানের সাথে দেখেছে, তাতে তাদের আত্মসমর্পণ না করে গত্যন্তর ছিলো না। হযরত সোলায়মানের এতো শক্তি ও এতো সৈন্য-সামন্ত কেবল আল্লাহই তাকে দিয়েছেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কী কী নেয়ামত দিয়েছেন, প্রকৃতির জগতে আল্লাহর কী কী নিদর্শন বিদ্যমান, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পৃথিবীর খলিফা নিয়োগ, আর এসব সত্তেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করা ও তার শোকর না করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীতে একজন কৃতজ্ঞ বান্দার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, যে আল্লাহর কাছে তার নেয়ামতের শোকর আদায়ের ক্ষমতা ও প্রেরণা চায়, আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার তাওফীক চায়। এ ব্যাপারে উদাসীনতা থেকে রেহাই চায় এবং প্রার্থনা করে যেন ধন সম্পদের প্রাচুর্য ও ক্ষমতার দাপট তাকে অহংকারী না বানায়। এভাবে সূরার আলোচ্য বিষয় ও কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

সাবার রাণীর সাথে হযরত সোলায়মানের যে কাহিনী এ সূরায় আলোচিত হয়েছে, তা কোরআনের কাহিনী হিসাবেও যেমন একটা পূর্ণাংগ নমুনা, শৈল্পিক বর্ণনাভংগির বিচারেও তেমনি।

সামগ্রিকভাবে এ কাহিনীর ঘটনাবলী, দৃশ্যাবলী ও আবেগ অনুভূতি চমকপ্রদ, রোমাঞ্চকর। আর এসব দৃশ্যের মাঝে মাঝে ছেদ টেনে শৈল্পিক শূন্যতার সৃষ্টি করে তাকে অধিকতর উপভোগ্য করা হয়েছে।

এবার বিস্তৃত তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

জ্ঞানের উৎস ও তার সঠিক প্রয়োগ

'আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি। তারা উভয়ে বলেছেন, 'যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাঁর বহুসংখ্যক মোমেন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাঁর জন্যে সকল প্রশংসা।' (আয়াত-১৫)

এ হচ্ছে কাহিনীর সূচনা ও উদ্বোধনী ঘোষণা। হযরত দাউদ ও সোলায়মানকে আল্লাহ তায়ালা যেসব নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানকেই এখানে শ্রেষ্ঠতম আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত দাউদকে আল্লাহ যেসব জ্ঞান ও বিদ্যা শিখিয়েছেন তার বিবরণ অন্যান্য সূরায় দেয়া হয়েছে। যেমন, তিনি 'যাবুর' এমন সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন যে, তা শুনে তার চারপাশের সমগ্র প্রকৃতিতে সাড়া পড়ে যেতো। পাহাড় পর্বত ও পাখিকুল তার সুমিষ্ট তান ও আবেগময় সুরের ঝংকারে মূর্ছিত ও তন্ময় হয়ে যেতো। আল্লাহর সাথে তিনি গভীর একান্ত সংলাপে নিমগ্ন হতেন। বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুরাজির মধ্যে ও তার মধ্যে কোনো বাধা থাকতো না। তিনি লৌহ বর্ম, শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরী করতে পারতেন, লোহা দিয়ে যাই চাইতেন– বানাতে পারতেন এবং মানুষের বিবাদ বিসম্বাদ মেটানোর কৌশল জানতেন, আর এই কৌশলে হযরত সোলায়মানও তার অংশীদার ছিলেন।

এই সূরায় হযরত সোলায়মানকে আল্লাহ তায়ালা তায়ালা যে পাখির ভাষা শিখিয়েছিলেন সে কথার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য সূরায় হযরত সোলায়মানের বিচার সংক্রান্ত দক্ষতা ও আল্লাহর হুকুমে বাতাসকে তার অনুগত বানানোর বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

কাহিনীর শুরুতেই এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটা এসেছে যে, 'আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি।' আয়াত শেষ হবার আগেই এই নেয়ামত লাভের জন্যে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করা হয়েছে, এর অসাধারণত্ব ও বিরাটত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং এই জ্ঞান দ্বারা তাদের দু'জনকে আল্লাহর অন্যান্য মোমেন বান্দার ওপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তার জন্যে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেছে, জ্ঞান বা বিদ্যার কতো মূল্য, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে তা দান করেন, সে কতো মর্যাদাবান এবং এই দান কতো বড় দান।

এখানে বিদ্যার কোনো শ্রেণী বা বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। কেননা সামগ্রিকভাবে জ্ঞান বিদ্যাকে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। জ্ঞান বা বিদ্যা মাত্রেই আল্লাহর মহাদান, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই বুঝা উচিত জ্ঞান বা বিদ্যা কোথা থেকে আসে বা কে দেয়। অতপর এর জন্যে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করা উচিত এবং সেই জ্ঞান বা বিদ্যাকে এমন পথেই ব্যয় করা উচিত যে পথে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এরূপ করলে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরায় না এবং আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় না। জ্ঞান যখন আল্লাহর নেয়ামত ও অবদানরূপে বিবেচিত হয়, তখন তা কিভাবে মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরাবে বা আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেবে? যে জ্ঞান বা যে বিদ্যা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরায় তা ভ্রান্ত ও বিকৃত জ্ঞান। সে জ্ঞান তার মূল উৎস

ও লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট। সে জ্ঞান মানুষের জন্যে কোনো সুখ বয়ে আনে না। তা বয়ে আনে অশান্তি, ভীতি ও ধ্বংস। কেননা তা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উৎসভ্রষ্ট। সে জ্ঞান আল্লাহর পথ হারিয়ে ফেলেছে।

মানব জাতি আজ বিজ্ঞানের এক নতুন স্তরে উপনীত। অণুকে চূর্ণ করে ও কাজে লাগিয়ে সে এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এ ধরনের বিজ্ঞান, যার অধিকারী আল্লাহকে মনে রাখে না– এ দ্বারা মানুষ কী অর্জন করতে পেরেছে, যে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করে মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় না, আল্লাহ শোকর করে না এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে না। তা দ্বারা মানুষ পাশবিক গণহত্যা ছাড়া আর কী ঘটাতে পেরেছে, যেমনটি ঘটিয়েছে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুটো আণবিক বোমা? এ দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষকে ভয়ে আতংকে দিশেহারা করে দেয়া এবং ধ্বংসের হুমকি দিয়ে তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়া ছাড়া আর কী লাভ হয়েছে?(১)

জ্বিন ও প্রাণীজগত নিয়ে সোলায়মান (আ.)-এর সাম্রাজ্য

হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে জ্ঞান নামক নেয়ামত দান এবং এই নেয়ামত দিয়ে অনুগৃহীত করার জন্যে হযরত দাউদ ও সোলায়মান কর্তৃক শোকর আদায়ের কথা উল্লেখ করার পর এবার শুধু হযরত সোলায়মান সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো........... ' (আয়াত ১৬)

হযরত দাউদকে তো রাজত্ব ও নবুওত দুটোই দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তাঁর ও হযরত সোলায়মানকে প্রদত্ত নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার সময় রাজত্বের উল্লেখ করা হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এলেম বা জ্ঞানের। কেননা রাজত্ব এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়।

'সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো', কথাটা দ্বারা এলেম বা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বুঝানো হয়েছে। কেননা এটাই সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে যে জ্ঞানের কথা বুঝানো হয়েছে, সেটা হযরত সোলায়মানের জনসমক্ষে দেয়া ঘোষণা থেকেও স্পষ্ট, 'সোলায়মান বললো, হে জনমন্ডলী, আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং সব কিছুরই অংশ আমি পেয়েছি।' পাখির ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞানকে তিনি স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য নেয়ামতের কথা নামোল্লেখ না করেই ব্যক্ত করেছেন। সাথে সাথে এর উৎসেরও উল্লেখ করে বলেছেন, যিনি পাখির ভাষা শিখিয়েছেন, সেই আল্লাহই অন্যান্য নেয়ামতেরও দাতা। এ নেয়ামতের দাতা হযরত দাউদ নন। কেননা তিনি এটা নিজের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাননি। অনুরূপভাবে অন্যান্য যেসব নেয়ামত পেয়েছেন, তাও সেই উৎস থেকেই এসেছে, যেখান থেকে পাখির ভাষার জ্ঞান এসেছে।

---

(১) বার্হিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আনবিক বোমা নির্মাণকারী শিল্প সংস্থার সদস্য এম, ই উলিভেনেট হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনার পর বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত যে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্ব নাট্যমঞ্চে প্রাথমিক বোমাগুলোর চেয়ে দশহাজার টন বেশী বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমার আবির্ভাব ঘটবে। ওগুলোর পর দশ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন বোমাও আবিষ্কৃত হবে, যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা সতর্কতা কাজে লাগবে না। এ ধরনের ৬টা বোমা গোটা ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।' তার এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যে হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সামনে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত আনবিক বোমা দুটো নিছক শিশুর খেলনা বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, হিরোশিমার বোমাটা তাৎক্ষণিকভাবেই মৃত্যু ঘটায় ২ লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষের। যারা আহত হয়ে ও দগ্ধ হয়ে পরে মারা গিয়েছিলো, তাদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ

'আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে ...' হযরত সোলায়মান (আ.) এ কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করছেন নিছক আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্তির কথা প্রচার করার জন্যে এবং তাঁর অনুগ্রহের বিবরণ দেয়ার জন্যে, দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করার জন্যে নয়।

এ সম্পর্কে হযরত সোলায়মান মন্তব্য করেছেন, 'নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।' অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ, যা অনুগ্রহদাতা ও অনুগৃহীত উভয়কেই উন্মোচিত করে। কেননা কোনো মানুষকে পাখির ভাষা শেখানো এবং সকল জিনিস থেকে কিছু না কিছু দেয়া একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

পশু, পাখী ও সরীসৃপের জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমঝোতার উপকরণ হিসেবে তাদের নিজস্ব ভাষা চালু রয়েছে। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা সূরা আনয়ামে বলেছেন, পৃথিবীতে যতো প্রাণী এবং যতো পাখি আছে, সবই তোমাদেরই মতো বিভিন্ন শ্রেণী মাত্র।' জীবন ধারণের জন্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার সুনির্দিষ্ট মাধ্যম এবং সমঝোতার উপকরণ না থাকলে তা কোনো জীব- শ্রেণী হতেই পারে না। বহুসংখ্যক পশু পাখী ও জীব সম্পর্কের মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল সৃষ্টি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা যে এদের ভাষা ও সমঝোতার উপকরণ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সে শুধুই অনুমানভিত্তিক- সুনিশ্চিত জ্ঞানভিত্তিক নয়, কিন্তু হযরত সোলায়মানকে আল্লাহ তায়ালা যে জ্ঞান দিয়েছিলেন, তা ছিলো অসাধারণ ও অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত। এটা তিনি এ যুগের বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের মতো অনুমানসর্বস্ব পন্থায় খুঁজে বের করেননি।

এ বিষয়টা আরো একটু স্পষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। কেননা আধুনিক কালের কোনো কোনো মোফাসসের হযরত সোলায়মানের এদতসংক্রান্ত সাফল্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে অর্জিত পশু পাখী ও সরীসৃপের ভাষার জ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন।

আসলে তারা আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সামনে নিজেদের পরাজিত ভাবেন ও হীনমন্যতায় ভোগেন। এ ধরনের তাফসীর প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক ব্যাপারকে স্বাভাবিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং মানুষের সামান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে পরাভব স্বীকার করার শামিল। অথচ এটা আল্লাহর কাছে অতি সহজ ও অতি নগণ্য ব্যাপার যে, তিনি তার কোনো এক বান্দাকে কোনো কষ্ট সাধনা ছাড়াই নিজের পক্ষ থেকে পশু পাখী ও সরীসৃপের জ্ঞান দান করবেন। এটা আর কিছু নয়- বিভিন্ন জাতের সৃষ্ট জীবের মাঝে আল্লাহ তায়ালা যে সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন সেটা তুলে নেয়া মাত্র। যিনি সকল জীবের স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে এটা অসম্ভব বা কঠিন হতে যাবে কেন?

হযরত সোলায়মানকে আল্লাহ তায়ালা যেসব অলৌকিক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, এ তো তার একটা অংশমাত্র। এর অপর অংশ হলো, এক শ্রেণীর জ্বিন ও পাখীকে তার এমন বশীভূত ও আজ্ঞাবহ করে দেয়া হয়েছিলো যে, তার মনুষ্য বংশোদ্ভূত বাহিনীর সদস্যদের সাথে তাদের কোনোই পার্থক্য ছিলো না। পাখীর যে শ্রেণীকে আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বানিয়েছিলেন, তাকে তিনি একই জাতের পাখীর অনুরূপ অনান্য শ্রেণীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বানিয়েছিলেন। এর প্রমাণ হুদহুদ। সাবার রাণী ও তার জাতির অবস্থা এবং তৎপরতা সম্পর্কে তার এমন তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি হয়েছিলো, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিমান, মেধাবী ও আল্লাহভীরু মানুষেরই হওয়া সম্ভব। এটাও একটা অলৌকিক ব্যাপার ও মোজেযা ছিলো।

এ কথা সত্য যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর যে বিধান চালু রয়েছে, সে অনুসারে পাখীর একটা বিশেষ বোধশক্তি থাকে। বিভিন্ন পাখীর মধ্যে এই বোধশক্তির পরিমাণে ও মানে তারতম্যও থাকতে পারে, কিন্তু তা কখনো মানুষের বোধশক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয় না। পাখীর সৃষ্টির এই

কৌশল প্রকৃতিতে সমন্বয় সাধনের এক সর্বব্যাপী প্রক্রিয়ারই অংশ এবং এককভাবে এটা সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিধানেরই আওতাধীন। এই প্রাকৃতিক বিধান পাখীর অস্তিত্ব যেভাবে হবার দাবী জানায়, পাখী ঠিক সেভাবেই জন্ম লাভ করে।

আবার এ কথাও সত্য, যে হুদহুদ পাখী আজকাল জন্মে, তা হাজার হাজার বছর আগে যে হুদহুদ পাখী জন্ম নিত, তারই বংশধর। উত্তরাধিকারের এমন বহু উপকরণ রয়েছে, যা আজকের একটা হুদহুদকে প্রথম হুদহুদের প্রায় সমমানেরও বানাতে পারে, কিন্তু প্রজন্মান্তরে এই পাখীর মান ও প্রকৃতিতে যতো তারতম্যই ঘটুক না কেন, তা কখনো হুদহুদ শ্রেণীর বাইরে অন্য শ্রেণীর পাখীতে রূপান্তরিত হয় না। হুদহুদ (মাথায় ঝুঁটিওয়ালা এক ধরনের সুন্দর পাখী) কখনো বাদুড় বা শালিক ইত্যাদি হয় না। এটাও আল্লাহর প্রচলিত প্রাকৃতিক বিধানের অন্যতম, যা মহাবিশ্বের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সুসমন্বিত।

কিন্তু এই চিরাচরিত দুটো প্রাকৃতিক সত্য বা সত্য প্রাকৃতিক বিধানের ব্যতিক্রমও অসম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা যখনই ইচ্ছা করেন, এই বিধানের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অলৌকিক কান্ডও ঘটাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। এমনকি এই অলৌকিক ঘটনাও সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের অংশ হতে পারে, যার ব্যাপক রূপ ও বিচিত্র দিকগুলো হয়তো আমরা জানি না। এই ঘটনা হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময়েই সংঘটিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। এ জাতীয় ঘটনায় মানুষের চির পরিচিত রীতিনীতি লংঘিত হয় বটে। তবে তা আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান এবং সর্বব্যাপী ভারসাম্য ও সমন্বয়কে পূর্ণতা দান করে। হযরত সোলায়মানের হুদহুদ এ ধরনেরই একটা অলৌকিক সৃষ্টি ছিলো, যা তার সময়কালে তার অনুগত পাখীকুলের মধ্যে ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই আনুষংগিক আলোচনার পর আমি হযরত সোলায়মানের সেই কাহিনীর বিশদ বিবরণে ফিরে আসছি, যা তিনি হযরত দাউদের উত্তরাধিকারী হবার পর এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সম্মানিত করেছেন বলে ঘোষণা করার পর সংঘটিত হয়েছিলো।

'জ্বিন, মানুষ ও পাখীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীসমূহ সোলায়মানের জন্যে সুশৃংখলভাবে সমবেত হলো।' (আয়াত ১৭)

জ্বিন, মানুষ ও পাখীর সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন হযরত সোলায়মান স্বয়ং নিজে। মানুষ তো আমাদের কাছে পরিচিত। তবে জ্বিন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে যতোটুকু আমাদের জানিয়েছেন, আমরা ততোটুকুই জানি। আমরা কেবল এতোটুকু জানি যে, আল্লাহ আগুন দিয়ে জ্বিন সৃষ্টি করেছেন। তারা মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ তাদের দেখতে পায় না। 'ইবলীস ও তার সংগী তোমাদের এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না।' (সূরা আরাফের এ আয়াত ইবলীস বা শয়তান সংক্রান্ত। আর ইবলীস তো জ্বিন জাতিরই অন্তর্ভুক্ত।) জ্বিনদের এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষের মনের ভেতরে খারাপ কাজের প্ররোচনা দিতে ও গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তবে কিভাবে সেটা পারে তা আমাদের জানা নেই। আবার এ কথাও সত্য যে, জ্বিনদের একটা গোষ্ঠী রসূল (স.)-এর ওপর ঈমান এনেছিলো। তিনি নিজে এটা জানতে পারেননি; বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন। যেমন সূরা জ্বিনের ১ ও ২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বলো, আমার কাছে এই মর্মে ওহী এসেছে যে, জ্বিনদের একটা গোষ্ঠী শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা সততার পথ দেখায়।

আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবো না।' আমরা আরো জানি, আল্লাহ তায়ালা জ্বিনদের একটা গোষ্ঠীকে হযরত সোলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলেন, যারা তার জন্যে বড় বড় দুর্গ, মূর্তি, খাবারের জন্যে বড় বড় পাত্র তৈরী করতো। তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুবুরী হিসেবে কাজ করতো এবং আল্লাহর হুকুমে তার সকল নির্দেশ মেনে চলতো। এই জ্বিনদেরই একাংশকে এখানেও দেখা যাচ্ছে, তাদের ভাই মানুষ ও পাখীর সাথে হযরত সোলায়মানের বাহিনীতে কাজ করতো।

আমার মতে, আল্লাহ তায়ালা যেমন হযরত সোলায়মানের জন্যে একদল মানুষকে তার অনুগত করেছিলেন, তেমনি অনুগত করেছিলেন একদল জ্বিন এবং পাখীকেও। পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত সোলায়মানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। কেননা তার সাম্রাজ্যের সীমানা বর্তমান ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া ও ইরাকের ফোরাতের উপকূল পর্যন্তই বিস্তৃত ছিলো, তার বাইরে নয়। তেমনি সমুদয় জ্বিন জাতি ও পাখিকুল তার অনুগত ছিলো না। প্রত্যেক শ্রেণীর একটা গোষ্ঠীই শুধু তার সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

জ্বিনদের সকলে যে হযরত সোলায়মানের অনুগত ছিলো না। তার প্রমাণ এই যে, ইবলীসও তার বংশধর জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোরআনে আছে, 'ইবলীস জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।' (সূরা কাহফ) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন, 'যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে।' এই জাতীয় জ্বিনেরা হযরত সোলায়মানের আমলেও মানুষকে কু-প্ররোচনা দিতো। সমুদয় জ্বিন জাতি যদি হযরত সোলায়মানের অনুগত থাকতো, তাহলে তারা কু-প্ররোচণা দিতো না। কেননা তিনি ছিলেন সৎপথ প্রদর্শক একজন নবী। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, জ্বিন জাতির সকলে নয় বরং একটা গোষ্ঠীই তাঁর অনুগত ছিলো।

পাখীদেরও সবাই নয় বরং একটা অংশই হযরত সোলায়মানের অনুগত ছিলো। এর প্রমাণ এই যে, হযরত সোলায়মান যখন পাখীকে খুঁজতে লাগলেন, তখন জানতে পারলেন যে, হুদহুদ পাখীটা নিখোঁজ রয়েছে। সকল পাখী যদি তার অনুগত এবং তার সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত থাকতো, তাহলে হুদহুদ পাখীরাও থাকতো। আর সে ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ পাখীর মধ্য থেকে একটা হুদহুদের অনুপস্থিতি তিনি টের পেতেন না এবং বলতেন না যে, হুদহুদকে দেখছি না কেন? সুতরাং ওটা যে একটা বিশেষ ও নির্দিষ্ট হুদহুদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা সম্ভবত হুদহুদ শ্রেণীর সেই নির্দিষ্ট পাখী, যাকে হযরত সোলায়মানের অনুগত করা হয়েছিলো, অথবা সে বাহিনীতে যে কটা নির্দিষ্ট পাখীর কর্মরত থাকার পালা ছিলো, এই হুদহুদটা ছিলো তাদেরই একটা এবং ঠিক এ সময় তার পালা ছিলো। যে তথ্য দ্বারা এ বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, সে হুদহুদটা এক বিশেষ ধরনের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলো, যা অন্যান্য হুদহুদ বা অন্যান্য পাখীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এ ধরনের বিশেষ মেধা ও প্রতিভা হুদহুদের একমাত্র সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীটার মধ্যেই থাকতে পারে, যাদের হযরত সোলায়মানের অনুগত করা হয়েছিলো, সকল হুদহুদ বা সকল পাখীর মধ্যে নয়। কেননা এই বিশেষ হুদহুদটা যে উঁচু মানের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলো, তা প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান, মেধাবী ও আল্লাহভীরু মানুষেরই সমপর্যায়ের।

'সোলায়মানের জন্যে জ্বিন, মানুষ ও পাখীর মধ্য থেকে বাহিনীসমূহ সংগঠিত করা হয়েছিলো।' ওটা ছিলো এক বিশাল বাহিনী। 'তাদের সংঘবদ্ধ করা হয়েছিলো।' অর্থাৎ সুশৃংখল করা হয়েছিলো। ফলে তাদের ছিন্নভিন্ন হওয়া এবং তাদের ভেতরে উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার কোনো সুযোগ ছিলো না। সে বাহিনীটা একটা সুশৃংখল ও সুগঠিত সামরিক

বাহিনীতে পরিণত হয়েছিলো, যার ফলে তার ওপর সামরিক পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। 'তাদের সংঘবদ্ধ করা হয়েছিলো'– এ কথাটা আসলে শৃংখলা ও সংঘবদ্ধতার প্রতি ইংগিত দেয়। পরবর্তী আয়াতে 'সেনাবাহিনী' ও 'প্রস্তুত করো' শব্দ দুটো লক্ষণীয়,

'অবশেষে যখন তারা পিঁপড়ের উপত্যকায় এলো, তখন একটা মহিলা পিঁপড়ে বললো, হে পিঁপড়ের দল। তোমাদের বাসগৃহে ঢুকে পড়ো, যেন সোলায়মান ও তার সেনা বাহিনী তোমাদের ধ্বংস করে না ফেলে।' এ কথা শুনে সোলায়মান মুচকি হাসলো এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এমনভাবে 'প্রস্তুত' করো যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়েছো, 'আর আমি যেন এমন সৎ কাজ করি, যাতে তুমি খুশী হও এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।'

হযরত সোলায়মানের সেনাবাহিনী সদলবলে রওনা হলো। এ বাহিনী জ্বিন, মানুষ ও পাখীর সমন্বয়ে গঠিত। সুশৃংখল, কাতারবদ্ধ এ বাহিনী তালে তালে কদম ফেলে এগিয়ে চললো। চলতে চলতে তারা বিরাট এক ময়দানের কাছে এসে পড়লো। সে ময়দানে বিপুল সংখ্যক পিঁপড়ে বাস করতো। পিঁপড়ের আধিক্যের কারণে ওটাকে 'পিঁপড়ের ময়দান' বলা হয়েছে। বাহিনী সে ময়দানের কাছে এলে একটা মহিলা পিঁপড়ে– যে সে ময়দানে বসবাসকারী পিঁপড়েগুলো সংগঠক ও শাসকের দায়িত্বে ছিলো– পিঁপড়েদেরকে বললো, 'তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে ঢুকে পড়ো, যেন সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মেরে না ফেলে।' মহিলা পিঁপড়েটা এ আদেশ কিভাবে প্রচার করেছিলো তা আমরা জানি না। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সাধারণ পিঁপড়েদের মধ্যে যে ভাষা ও যে পদ্ধতি প্রচলিত এবং সুবিদিত ছিলো, সেই ভাষায় ও সেই পদ্ধতিতেই প্রচার করেছিলো। উল্লেখ্য যে, পিঁপড়ের রাজ্য মৌমাছির রাজ্যের মতো অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে সংগঠিত ও পরিচালিত। এখানে বিভিন্ন পদ ও দায়িত্ব বন্টন করা রয়েছে এবং তা বিস্ময়কর শৃংখলার সাথে পালিত হয়ে থাকে। মানুষ এতো উন্নত মানের বুদ্ধিমত্তা ও মেধার অধিকারী হয়েও পিঁপড়ে এবং মৌমাছির এমন চমৎকার শৃংখলা ও সংঘবদ্ধতার অনুকরণ করতে পারে না।

মহিলা পিঁপড়েটা যে আদেশ প্রচার করলো তা হযরত সোলায়মান শুনলেন, বুঝলেন ও কৌতুহল বোধ করলেন। কোনো শিশু যদি কোনো বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্যাতিত হবার আশংকায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, অথচ তাকে নির্যাতন করার কোনো চিন্তাই সে বয়স্ক ব্যক্তির মাথায় নেই– তাহলে এ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন কৌতুহল বোধ করে, হযরত সোলায়মানও তেমনি কৌতুহল বোধ করলেন। এ ঘটনায় হযরত সোলায়মান কিছুটা আত্মতৃপ্তিও বোধ করলেন। কেননা এটা ছিলো তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যার সাহায্যে মানব জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞাত এসব সৃষ্টির সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মহিলা পিঁপড়েটার এমন বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা এবং সাধারণ পিঁপড়েগুলোর আনুগত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন।

হযরত সোলায়মান এই ব্যাপারটা হৃদয়ংগম করলেন এবং 'তার কথায় মুচকি হাসলেন'। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য তাকে আলোড়িত ও হতচকিত করলো, এই অলৌকিক জ্ঞানদানকারী মহান আল্লাহর প্রতি তার মন বিগলিত হলো। আল্লাহর এসব অজানা সৃষ্টির রহস্য তার কাছে উদঘাটিত হলো এবং তিনি কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রেরণা দান করো যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়েছো।

রাব্বী' শব্দটির অর্থ যদিও 'হে আমার মালিক প্রতিপালক'; কিন্তু এ শব্দটা অত্যন্ত কাছ থেকে উচ্চারিত সম্বোধন বুঝায়।

'আও যে'নী' শব্দের অর্থ গোটা সত্ত্বাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করো বা তাওফীক দাও, আমার অংগ প্রত্যংগকে, আবেগ অনুভূতিকে, জিহ্বাকে, মনকে, চেতনাকে, ভাষাকে, কাজকে, ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁককে, আমার সমস্ত শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে শক্তি যোগাও, প্রেরণা দাও, ক্ষমতা দাও, এই সবগুলো একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করো (এটাই 'আও যে'নী' শব্দের আভিধানিক অর্থ), যাতে এই সবগুলো আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায়ে নিয়োজিত হয়।

এ উক্তি থেকে জানা যায়, সে মুহূর্তে হযরত সোলায়মান এই বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা কতো বেশী অভিভূত হয়েছিলেন, তার চেতনা ও প্রেরণা কতো শাণিত ও তীক্ষ্ণ হয়েছিলো, আল্লাহর দিকে তার মনোযোগ কতো প্রবল ও তীব্র হয়েছিলো, তার বিবেক ও মন কতো অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত হয়েছিলো, আল্লাহর অনুগ্রহকে তিনি কতো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তার ওপর ও তার পিতামাতার ওপর আল্লাহর সাহায্যের হাত কতোখানি সম্প্রসারিত হয়েছিলো এবং আল্লাহর নেয়ামত ও রহমতে সিক্ত হয়ে তিনি কতো বিনীত ও কৃতার্থ হয়েছিলেন তাও জানা যায়।

'এবং আমি যেন এমন সৎ কাজ করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।' এ উক্তি থেকে জানা যায়, সৎ কাজ করতে পারাটাও আল্লাহর অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা সৎ কাজের তাওফীক তথা প্রেরণা ও ক্ষমতা দান করেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হযরত সোলায়মান একদিকে যেমন আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করার ক্ষমতা ও প্রেরণা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়েছেন, অপরদিকে তেমনি আল্লাহর কাছে যে সৎ কাজ সন্তোষজনক, তা করার তাওফীকও তিনি আল্লাহর কাছে চেয়েছেন। কেননা তিনি বুঝতেন যে, সৎ কাজ করতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত আরো একটা নেয়ামত ও আরো একটা প্রেরণা।

'আর আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তোমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।' এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাও যে আল্লাহর এক রহমত, তা হযরত সোলায়মান জানতেন। আল্লাহর রহমতই বান্দাকে সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করে থাকে এবং এভাবেই সে সৎ বান্দাদের দলভুক্ত হয়। এ কথা জানতেন বলেই তিনি আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে আবেদন জানাচ্ছেন তাকে সৎকর্মশীল, রহমতপ্রাপ্ত ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। জ্বিন, মানুষ ও পাখিকুলকে আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত করে দিয়েছেন এবং তাকে বিপুল নেয়ামতে সমৃদ্ধ করেছেন। এতদসত্তেও তিনি এভাবে কাকুতি মিনতি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন, তা সত্তেও তিনি আল্লাহর শাস্তি সম্বন্ধে বেপরোয়া হননি, তিনি তখনো শংকিত ছিলেন, তার সৎ কাজ ও শোকর আল্লাহর নেয়ামতের তুলনায় কম থেকে যায় কিনা। অনুরূপভাবে আল্লাহর ভয় এবং তার সন্তোষ ও দয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ আগ্রহ তাকে প্রচন্ডভাবে সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর করে তুলেছিলো। অথচ এ মুহূর্তে তিনি আল্লাহর নেয়ামতে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ। সে সময় একটা মহিলা পিঁপড়ে যে কথা বলছিলো, তা আল্লাহর দয়া ও শিক্ষাদানের বদৌলতে তিনি বুঝতে পারছিলেন।

এখানে আমরা একটা নয়, দুটো অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই। একটা হলো, মহিলা পিঁপড়ে তার স্বজাতীয় পিঁপড়েদের সতর্ক করে যে বক্তব্য রেখেছিলো তা হযরত সোলায়মান কর্তৃক উপলব্ধি করা, অপরটি হলো, সে মহিলা পিঁপড়ের এটা উপলব্ধি করা যে, এই বাহিনী হযরত

সোলায়মানের বাহিনী। প্রথমটা অর্থাৎ হযরত সোলায়মান কর্তৃক পিঁপড়ের ভাষা বুঝা স্বয়ং আল্লাহর শেখানো বিদ্যা। হযরত সোলায়মান তো একজন মানুষ ও নবী। সুতরাং ব্যাপারটা হযরত সোলায়মানের দিক দিয়ে দ্বিতীয় মোজেযার চেয়েও সহজতর। দ্বিতীয় মোজেযাটা মহিলা পিঁপড়ের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে হয়তো বুঝতে পেরেছে যে, এই বাহিনী একটা বৃহত্তর সৃষ্টি। যার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে পিঁপড়েরা মরে যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা পিঁপড়ের মধ্যে যে জীবন রক্ষাকারী বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রেখেছিলেন, সেটা প্রয়োগ করে তারা বিপদ থেকে উদ্ধার পেলো। তবে মহিলা পিঁপড়ে কর্তৃক এই বাহিনীকে হযরত সোলায়মান ও তার বাহিনী বলে চিনতে পারাটাই বিশেষ মোযেজা ও অসাধারণ ঘটনা। এরূপ পরিস্থিতিতে এটাই একটা অলৌকিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

এবার আমি হুদহুদ পাখী ও সাবার রাণীর সাথে হযরত সোলায়মানের কাহিনী আলোচনা করবো।

এ কাহিনীর তিনটি দৃশ্য রয়েছে, যেগুলোর মাঝে নানা রকমের শৈল্পিক শূন্যতা বিরাজ করছে। উপস্থাপিত দৃশ্যগুলো দ্বারাই এ সব শূন্যতা পূরণ হয় এবং কাহিনীর শৈল্পিক উপস্থাপনার সৌন্দর্যও পূর্ণতা লাভ করে। এ সব দৃশ্যের মাঝে কোনো কোনো দৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, যা সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ আবেগজড়িত নির্দেশ প্রদান করে। সেই সাথে সেই শিক্ষাও বাস্তবায়িত করে, যা কোরআনের কেসসা কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তা এর দৃশ্যাবলী ও শূন্যতাগুলোর সাথে চমৎকারভাবে সমন্বিত এবং সে সমন্বয় শৈল্পিক সৌন্দর্য ও ধর্মীয় আবেগ এই দুদিক থেকেই।

হযরত সোলায়মান সংক্রান্ত আলোচনাটা যেহেতু একই সাথে জ্বিন, মানুষ, পাখী ও জ্ঞানরূপী নেয়ামতের উল্লেখ দিয়ে শুরু করা হয়েছে, সেহেতু এই গল্পে জ্বিন, মানুষ, পাখি ও জ্ঞান সবারই অবদান আলোচিত হয়েছে। হয়তো বা এ প্রাথমিক আলোচনাটাই কাহিনীর প্রধান নায়কদের ভূমিকা সম্বলিত। বস্তুত এটাই কোরআনের কেসসা কাহিনীর একটা সূক্ষ্ম শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য।

কাহিনীর কিছু কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক উত্তেজনা এবং ভাবাবেগও এখানে পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে হযরত সোলায়মান, সাবার রাণী বিলকিস, হুদহুদ পাখী এবং রাণীর সভাসদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অন্যতম।

পয়লা দৃশ্যটা শুরু হয়েছে হযরত সোলায়মান ও তার বাহিনীর পিঁপড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হওয়া দিয়ে, মহিলা পিঁপড়ের হুশিয়ারী জ্ঞাপক বক্তব্য প্রদান এবং হযরত সোলায়মান কর্তৃক আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও দোয়ার পর তার বাাহিনীর সমাবেশের সময়,

'সোলায়মান পাখীকে অনুপস্থিত দেখে বললো, ব্যাপার কী? হুদহুদকে দেখছি না কেন? তবে কি সে অনুপস্থিত? সে যদি অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে। তবে আমি তাকে হয় কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা যবাই করে ফেলবো।'

এই হচ্ছেন সেই জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সম্রাট নবী সোলায়মান। তিনি পাখি বাহিনী পরিদর্শনে গিয়ে হুদহুদকে অনুপস্থিত দেখতে পেলেন। আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে, ওটা একটা নির্দিষ্ট হুদহুদ, যে স্বীয় পালা অনুসারে এ সময় এ বাহিনীতে বিশেষ কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো, এটি সে সময়কার পৃথিবীতে বিদ্যমান লক্ষ লক্ষ হুদহুদ জাতীয় পাখীর মধ্য থেকে যে কোনো একটা হুদহুদ। এই হুদহুদটাকে হযরত সোলায়মান কর্তৃক অনুপস্থিত চিহ্নিত করতে পারা দ্বারা আমরা একথাও বুঝতে পারি যে, হযরত সোলায়মান কতো

সচেতন, দৃঢ়চেতা ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জ্বিন, মানুষ ও পাখীর সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল সেনাবাহিনীর একজন মাত্র সৈন্যের অনুপস্থিতি তিনি টের পেয়ে গেলেন। অথচ এ বাহিনী এত সুগঠিত ছিলো যে, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা সদস্যকে সে সংঘবদ্ধ ও অটুট সংকল্পের অধিকারী বানিয়ে রেখেছে। 'ব্যাপার কী, হুদহুদকে দেখি না কেন?' হযরত সোলায়মানের এই জিজ্ঞাসাটা ছিলো অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। ব্যাপক অর্থবোধক ও উদার মনোভাবের পরিচায়ক।

এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, পাখিটা সত্যিই অনুপস্থিত ছিলো এবং তাও বিনা অনুমতিতে। তাই এরূপ কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। অন্যথায় বিশৃংখলা দেখা দিতে পারতো। সুতরাং সম্রাট কর্তৃক এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর ব্যাপারটা আর গোপন থাকেনি। দৃঢ়তা ও কড়াকড়ির সাথে এটা জিজ্ঞেস না করলে সেনাবাহিনীর বাদবাকী সদস্যদের জন্যে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতো। তাই আমরা দেখি, দৃঢ়চেতা সম্রাট সোলায়মান অনুপস্থিত সৈন্য হুদহুদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন।

'সে যদি অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত না করে, তাহলে তাকে আমি অবশ্যই কঠোর শাস্তি দেবো, অথবা যবাই করে ফেলবো।' কিন্তু হযরত সোলায়মান পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদের মতো স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন নবী। তিনি তখনো হুদহুদের অনুপস্থিতির কারণ শোনেননি। কাজেই তার কাছ থেকে না শুনে তার সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা শোভনীয় নয়। ন্যায়বিচারক নবীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার এই উক্তি দ্বারা। 'সে যদি কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে। অর্থাৎ এমন কোনো শক্তিশালী প্রমাণ, যা তার অনুপস্থিতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে বা সে শাস্তির যোগ্য নয়, এ কথা সাব্যস্ত করে।

সাবার রাণীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

এরপর হুদহুদ উপস্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনীর এই দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটে (অথবা দৃশ্যটা তখনো বহাল ছিলো)। হুদহুদ এক চাঞ্চল্যকর খবর নিয়ে হাযির হলো। হযরত সোলায়মান এবং আমরা যারা এই কাহিনী এখন শুনছি, সবার জন্যেই খবরটা ছিলো বিস্ময়োদ্দীপক!

'অল্পক্ষণ পরেই হুদহুদ বলে উঠলো, 'আপনি যা জানেন না, তাই আমি জেনে এসেছি।' .... (আয়াত ২২-২৬)

'হুদহুদ জানতো সম্রাট কতো কঠোর স্বভাবের মানুষ।' তাই সে তার কথাটা এমন আকস্মিকভাবে তুলে ধরলো যে, তার অনুপস্থিতির বিষয়টা চাপা পড়ে গেলো এবং সম্রাট মনোযোগের সাথে তা শুনতে লাগলেন। বস্তুত এমন রাজা কোথায় পাওয়া যাবে, যার প্রজাদের একজন রাজাকে বলে, 'আপনি যা জানেন না, আমি তা জেনে এসেছি।' এরপরও রাজা তার কথা শোনেন?

এরূপ আকস্মিক বিবরণের প্রতি রাজার যখন মনোযোগ আকৃষ্ট হলো, তখন হুদহুদ সাবা জাতি ও তার রাণীর কাছ থেকে নিয়ে আসা খবর বিশদভাবে বর্ণনা করা শুরু করলো। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে ইয়ামানে অবস্থিত এই সাবা রাজ্য সম্পর্কে সে জানালো যে, এই সারা রাজ্যের শাসক এক মহিলা। 'তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে।' এ কথাটা দ্বারা এই মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, তার রাজত্ব বিশাল, তার সহায় সম্পদ বিপুল এবং তার সুসভ্য দেশ বিরাট শক্তি ও সম্পদের অধিকারী। আর তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন।' অর্থাৎ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও বিশালকায় রাজকীয় সিংহাসন যা সেই দেশটার প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও শিল্পে অগ্রসরতার প্রতীক। সে

আরো জানালো যে, সে সেই রাজ্যের জনগণ ও রাণীকে সূর্যের পূজা করতে দেখেছে। এখানে সে সেই জাতির এই বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে যে, শয়তানই তাদের কাছে তাদের কর্মকান্ড সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে, সুসজ্জিত করে দেখিয়ে তাদের বিপথগামী করেছে এবং এর ফলে তারা আল্লাহর এবাদাতের পথের সন্ধান পায় না– 'যিনি আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বস্তু বের করে আনেন।' আল-খাবউ' শব্দটার অর্থ হলো গুপ্ত বস্তু– চাই তা আকাশের বৃষ্টি ও পৃথিবীর উদ্ভিদ হোক, অথবা আকাশ ও পৃথিবীর অন্য কোনো গুপ্ত রহস্য হোক। এ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বিশাল এই প্রকৃতিতে যেসব অজানা অদেখা জিনিস রয়েছে, তার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। 'আর যা তোমরা প্রকাশ ও গোপন করো, তা তিনি জানেন।' অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান যাবতীয় গুপ্ত জিনিস যেমন জানেন, তেমনি মানুষের অন্তরাত্মার গভীরে বিদ্যমান বিষয়গুলোও তিনি জানেন, চাই তা প্রকাশ্যভাবেই বিরাজ করুক বা গোপনভাবে।

হুদহুদ এ পর্যন্ত অপরাধীর ভূমিকাই অবলম্বন করেছিলো। রাজা (হযরত সোলায়মান) তখনো তার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। এরপর সে তার কথিত কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বর্ণনা দিচ্ছে, যিনি সকলের প্রতিপালক, যিনি মহান আরশের মালিক। এই আরশের সাথে মানুষের সিংহাসনের কোনো তুলনাই হয় না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাজা যেন আল্লাহর এই শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ শুনে তার মানবীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও জাঁকজমকে অহংকারী না হয়।

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই মহান আরশের অধিপতি।'

রাণী ও তার জাতির কর্মকান্ডের খবর শোনার পর এই সূক্ষ্ম ইংগিতের তাৎপর্য হযরত সোলায়মান উপলব্ধি করেন।

আমরা এক বিস্ময়কর পাখী হুদহুদকে দেখতে পাই এখানে। সে শুধু প্রখর বুদ্ধি, মেধা, দৃঢ় ঈমান, তথ্য প্রকাশের অসাধারণ দক্ষতা, নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এবং সূক্ষ্ম ও মননশীল ইংগিতদানের যোগ্যতাই শুধু রাখে না, বরং সেই সাথে রাজা ও প্রজার পার্থক্যও বোঝে, তারা সূর্যকে সেজদা কিভাবে করে তাও অনুধাবন করে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত রহস্যের উদঘাটক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে সেজদা করা উচিত নয়, এটাও সে উপলব্ধি করে। সাধারণ হুদহুদ পাখীরা তো এতোসব বোঝে না। সুতরাং এটা যে একটা অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন বিশেষ হুদহুদ ছিলো এবং সে অলৌকিকভাবে এ সব ক্ষমতা লাভ করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হযরত সোলায়মান তার দেয়া তথ্য বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করতে তাড়াহুড়া করেন না। তিনি তার দেয়া গুরুতর সংবাদকে হালকাভাবেও দেখেন না; বরং একজন ন্যায়বিচারক নবী ও দৃঢ়চেতা সম্রাট হিসেবে তিনি এ সব তথ্য নিজের অভিজ্ঞতার ভান্ডারে সঞ্চিত রাখেন এবং পরবর্তী সময়ে তার সত্যতা যাচাই করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

'সোলায়মান বললো, তুমি সত্য বলেছো না মিথ্যা বলেছো, সেটা পরে দেখবো। এখন তুমি আমার এই চিঠিটা নিয়ে যাও এবং তা ওদের কাছে ফেলে দিয়ে চলে এসো, দেখো তারা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়।'

এ সময়ে হযরত সোলায়মান তার চিঠির মর্ম প্রকাশ করেননি, যাতে তা যথাস্থানে প্রকাশিত ও ঘোষিত হয় এবং যথাসময়ে শৈল্পিক আকস্মিকতা নিয়ে তা প্রকাশ পায়।

এ দৃশ্যের এখানেই যবনিকাপাত ঘটে। এরপর আমরা দেখতে পাই, রাণীর কাছে চিঠি পৌঁছে গেছে এবং তিনি তার সভাসদদের সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন,

'রাণী বললো, ওহে সভাসদবৃন্দ, আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পৌঁছানো হয়েছে, চিঠিটা সোলায়মানের কাছ থেকে– পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে লিখিত। এতে বলা হয়েছে, তোমরা আমার ওপর দম্ভ দেখিও না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো।'

অর্থাৎ রাণী সভাসদদের জানাচ্ছেন যে, তার কাছে একটা চিঠি পৌঁছানো হয়েছে, তার এই উক্তি থেকে আমার মনে হয়, খুব সম্ভবত সে জানতে পারেনি চিঠিটা কে দিয়ে গেলো এবং কিভাবে দিলো। সে যদি জানতো, হুদহুদ দিয়ে গেছে, তাহলে এই অসাধারণ ঘটনা সে প্রকাশ করতো। কেননা এমন কান্ড সচরাচর ঘটে না। সে বলেছে, পৌঁছানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, চিঠিটা কে পৌঁছালো এবং কিভাবে পৌঁছালো, তা সে বুঝতে পারেনি।

রাণী চিঠিটাকে 'কারীম' অর্থাৎ সম্মানজনক বা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষিত করেছে। সম্ভবত সিল বা আকৃতি দেখে সে চিঠির এই বিশেষত্ব উপলব্ধি করেছে। চিঠির বিষয়বস্তু থেকেও সে তার এরূপ মূল্যায়ন করে থাকতে পারে, যা সে সভাসদদের কাছে প্রকাশ করেছে। সে আল্লাহর এবাদাত করতো না, কিন্তু হযরত সোলায়মানের খ্যাতি এই চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছিলো। আর চিঠির যে ভাষা কোরআনে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে দৃঢ়তা, অনমনীয় মনোভাব ও উচ্চ মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ভাষার আলোকেও সে চিঠির এরূপ মূল্যায়ন করে থাকতে পারে।

চিঠির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তেজস্বী। শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়ে। এতে একটিমাত্র আদেশ দেয়া হয়েছে যে, চিঠির প্রেরকের প্রতি কোনো রকম অহংকার প্রকাশ না করে ও কোনো রকম অবাধ্যতা না দেখিয়ে সেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে সবাই যেন তার কাছে চলে আসে, যে আল্লাহর নামে চিঠি লেখা হয়েছে।

রাণী প্রথমে সভাসদদের কাছে চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করলো। তারপর তাদের পরামর্শ চেয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালো। অতপর তাদের জানালো যে, সে তাদের সাথে পরামর্শ না করে তাদের সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে না।

'সে বললো, সভাসদবৃন্দ, আমার উপস্থাপিত বিষয়ে তোমাদের মতামত দাও। তোমরা আমার সাথে শরীক না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো না।

এ কথার মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞাময়ী রাণীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সে অজ্ঞাত বাহকের মাধ্যমে প্রেরিত এই চিঠিটাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই চিঠিতে যে বড়ত্ব ও দৃঢ়তা প্রতিফলিত হয়েছে, সেটা সে লক্ষ্য করেছে। সে তার এই মূল্যায়ন ও মনোভাব তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের মনেও সঞ্চারিত করেছে চিঠিটাকে 'কারীম' বা সম্মানের যোগ্য বলার মাধ্যমে। সে যে হযরত সোলায়মানের সাথে সংঘাত ও শত্রুতা চায় না, তাও সুস্পষ্ট। তবে রাণী সে কথাটা খোলাখুলিভাবে বলতে চায় না। কথাটা সে এই বিশেষণ প্রয়োগের মাধ্যমে বলতে চায়। তারপর সে তাদের মতামত ও পরামর্শ তলব করে।

সভাসদদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে তারা রাণীর কাংখিত কাজে সক্রিয় হবার প্রস্তুতি ব্যক্ত করলো। তবে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাণীর কাছেই সোপর্দ করলো।

'তারা বললো, আমরা শক্তিশালী এবং প্রবল ক্ষমতাধর। সিদ্ধান্ত আপনারই হাতে। আপনি কী নির্দেশ দেবেন ভেবে দেখুন।'

এখানে রাণীর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে 'নারী'র ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে। যে নারী স্বভাবসুলভ নিয়মেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংস অপছন্দ করে, শক্তি প্রয়োগ ও সংঘাতে যাওয়ার আগে কৌশল প্রয়োগ এবং আপোষকামিতার অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করার পক্ষপাতী, সেই নারীর ব্যক্তিত্ব এখানে ফুটে ওঠেছে।

'রাণী বললো, রাজারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তা তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানী লোকদের অপদস্থ করে।'

অর্থাৎ রাণী জানতো, রাজাদের স্বভাবই এ রকম যে, কোনো জনপদে ঢুকলেই তারা জানমাল ও সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধন করে। তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে,- যার শীর্ষে অবস্থান করে সেখানকার নেতৃবৃন্দ। এই নেতৃবৃন্দকে তারা অপদস্থ করে। কেননা তারাই প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, আর এটাই যে রাজাদের চিরাচরিত অভ্যাস তাও রাণীর জানা ছিলো।

উপহার-উপঢৌকন মনকে নরম করে, প্রীতির মনোভাব প্রকাশ করে এবং কখনো কখনো তা যুদ্ধ প্রতিহত করতেও সফল হয়। এটা একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচিত হবে। হযরত সোলায়মান (আ.) যদি উপঢৌকন গ্রহণ করেন তাহলে বুঝতে হবে, তার লক্ষ্য পার্থিব বিজয় এবং সে ক্ষেত্রে পার্থিব উপায়-উপকরণ কাজে লাগতে পারে, আর যদি গ্রহণ না করেন তাহলে তার অর্থ হবে, তিনি আদর্শগত বিজয় ছাড়া আর কিছু চান না এবং পার্থিব ধন সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

এখানে এসে এ দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটে এবং নতুন দৃশ্যের অবতারণা হয়। রাণীর প্রেরিত দূতরা রাণীর উপঢৌকন নিয়ে হযরত সোলায়মানের দরবারে উপনীত হয়। হযরত সোলায়মান এটা অপছন্দ করেন। তাকে অর্থ দিয়ে কেনা বা ইসলামের দাওয়াত থেকে ফেরানোর মনোভাবের তিনি নিন্দা করেন। অতপর তিনি তার চূড়ান্ত হুমকি প্রদান করেন এই বলে,

'দূত যখন সোলায়মানের কাছে এলো, তখন সে বললো, তোমরা কি আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের সম্পদের চেয়ে ঢের ভালো। তোমরা বরং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। আমরা অবশ্যই তাদের কাছে এমন বাহিনী নিয়ে আসবো, যার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই।'

হযরত সোলায়মানের জবাবে সম্পদের প্রতি উপহাস করা হয়েছে এবং আদর্শ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধন সম্পদ প্রয়োগের মানসিকতার নিন্দা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন 'তোমরা কি আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছো?' অর্থাৎ এই নগণ্য ও সস্তা পার্থিব বস্তু আমাকে দিতে চাইছো? 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের সম্পদের চেয়ে ভালো।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে পার্থিব সম্পদও দিয়েছেন তোমাদের চেয়ে বেশী, আর ইসলামের জ্ঞান ও নবুওতের আকারে যে মহামূল্যবান সম্পদ দিয়েছেন, তাও যে কোনো পার্থিব সম্পদের চেয়ে ভালো। তা ছাড়া জ্বিন ও পাখীকে পর্যন্ত আমার অনুগত করে দেয়া হয়েছে। আমার সুখের জন্যে এর চেয়ে বেশী আর কিছুর প্রয়োজন নেই। 'বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকনাদি নিয়ে সুখে থাকো।'

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি এবং তার উপঢৌকন ও পুরস্কার লাভের পরিবর্তে এসব তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ লাভে যদি তোমাদের সুখ বোধ হয়, তবে সেই সুখ তোমরাই ভোগ করো।

তারপর এই নিন্দা ও ভর্ৎসনার পর হযরত সোলায়মান হুমকি দিলেন, 'তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও।' অর্থাৎ এসব উপঢৌকন ফেরত নিয়ে চলে যাও এবং ভয়াবহ পরিণতির প্রতীক্ষায়

থাকো। তিনি বললেন, 'আমরা অবশ্যই এমন এক বাহিনী নিয়ে তাদের কাছে আসবো, যাকে প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই।' অর্থাৎ সে বাহিনীকে পৃথিবীর কোথাও কেউ বশীভূত করতে যেমন পারে না, তেমনি সাবার রাণীরও ক্ষমতা নেই তার সাথে লড়বার। তিনি আরো বললেন, 'আর আমরা তাদের সেখান থেকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করবো।'

এই পর্যন্ত এসে এই আতংকজনক দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে এবং দূতেরা চলে যায়। এরপর আয়াতে এ সম্পর্কে নীরবতা পালন করা হয়, যেন ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে।

এ পর্যায়ে হযরত সোলায়মান বুঝতে পারেন যে, দূতদের কাছে পাঠানো এই জবাবই বিষয়টার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। কেননা রাণী তার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ চান না। আর এ বিষয়টা তার উপঢৌকনাদি সহকারে দূত পাঠানো দ্বারাই পরিষ্কার বুঝা গিয়েছিলো। হযরত সোলায়মান এটাও প্রত্যাশা করছিলেন বরং নিশ্চিতই ছিলেন যে, রাণী তার দাওয়াত গ্রহণ করবেন। বস্তুত রাণী তা যথার্থই গ্রহণ করেছিলেন।

তবে আয়াতে এ কথা জানানো হয়নি যে, রাণীর দূতেরা তার কাছে কিভাবে ফিরে গিয়েছিলো, তাকে কী বলেছিলো কিংবা রাণী তারপর কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আয়াতে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। আমরা শুধু পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে বুঝতে পারি যে, রাণী হযরত সোলায়মানের কাছে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত সোলায়মান তা জেনেও ফেলেছিলেন। তাই তিনি তার বাহিনীর সাথে আলোচনাও শুরু করে দিয়েছিলেন যে, রাণী তার দেশে যে সিংহাসন নিজ সেনাবাহিনীর প্রহরাধীন সুরক্ষিত করে রেখে সফরে বেরিয়ে পড়েছেন, সেই সিংহাসন রাণী পৌঁছার আগেই নিয়ে আসা যায় কিনা। 'সোলায়মান বললো, হে সভাসদবৃন্দ, রাণী আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে আসার আগে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে?.......' (আয়াত ৩৮, ৩৯ ও ৪০)

রাণী তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সদলবলে চলে আসার আগেই তার সিংহাসন নিয়ে আসার পেছনে হযরত সোলায়মানের উদ্দেশ্যটা কী তা কি পাঠক বুঝতে পারছেন? আমার ধারণা, খুব সম্ভবত এটা ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে ও ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে রাণীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে হযরত সোলায়মানের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার কৌশল।

জ্বিনদের ভেতর থেকে এক দানব তার এ কথা শুনে বললো, সে তার সিংহাসনটা হযরত সোলায়মানের চলতি এজলাস শেষ হবার আগেই হাযির করে দিতে পারে। কথিত আছে, তার এই এজলাস সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত চলতো, কিন্তু এ সময়টাও হযরত সোলায়মানের কাছে বেশী মনে হলো। তখন 'যার কাছে আসমানী কেতাবের জ্ঞান ছিলো' সে বললো, হযরত সোলায়মান চোখের পলক ফেলার আগেই সে তা এনে দিতে পারে। এই ব্যক্তির নাম এবং কোন আসমানী কেতাবের জ্ঞান তার কাছে ছিলো, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আমরা শুধু এতটুকু বুঝতে পারছি যে, সে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত একজন মোমেন বান্দা ছিলো। আল্লাহর সেই সর্বোচ্চ ও অজেয় শক্তির একটা অংশ তাকে গোপনে দেয়া হয়েছিলো, যার সামনে কোনো বাধাই টিকতে পারে না এবং যে কোনো দূরত্বই তার সামনে নস্যি। আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কারো কারো মধ্যে যে জিনিসটা কখনো কখনো দেখা যায়, কিন্তু এর রহস্য বা ব্যাখ্যা কখনো উদঘাটিত হয়নি। কেননা তা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রণালীর আওতা বহির্ভূত। অলীক ও উদ্ভট কল্পকাহিনীর সাথে এগুলোর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

'আসমানী কেতাবের জ্ঞান' এই উক্তিটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাফসীরকাররা নানা রকমের মতামত দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাওরাতের জ্ঞান। কেউ কেউ বলেছেন, সে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম 'এসমে আযম' জানতো। কেউ কেউ অন্যান্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তবে কেউই নিজ নিজ মতামতের পক্ষে কোনো নিশ্চিত কারণ বা প্রমাণ দর্শাতে পারেননি। তবে বিষয়টার প্রতি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টি দিলে ব্যাপারটা এসব কিছুর চেয়েও সহজ মনে হবে। এই মহাবিশ্বে এমন বহু রহস্য রয়েছে, যা আমরা জানি না এবং এমন বহু শক্তি রয়েছে, যা আমরা ব্যবহার করি না। মানুষের সত্ত্বায়ও এমন বহু রহস্য ও শক্তি রয়েছে, যার কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। এসব শক্তি ও রহস্যের কোনো একটারও সন্ধান যখন আল্লাহ তায়ালা কাউকে দিতে ইচ্ছা করেন, তখনই ঘটে যায় সেই অলৌকিক ঘটনা, যা মানব জীবনে সচরাচর ঘটে না। এ ঘটনা নিছক আল্লাহর ইচ্ছায়, আদেশে ও ব্যবস্থায়ই ঘটে। যার হাতে আল্লাহ তায়ালা ঘটনাটা ঘটাতে চান না, সে তা ঘটাতে পারে না।

হযরত সোলায়মানের সভাসদদের মধ্যে যে ব্যক্তির কাছে আসমানী কেতাবের জ্ঞান ছিলো, সে তার জ্ঞানের কারণেই এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলো। তার হাতে যে অলৌকিক ঘটনাটা ঘটেছিলো, সেটা ঘটানোর ক্ষমতা যেসব মহাজাগতিক শক্তির ছিলো, তার সাথে তার সংযোগ ঘটেছিলো সে জ্ঞানেরই কারণে ও প্রেরণায়। কেননা এ কেতাবের জ্ঞান তার মনকে আল্লাহর সাথে এমনভাবে যুক্ত করে দিয়েছিলো, যাতে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শক্তি ও রহস্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই ব্যক্তি আর কেউ নয়, স্বয়ং হযরত সোলায়মান। আমার ধারণা, তিনি নন। তিনি হলে আয়াতে তার নামই বলা হতো। কেননা ঘটনাটা তার সম্পর্কেই। কাজেই তার নাম গোপন করার কোনো আবশ্যকতা নেই। কেউ বলেছেন, এই ব্যক্তির নাম আসেফ বিন বরখিয়া। তবে এ বক্তব্যের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

'যখন সোলায়মান দেখলো, সিংহাসনটা তার কাছেই রয়েছে, তখন বললো, এটা আমার মালিকের অনুগ্রহেরই ফল; যাতে করে তিনি আমাকে যাচাই করেন যে, আমি তার শোকর করি, না নাশোকরী করি। .... ' (আয়াত ৪০)

এই চাঞ্চল্যকর আকস্মিক ঘটনা হযরত সোলায়মানের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তার ইচ্ছা এমন অলৌকিকভাবে পূরণ করলেন দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, এমন অসাধারণ উপায়ে প্রাপ্ত এ অনুগ্রহও একটা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পাস করতে হলে তার ভেতরে বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর বিশেষ সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন এবং আল্লাহর এই নেয়ামত ও অনুগ্রহের মর্যাদা উপলব্ধি করা আবশ্যক। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সচেতনতার মর্যাদা দেবেন ও তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। আসলে আল্লাহ তায়ালা তো শোকর আদায়কারীদের শোকরের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি শোকর করে সে নিজেরই উপকার সাধন করে, আল্লাহর কাছ থেকে আরো বেশী নেয়ামত লাভ করে এবং পরীক্ষায় পাস করার জন্যে উত্তম সাহায্য লাভ করে। 'আর যে ব্যক্তি নাশোকরী করে, আল্লাহ তায়ালা তার মুখাপেক্ষী নন', অর্থাৎ তার শোকরের মুখাপেক্ষী নন এবং 'আল্লাহ মহানুভব।' অর্থাৎ তিনি শোকরের প্রত্যাশায় দান করেন না, বরং নিজের মহানুভবতার জন্যেই দান করেন।

আল্লাহর নেয়ামতের সামনে এরূপ অভিভূত হওয়া এবং এই নেয়ামতের আড়ালে যে পরীক্ষা রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর হযরত সোলায়মান প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন সাবার

রাণী– যিনি একটু পরেই আসছেন, তার জন্যে বিবিধ রকমের বিস্ময়োদ্দীপক দৃশ্যপট সৃষ্টি করতে।

সোলায়মান বললো, 'রাণীর সিংহাসনটাকে অচেনা বানিয়ে দাও, দেখবো সে চিনতে পারে কিনা।' (আয়াত ৪১)

অর্থাৎ সিংহাসনের চিহ্নগুলো পাল্টে দাও, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, সে সিংহাসনের চিহ্নগুলো এভাবে পাল্টে দেয়ার পরও তা চিনতে পারার মতো বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার অধিকারী, না কি চিহ্ন পাল্টানোর কারণে ওটা তার কাছে অচেনাই থেকে যায়।'

সম্ভবত এ মহিলার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা কেমন এবং সিংহাসনের ব্যাপারে গোলক ধাঁধায় পড়ে গিয়ে সে কী করে, তা দেখা ও পরীক্ষা করার জন্যেই হযরত সোলায়মান এ ব্যবস্থা করেন। সহসা রাণী উপস্থিত হয়ে গেলেন। 'উপস্থিত হওয়া মাত্র বলা হলো, তোমার সিংহাসনটা কি এ রকম? সে বললো, মনে হচ্ছে ওটাই।'

আসলে এটা এতো বড় গোলক ধাঁধা ছিলো যে, রাণী তা কল্পনাও করতে পারেননি। কোথায় সিংহাসন তালাবদ্ধ করে পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখে এসেছেন, আর কোথায় তা হযরত সোলায়মানের রাজধানী বায়তুল মাকদেসে? কিভাবে তা আনা হলো? কে আনলো?

কিন্তু গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করে ও চিহ্ন পাল্টে যতো অচেনাই করা হোক, সিংহাসনটা ছিলো তারই।

রাণী ক্ষণেক ভেবে নিলেন যে, তিনি কি অস্বীকার করবেন, ওটা তার সিংহাসন নয়, না কি স্বীকার করে নেবেন? কেননা কিছু কিছু চিহ্ন তো তখনো রয়েছে। অবশেষে তিনি খুবই বুদ্ধিমতিসুলভ জবাব দিলেন যে, 'মনে হচ্ছে ওটাই।' অস্বীকারও করলেন না, স্বীকারও করলেন না। আকস্মিক গোলক ধাঁধায় পড়ে কেমন প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে হয়, সেটাই তিনি দেখালেন।

এখানে আয়াতে ঘটনার কিছু অংশ উহ্য রাখা হয়েছে। যেন রাণী আকস্মিক গোলক ধাঁধার রহস্য ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, উপঢৌকন ফেরত দেয়ার পর থেকেই তিনি আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণপূর্বক হযরত সোলায়মানের কাছে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'আমরা আগেই জ্ঞান লাভ করেছি এবং ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

এ পর্যায়ে কোরআন হযরত সোলায়মানের চিঠি পাওয়ার পর রাণীর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করছে। কারণটা এই যে, রাণী একটা অমুসলিম জাতির সন্তান এবং আল্লাহর সৃষ্টি সূর্যের পূজা করার কারণেই তিনি আল্লাহর উপাসনা করেননি।

'সে আল্লাহ ছাড়া অন্য যে জিনিসের পূজা করতো, সেটাই তাকে আল্লাহর এবাদাত থেকে দূরে রেখেছে। আসলে সে ছিলো একটা কাফের জাতির সন্তান।' (আয়াত ৪৩)

হযরত সোলায়মান রাণীর জন্যে আরো একটা গোলক ধাঁধা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সেটা হলো,

'তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো।' (আয়াত ৪৪)

এই গোলক ধাঁধাটা ছিলো স্বচ্ছ কাঠের একটা প্রাসাদ, যার ভিত গড়া হয়েছিলো পানির ওপর। ওর ফলে পুরো প্রাসাদটাকেই একটা জলাশয় মনে হচ্ছিলো। তাই রাণীকে যখন বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো, তখন তিনি ভাবলেন, তিনি জলাশয়ে নামতে যাচ্ছেন, এ জন্যে পায়ের গোছার ওপর কাপড় তুলে নিলেন। রাণী যখন সত্যই গোলক ধাঁধায় মতিভ্রান্ত হলেন।

তখন হযরত সোলায়মান তাকে তার রহস্য জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'ওটা তো একটা কাঠের প্রাসাদ।'

রাণী এসব গোলক ধাঁধায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কেননা এগুলো সবই ছিলো অসাধারণ ও অলৌকিক। এগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো, হযরত সোলায়মানের অধীনে মানুষের চেয়েও অনেক বড় বড় শক্তি কর্মরত রয়েছে। তাই রাণী আল্লাহর দিকে মনোনিবিষ্ট হলেন। তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যের পূজা করে এ যাবত যে গুনাহ করেছে, তার জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, তার ইসলাম গ্রহণ হযরত সোলায়মানের 'জন্যে' নয় বরং ইসলাম গ্রহণটা ছিলো শুধু 'আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে।'

রাণীর হৃদয়ের বন্ধ দরজা যখন খুলে গেলো, তখন তিনি বুঝলেন, ইসলাম গ্রহণ আল্লাহর কোনো সৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণের নাম নয়– এমনকি এতো সব অলৌকিক কান্ড যিনি ঘটালেন, সেই নবী হযরত সোলায়মানের কাছেও নয়, বরং একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নাম। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও ঈমানের দিকে আহ্বানকারী মোমেনদের সমপর্যায়ের সাথী হওয়ার নাম।

কোরআনের এ আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টা খুবই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও আত্মসমর্পণের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। এ দ্বারাই সেই প্রতাপ ও পরাক্রমের অধিকারী হওয়া যায়, যা পরাজিতদের বিজয়ীতে পরিণত করে। অন্য কথায় বলা যায়, এভাবেই বিজয়ী ও বিজিত উভয়ে আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যায়। কেউ কারো ওপর বিজয়ী নয় এবং কেউ কারো পদানত নয়। সবাই রব্বুল আলামীনের সমান বান্দা, পরস্পরে ভাই ভাই।

কোরায়েশ নেতারা রসূলের ইসলামের দাওয়াতে বিরক্ত হতো। কারণ তারা অহংকারী ছিলো। আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মাদের অনুগত হতে তারা প্রস্তুত ছিলো না, কিন্তু এ সূরায় এক নারীর ইতিহাস বর্ণনা করা হলো। যে নারী তাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে এবং আহ্বানকারী ও আহূতদের মধ্যে যথার্থ সাম্য গড়ে তোলে। কেননা তারা সর্বজগতের প্রতিপালক ও প্রভু বিধাতার কাছে তার রসূলের সাথেই আত্মসমর্পণ করে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ
طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ
رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

রুকু ৪

৪৫. আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম (সে বলেছিলো), তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, (এ আহ্বানের সাথে সাথে) তার (জাতির) লোকেরা (মোমেন ও কাফের এই) দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলো। ৪৬. (সে বললো, একি হলো তোমাদের!) তোমরা কেন (ঈমানের) কল্যাণের পরিবর্তে (আযাবের) অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাইছো, কেন তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, (এতে করে) তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হতে পারে। ৪৭. তারা বললো, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের সবাইকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবেই (দেখতে) পেয়েছি; (এ কথা শুনে) সে বললো, (আসলে) তোমাদের শুভাশুভ সবই তো আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারে; (মূলত) তোমরা এমন এক দলের লোক যাদের (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পরীক্ষা করা হচ্ছে। ৪৮. সে শহরে ছিলো (নেতা গোছের) এমন নয় জন লোক, যারা আমার যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো, সংশোধনমূলক কোনো কাজই তারা করতো না। ৪৯. (একদিন) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো তোমরা আল্লাহর নামে সবাই কসম করো যে, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার (ঈমানদার) সাথীদের মেরে ফেলবো, অতপর (তদন্ত এলে) আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলবো, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা তো (সেখানে) উপস্থিত ছিলামই না, আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি। ৫০. তারা (যখন সালেহকে মারার জন্যে এ) চক্রান্ত করছিলো, (তখন) আমিও (তাকে রক্ষা করার জন্যে এমন এক) কৌশল (বের) করলাম, যা তারা (বিন্দুমাত্রও) বুঝতে পারেনি। ৫১. (হে নবী, আজ) তুমি দেখো, তাদের চক্রান্তের কী পরিণাম হয়েছে, আমি তাদের এবং তাদের জাতির সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

৫২. (চেয়ে দেখো,) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি, তাদেরই যুলুমের কারণে তা (আজ) মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; অবশ্য এ (ঘটনার) মাঝে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (শিক্ষার অনেক) নিদর্শন রয়েছে। ৫৩. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, আমি তাদের (আমার আযাব থেকে) মুক্তি দিয়েছি।

তাফসীর

আয়াত ৪৪-৫৩

পবিত্র কোরআনে অধিকাংশ জায়গায় হযরত সালেহ ও তার জাতি সামূদের কাহিনী, হযরত নূহ, হূদ, লূত ও শোয়ায়ব সংক্রান্ত সাধারণ কেসসা-কাহিনীর ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় কখনো কখনো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীও বর্ণিত হয়, আবার কখনো হয় না। বর্তমান সূরায় যেখানে বনী ইসরাঈলের কাহিনীই কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে হযরত মূসা, দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনী অপেক্ষাকৃতভাবে এবং হযরত হূদ ও শোয়ায়বের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রসংগ এখানে একেবারেই আসেনি।

হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনীর ক্ষেত্রে উষ্ট্রীর ব্যাপারটা আসেনি– এসেছে শুধু হযরত সালেহ (আ.) ও তার আপনজনদের বিরুদ্ধে নয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্র পাকানোর কাহিনী। এই ষড়যন্ত্র যেমন হযরত সালেহের অজান্তে পাকানো হয়েছিলো, তেমনি আল্লাহ তায়ালাও তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সমগ্র সামূদ জাতিকে তিনি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী হযরত সালেহের ওপর ঈমান এনে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতো, তাদের আল্লাহ আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহী সামূদ জাতির বিধ্বস্ত জনপদের কাছ দিয়ে মক্কার মোশরেকরা চলাফেরা করতো। অথচ তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো না।

সালেহ (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

'আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই বাণী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করো। 'এর ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দুটো বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো।' একটামাত্র কথার মধ্য দিয়ে হযরত সালেহের রেসালাতের মর্মবাণী তুলে ধরা হয়েছে। সেই মর্মবাণী হলো! 'একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করো।' আসলে এটাই ছিলো সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা। যদিও এ বিশ্বজগতে মানব জাতির চারপাশে যা কিছুই বিদ্যমান, তার প্রতিটি বস্তুই এ দাওয়াত গ্রহণ করার আহ্বান জানায়, কিন্তু মানব জাতি কতো প্রজন্ম ও কতো যুগ যে সে সত্যকে অস্বীকার করে কাটিয়ে দিয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। আজও মানব জাতির একটা অংশ এই শাশ্বত সত্য অস্বীকার করে আল্লাহর একমাত্র সহজ সরল সত্য পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

পক্ষান্তরে হযরত সালেহ সামূদ জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পর এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা চালানোর পর তাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো, কোরআন তার বর্ণনা দিয়েছে যে, তারা

দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। একটা দল হযরত সালেহের দাওয়াত গ্রহণ করে, আর অপর দল করে তার বিরোধিতা। কোরআনের অন্যান্য সূরা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিরোধী দলই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই পর্যায়ে এসে কোরআন নীরবতা অবলম্বন করে এবং এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, যারা হযরত সালেহের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত ও প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা হযরত সালেহকে এই বলে তাড়া দিচ্ছিল যে, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও তা দ্রুত নিয়ে এসো। তারা কোথায় আল্লাহর হেদায়াত ও রহমত কামনা করবে, তা না করে আযাব চেয়ে বসলো। কোরায়শরাও রসূল (স.)-এর সাথে অনুরূপ আচরণই করছিলো। যা হোক, হযরত সালেহ সামূদ জাতির এ আচরণে ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যে, তারা হেদায়াত না চেয়ে দ্রুত আযাব নাযিল করার আবদার ধরলো। তিনি তাদের আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, এভাবে হয়তো তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত নেমে আসবে,

'সালেহ বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কল্যাণের আগে অকল্যাণ চাইছো কেন? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও না কেন? হয়তো তোমাদের ওপর রহমত হবে।' (আয়াত ৪৭)

অবিশ্বাসী কোরায়শদের মনের বক্রতা এতোদূর গড়িয়েছিলো যে, তারা বলতো, 'হে আল্লাহ, এই দাওয়াত যদি তোমার পক্ষ থেকে আগত সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এনে দাও।' অথচ এর পরিবর্তে তারা এ কথাও বলতে পারতো, 'হে আল্লাহ, এই দাওয়াত যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের এর ওপর ঈমান আনার ও একে সত্য বলে মেনে নেয়ার পথে চালিত করো।'

হযরত সালেহের জাতিও এ ধরনের কথা বলতো। তাদের রসূল তাদেরকে তাওবা, এসতেগফার ও রহমত কামনা করে দোয়া করার যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তার প্রতি তারা কর্ণপাতও করতো না। উপরন্তু তারা এই বলে অজুহাত খাড়া করতো যে, তারা তাকে ও তার সাথীদেরকে তাদের জন্যে অমঙ্গলজনক মনে করে এবং তাদের দ্বারা তাদের ক্ষতি হবে বলে শংকিত। 'তারা বললো, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমংগল ও অশুভ মনে করি। .....'

'তাতাইয়ুর' শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে অমংগল, অকল্যাণ বা অশুভ মনে করা। অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা নিজেদের কল্পনাপ্রসূত ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার অনুসরণ করতো। এর ফলে তারা তা থেকে সত্যিকার ঈমানের পথে ধাবিত হতে সক্ষম হতো না। কখনো কখনো তাদের কেউ কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে কোনো একটা পাখীর আশ্রয় নিতো। সে পাখীটাকে তাড়া দিতো। এতে পাখীটা যদি তার ডান দিক থেকে উড়ে বাম দিকে চলে যেতো, তাহলে সে খুশী হতো এবং যে কাজের উদ্যোগ নিয়েছে তা মংগলজনক হবে ভেবে এগিয়ে যেতো। আর যদি পাখীটা তার বাম থেকে ডান দিকে যেতো, তাহলে এটাকে অশুভ সংকেত মনে করতো এবং ক্ষতির আশংকায় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করতো। অথচ পাখী গায়েব জানে না এবং তার স্বতস্ফূর্ত কার্যকলাপ কোনো বিষয়ের দিকনির্দেশক হয় না, কিন্তু মানুষের মন স্বভাবতই এমন কোনো অজানা অদৃশ্য সত্তার ওপর বিশ্বাস না করে থাকতে পারে না, যার কাছে সে তার সমস্ত অজানা ও ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয় সোপর্দ করে দিয়ে চিন্তামুক্ত হতে পারে।

অজানা অদৃশ্য সত্তার ওপর বিশ্বাসের এই স্বতস্ফূর্ত তাগিদ তাকে যদি সমুদয় অদৃশ্য জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ না করে, তাহলে তা তাকে এই জাতীয় কল্পনাপ্রসূত ধ্যান ধারণা ও কুসংস্কারের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যার কোনো শেষ সীমা নেই, যা কোনো যুক্তির ধার ধারে না এবং যার কোনো কিছুতেই তৃপ্তি ও বিশ্বাস আসে না।

এমনকি আজকের যুগেও আমরা দেখতে পাই, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে ইচ্ছুক নয়, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করার আহ্বান শুনলে নাক সিঁটকায় এবং মনে করে করে, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে যে, এখন ধর্মের ন্যায় কুসংস্কারে (!) বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে বেমানান, তারা কিন্তু অত্যধিক গুরুত্বের সাথে ১৩কে অশুভ সংখ্যা, সামনে দিয়ে কালো বিড়ালের রাস্তা পার হওয়াকে কুযাত্রার লক্ষণ এবং দিয়াশলাইর একটা কাঠি দিয়ে দুটোর বেশী খাম জ্বালানোকে ঘোরতর অমংগলজনক মনে করে থাকে। এ ছাড়া এ ধরনের বহু হাস্যকর ও তুচ্ছ বিষয়কে তারা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, তারা তাদের নিজেদের জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে বৈরী আচরণে লিপ্ত। অথচ সত্য বিশ্বাসের প্রতি প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত দুর্নিবার আকর্ষণ ও ঝোঁক রয়েছে।(১)

বিশ্বজগতে এমন বহু সত্য রয়েছে, যা এখনো মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। সেসব সত্যের ব্যাখ্যা দিতে মানুষ বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হয়। কোনো কোনো সত্য এমনও রয়েছে, যা কস্মিনকালেও বিজ্ঞানের আওতার ভেতরে আসবে না। কেননা সেগুলো মানবীয় ক্ষমতার চেয়েও অনেক বড়, মানুষের দায়িত্ব ও কর্মের সীমার বাইরে অবস্থিত এবং পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের সেসব প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও প্রতিভার অতিরিক্ত, যা মানুষকে ওই দায়িত্বের প্রয়োজন অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। এসব সত্যকে জয় করার একমাত্র উপকরণ হচ্ছে বিশ্বাস, প্রত্যয় বা ঈমান। সামূদ জাতি যখন এহেন চরম নির্বোধ-সুলভ কথা হযরত সালেহকে বললো, তখন হযরত সালেহ তাদের ঈমানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে পুনরায় বললেন,

'তোমাদের অমংগল আল্লাহর কাছে রয়েছে'....... অর্থাৎ তোমাদের ভাগ্য, ভবিষ্যৎ ও পরিণতি আল্লাহর হাতে। আল্লাহর কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। তিনি মানুষকেও কিছু বিধি-বিধান দিয়েছেন এবং কোন্টা সঠিক পথ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সেই বিধান মেনে চলবে, সে নির্ঘাত কল্যাণের অধিকারী হবে। তার আর কোনো ভাগ্য নির্ণয়ের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে না, আর যে ব্যক্তি সেই বিধান অমান্য করবে, সে অকল্যাণ অমংগলের শিকার হবেই। ভাগ্য নির্ণয়ের কোনো কৌশল এতে সুফল দেবে না।

'বরঞ্চ তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন একটা জাতি।'

অর্থাৎ তোমাদের কখনো আল্লাহর নেয়ামত দিয়ে, কখনো সুখ শান্তি দিয়ে আবার কখনো দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যেক অবস্থা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার পেছনে যে পরীক্ষা নিহিত রয়েছে, তার ব্যাপারে সজাগ থাকাই চূড়ান্ত পর্যায়ে কল্যাণ ও মংগল বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষ, পাখী কিংবা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টিকে শুভ লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা দ্বারা কোনোই লাভ হয় না বা কোনো কল্যাণই নিশ্চিত হয় না।

---

(১) পশ্চিমী দুনিয়ার আধুনিক জাহেলরা এখন ১৩ সংখ্যাটিকে এতোই অশুভ মনে করে যে, তাদের অনেকেই এই সংখ্যাটা মুখেই আনতে চায় না। এসব দেশে কোনো লোকের ঘর, হোটেল কক্ষের নাম্বার, গার্লফ্রেন্ড ও বয়ফ্রেন্ডের জন্ম তারিখ, বিয়ে বার্ষিকী ইত্যাদি যদি কখনো এই তারিখে পড়ে, তাহলে তারা থার্টিন না বলে 'টুয়েলভ প্লাস' শব্দ ব্যবহার করে। আবার যদি এই ১৩ তারিখ শুক্রবার হয়ে পড়ে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। বছর দুয়েক আগে এমনি একটি কো-ইন্সিডেন্স-এর পর প্যারিসে তো রীতিমতো লঙ্কাকান্ড ঘটে যাওয়ার উপক্রম হয়। লন্ডনের দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা এদিনে আধুনিক জাহেলদের কর্মকান্ডের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সম্ভবত এই একই দৈনিকে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।—সম্পাদক

এভাবে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের সঠিক ও স্বচ্ছ মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের ওপর বা তাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে তাদের মনকে সচকিত ও চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত করে। সঠিক আকীদা বিশ্বাস মানুষকে এই উপলব্ধি দান করে যে, সব কিছুর পেছনেই আল্লাহর হাত রয়েছে, কোনো কিছুই অকারণে বা কাকতালীয়ভাবে ঘটে না; বরং আল্লাহ যা কিছুই ঘটান, কল্যাণ ও মংগলের জন্যেই ঘটান। একমাত্র এরূপ উপলব্ধি এবং বিশ্বাসের দ্বারাই জীবনের মূল্য ও মানুষের মর্যাদা বাড়ে। এর কারণেই এই গ্রহে জীবন যাপন করার সময় চারপাশের সৃষ্টিজগত, তার স্রষ্টা ও যে সকল ফেরেশতা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম মহান স্রষ্টার আদেশে এই মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার সাথে মানুষের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে।

কিন্তু এই সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধ যুক্তি কেবল তাদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, যাদের মন মগয বিকৃত হয়নি এবং এতোটা বিপথগামী হয়নি যা সংশোধনের অযোগ্য। হযরত সালেহের জাতির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে নয় জন এমন ছিলো, যাদের বিবেক সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের অন্তরে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে বিন্দুমাত্রও স্থান অবশিষ্ট ছিলো না। তারা হযরত সালেহ ও তার স্বজনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে দিলো,

'শহরে এমন নয় ব্যক্তি ছিলো, যারা দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা ছড়াতো .... ' (আয়াত ৪৮ ও ৪৯)

সর্বক্ষণ কুচিন্তা ও কুকর্মে বিভোর এই নয় ব্যক্তির অন্তরে সততা ও সদাচার বরদাশত করার মত এক বিন্দু পরিমাণ উদারতা নমনীয়তাও ছিলো না। ফলে হযরত সালেহের দাওয়াত ও যুক্তিতর্কের প্রতি তারা একেবারেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠলো এবং তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটতে শুরু করে দিলো। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আল্লাহর এবাদাতের দাওয়াত দেয়ার অপরাধে হযরত সালেহ ও তার স্বজনদের হত্যা করার এই জঘন্য চক্রান্তের জন্যে মহান আল্লাহর নামে কসম খেতেও তাদের বিবেকে বাধেনি।

এটাও কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে, তারা পরস্পরকে বললো, 'তোমরা আল্লাহর নামে শপথপূর্বক অংগীকার করো যে, তাকে ও তার পরিজনবর্গকে হত্যা করবো এবং তারপর তার অভিভাবককে বলবো, আমরা তার হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিনি।' অর্থাৎ আমরা তার হত্যাকান্ডের সময় উঁপস্থিত ছিলাম না। 'আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।' অর্থাৎ আমরা বলবো যে, আমরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। কেননা যারা তাকে হত্যা করেছে তারা রাতের অন্ধকারে হত্যা করেছে, তাই অন্ধকারের জন্যে দেখা যায়নি।

এটা আসলে একটা খোঁড়া যুক্তি ছিলো। কিন্তু এ দ্বারা তারা নিজেদের মনকে বুঝ দিচ্ছিলো এবং হযরত সালেহ ও তার পরিবার পরিজনকে হত্যার পরিকল্পনা করার পর তার উত্তরাধিকারীদের প্রতিশোধ থেকে বাঁচার জন্যে মিথ্যা অজুহাত তৈরী করছিলো। এ ধরনের লোকেরাও যে নিজেদের সত্যবাদী সাব্যস্ত করতে চায়, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর বটে। তবে মানুষের মন নানা রকমের জটিলতা ও বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ থাকে, বিশেষত যখন সে ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা এই আলোই তাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকে।

এভাবেই তারা ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকলো, কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, অথচ তারা তা বুঝতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তারা একটা ষড়যন্ত্র পাকালো। আমিও একটা একটা কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা কিছুই টের পেলো না।' (আয়াত ৫০)

স্বৈরাচারীরা অনেক সময় হিসাবে ভুল করে থাকে। নিজেদের ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যে তাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করতে পারেন, সে কথা ভুলে যায়,

'অতএব, লক্ষ্য করো, তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি কেমন হয়েছিলো? ...... (আয়াত ৫১-৫২)

এক নিমেষেই সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো এবং ঘরবাড়ী জনমানবশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। অথচ এক মুহূর্ত আগেও তারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল এবং সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তারা নিজেদের পুরোপুরি সক্ষম মনে করছিলো।

আয়াতে আল্লাহর শাস্তির এই দ্রুততা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে আযাবের আকস্মিকতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহ যে সেসব আত্মপ্রবঞ্চিত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে পর্যুদস্ত হবার পাত্র নন, তাতে কোনোই সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে।

'নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

এই সূরায় এবং এর ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় জ্ঞানকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আলোচ্য উক্তিতে আরেকবার তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে।

এই আকস্মিক আযাবের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহভীরু মোমেনদের নিষ্কৃতি দেয়ার কথা জানানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর আমি সমস্ত ঈমানদার ও আল্লাহভীরু লোকদের নিষ্কৃতি দিলাম।' (আয়াত ৫৩)

কেননা এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্য সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করবেন এবং দুরকম ভয় (অর্থাৎ আল্লাহর ভয় ও বান্দার ভয়) একত্রিত করবেন না।

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ وَاَنۡتُمۡ تُبۡصِرُوۡنَ ﴿٥٤﴾ اَئِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَهۡوَةً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ تَجۡهَلُوۡنَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اَخۡرِجُوۡۤا اٰلَ لُوۡطٍ مِّنۡ قَرۡيَتِكُمۡ ۚ اِنَّهُمۡ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوۡنَ ﴿٥٦﴾ فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗۤ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرۡنٰهَا مِنَ الۡغٰبِرِيۡنَ ﴿٥٧﴾ وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ ﴿٥٨﴾

৫৪. আর (এক নবী ছিলো) লূত, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ নিয়ে আসো, অথচ তোমরা (এর পরিণাম) ভালো করেই দেখতে পাচ্ছো! ৫৫. তোমরা কি (তোমাদের) যৌনতৃপ্তির জন্যে নারী বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছেই আসবে? (মূলত) তোমরা হচ্ছো একটি মূর্খ জাতি। ৫৬. তার জাতির লোকদের কাছে এছাড়া আর কোনো উত্তরই ছিলো না যে, লূত পরিবারকে তোমাদের এ জনপদ থেকে বের করে দাও, কেননা এরা কয়েকজন (আসলেই) বেশী ভালো মানুষ। ৫৭. (পরিশেষে) আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, তাকে আমি পেছনে পড়ে থাকা (আযাবে নিমজ্জিত) মানুষদের সাথে শামিল করে দিয়েছিলাম। ৫৮. অতপর (যারা পেছনে রয়ে গেছে) তাদের ওপর আমি (গযবের) বৃষ্টি নাযিল করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্য এ বৃষ্টি, (যা সেদিন) ভীত সন্ত্রস্ত এ জাতির (ওপর) পাঠানো হয়েছিলো কতোই না নিকৃষ্ট ছিলো!

তাফসীর

আয়াত ৫৪-৫৮

হযরত লূতের (আ.) কাহিনীর এই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত অংশটুকুতে দেখানো হয়েছে কিভাবে হযরত লূতের জাতি তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেছে। এর কারণ একটাই। তিনি তাদের সেই জঘন্য কুৎসিত ও অশ্লীল কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, যার ব্যাপারে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিলো এবং যা তারা প্রকাশ্যে করতো। শুধু মানব জাতির ভেতরে নয় বরং সমগ্র প্রাণী জগতের ভেতরেও যা বিরল এবং যা মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত রীতির পরিপন্থী, সেই ঘৃণ্যতম অপরাধ সমকামে তারা আক্রান্ত ছিলো।

কওমে লূতের বিকৃত রুচী

মানব জাতির ইতিহাসে এটা একটা বিরল অপরাধ। কোনো মানসিক বা দৈহিক অস্বাভাবিকতার কারণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এ অপরাধে জড়িত হয়ে যেতে পারে সাময়িকভাবে। পুরুষে পুরুষে সমকামের ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটে সামরিক ব্যারাকগুলোতে, যেখানে নারীর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কারাগারেও দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের মধ্যে এ প্রবণতা দেখা দিতে পারে নারী সংসর্গ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে অদম্য কাম বাসনার চাপে। তবে কোনো সাধারণ জনপদে, যেখানে নারী সহজলভ্য এবং বিয়ে শাদীও সহজ সাধ্য, সেখানে এটা একটা প্রথায় পরিণত হওয়া সত্যিই মানবেতিহাসের বিরলতম ঘটনা।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের এক লিংগের অপর লিংগের প্রতি জন্মগতভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কেননা তিনি গোটা প্রাণী জগতকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ ও তাদের অজানা আরো বহু সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।' বস্তুত তিনি প্রাণী মাত্রকেই জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন, চাই তা উদ্ভিদ হোক, পশু, পাখী, সরীসৃপ, পোকামাকড় বা অন্য কোনো অজানা সৃষ্টি হোক। জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট শুধু প্রাণীই নয়, জীব জড় নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। এমনকি অণু বা এ্যাটমও একটা পজেটিভ ও একটা নেগেটিভ ইলেকট্রোনের সমষ্টি। এই অণু হচ্ছে সমগ্র বিশ্বজগতের মূল একক।

মোট কথা, অকাট্য সত্য এই যে, সমগ্র প্রাণী জগতই জোড়ায় জোড়া সৃজিত। এমনকি যে প্রাণীর স্বজাতির মধ্য থেকে কোনো নর ও নারী নেই, তার প্রতিটির ভেতরে নরকোষ ও নারী কোষ রয়েছে এবং এই দু'ধরনের কোষের মিলনের কারণেই সে প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

যেহেতু সৃষ্টিজগতের নিয়ম বিধিতে জোড়ায় জোড়ায় জন্মানোই জীবনের ভিত্তি, অন্য কথায়, জোড়া জোড়া হওয়া ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণকে জন্মগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। এ আকর্ষণ শিখিয়ে দেয়ার বা উদ্বুদ্ধ করার অপেক্ষা রাখে না। এরূপ ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য, স্বতস্ফূর্ত জন্মগত তাড়নার ভিত্তিতেই যেন জীবনের বিকাশ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক প্রাণী তার এই জন্মগত তাড়না চরিতার্থ করায় আনন্দ পায়। প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরে সংরক্ষিত এই স্বাদ ও আনন্দের ভেতর দিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা আপন ইচ্ছা এমনভাবে বাস্তবায়িত করেন যে, তারা নিজেরাও তা টের পায় না। আর অন্য কেউও সে সম্পর্কে তাকে কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের অংগ প্রত্যংগ এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠন করেছেন উভয়ের মিলন স্বাভাবিক আনন্দ বাস্তবায়িত করে। এই সমন্বয় তিনি একই লিংগের দুই ব্যক্তির অংগ প্রত্যংগের মধ্যে সৃষ্টি করেননি।

তাই এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যের যেরূপ সর্বব্যাপী বিকৃতি হযরত লূতের জাতির ভেতরে সংঘটিত হয়েছিলো, সেটা যথার্থই বিস্ময়কর। বিশেষত স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পথে চলার জন্যে যেখানে কোনো অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

এ কারণেই হযরত লূত তার জাতির এই অপকর্মের প্রতিবাদে এমন বিস্ময়জড়িত ক্ষোভ প্রকাশ করেন,

'লূতের কথা স্মরণ করো, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করো, অথচ তোমরা সব কিছুই দেখছো?.........' (আয়াত ৫৪-৫৫)

প্রথম আয়াতটাতে তিনি এ জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করছেন যে, তারা যখন সমগ্র জীবন ও জগতকে স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেখছে, তখন কিভাবে এমন অস্বাভাবিক অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে পারছে?

এভাবে তো তারা নিজেদেরকেই সমগ্র প্রাণী জগতের মধ্যে একমাত্র স্বভাবভ্রষ্ট বিরল প্রজাতির প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে তার যে উক্তি স্থান পেয়েছে, তাতে তিনি সে অশ্লীল কাজের পরিচয় দিয়েছেন। কেবল কাজটার পরিচয় দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে কাজটা শুধু মানুষের নয়, বরং গোটা সৃষ্টি জগতেরই চির পরিচিত স্বাভাবিক রীতি-নীতির

পরিপন্থী। এরপর একে জাহেলী তথা অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফল বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'জাহল' শব্দের দুটো অর্থ, প্রথম, জ্ঞানহীনতা, দ্বিতীয়, নির্বুদ্ধিতা ও গোয়ার্তুমি। উভয় অর্থেই জাহেলী প্রতিফলিত হয়েছে এই ঘৃণ্য বিকৃতির মধ্য দিয়ে। কেননা প্রকৃতির রীতি যে জানে না, সে কোনো কিছুই জানে না। সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অকাট মূর্খ। আর যে ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়ম রীতি থেকে এতটা বিকারগ্রস্ত ও ভ্রষ্ট হয়, সে এমন একজন নির্বোধ, বোকা ও গোঁয়ার, যার পক্ষে অন্যদের অধিকার হরণ ও গ্রাস করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

তাদের বিকৃতির এই প্রতিবাদের জবাবে হযরত লূত (আ.)-এর জাতি সংক্ষেপে একটা কথাই বলেছিলো যে, লূত ও তার অনুসারীরা খুব সৎ ও পবিত্র মানুষ। ওদের স্থান এখানে নেই। ওদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। হযরত লূতের অনুসারীরা তার পরিবার-পরিজনের মধ্যেই সীমিত ছিলো, কেবল তার স্ত্রী ব্যতীত।

'তার জাতির একমাত্র জবাব ছিলো এই যে, লূতের অনুসারীদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। ওরা খুবই পবিত্র মানুষ।' (আয়াত ৫৬)

তাদের এ উক্তির অর্থ এও হতে পারে যে, তারা এই নোংরা ঘৃণ্য কাজ থেকে পবিত্র থাকাকে সরাসরি ব্যাংগ করছে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা এই যৌন বিকৃতিতে এতো বেশী ডুবে গিয়েছিলো যে, এই বিকৃত রুচিবোধে কোনো নোংরামি বা অশ্লীলতা থাকতে পারে, এটা তারা অনুভবই করতো না। তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকাকে পবিত্রতা আখ্যায়িত করাতেই তারা অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলো। আবার এই কাজ ত্যাগ করাকে পবিত্রতা আখ্যায়িত করায় এ উক্তির মাধ্যমে তারা বিরক্তিও প্রকাশ করে থাকতে পারে।

ঘটনা যাই হোক, তারা হযরত লূতের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণাই করে দিয়েছিলো। অপর দিকে আল্লাহ তায়ালাও তার বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন,

'অতপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে আযাব থেকে রক্ষা করেছিলাম, কেবল তার স্ত্রী ছাড়া[১] .... (আয়াত ৫৭-৫৮)

এখানে এই বৃষ্টির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি। তবে অন্যান্য সূরায় তা দেয়া হয়েছে। আমিও এখানে এর চেয়ে বেশী বিবরণ দিতে চাই না। তবে লূতের জাতিকে বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করার ভেতরে আমি বিশেষ একটা ইংগিত দেখতে পাই। বৃষ্টির মাধ্যমে যে পানি বর্ষিত হয়, তা জীবনদায়ক ও মাটিতে উদ্ভিদ উৎপাদক। অথচ এই পানি দিয়ে আল্লাহ একটা জাতিকে ধ্বংস করলেন। তারা যেমন তাদের বীর্যরূপী পানিকে তার উপযুক্ত কাজে– তথা মানবশিশু জন্মানোর কাজে ব্যবহার করেনি, তেমনি আল্লাহ তায়ালাও তাঁর প্রাণবাহী পানি দিয়ে প্রাণ সংহার করে তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিলেন। তবে আল্লাহ তায়ালাই এর প্রকৃত তাৎপর্য, রীতিনীতি এবং কর্ম কৌশল সম্পর্কে অধিক অবহিত। এই ঘটনায় আল্লাহর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র।

(১) এই মহিলা দুশ্চরিত্রা ছিলো এবং সে সমাজের প্রচলিত সমকামকে সমর্থন করতো। তাই তাকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ

রুকু ৫

৫৯. (হে নবী,) তুমি বলো, সমস্ত তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং (যাবতীয়) শান্তি তাঁর সেসব নেক বান্দার জন্যে, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন; (আসলে) কে শ্রেষ্ঠ- আল্লাহ তায়ালা? না এরা- (তাঁর সাথে) যাদের শরীক করে? ৬০. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন, (আবার) তা দিয়ে (যমীনে) মনোরম উদ্যান তৈরী করেছেন, অথচ তার (একটি ক্ষুদ্র) বৃক্ষ পয়দা করারও তোমাদের ক্ষমতা নেই; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কেউ মাবুদ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা অন্যকে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ সাব্যস্ত করছে! ৬১. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি যমীনকে (সৃষ্টিকুলের) বসবাসের উপযোগী করেছেন, (আবার) তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা, (যমীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে) তার মধ্যে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, দুই সাগরের মাঝে (মিষ্টি ও লোনা পানির) সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি? কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এ সত্যটুকুও) জানে না; ৬২. অথবা তিনিই (শ্রেষ্ঠ)- যিনি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরুপায় হয়ে) সে তাঁকেই ডাকতে থাকে, তখন (তার) বিপদ আপদ তিনি দূরীভূত করে দেন এবং তিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ কি আছে? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো; ৬৩. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি তোমাদের জলে স্থলের (গহীন) অন্ধকারে পথ দেখান, যিনি তাঁর অনুগ্রহ (-সম বৃষ্টি) বর্ষণের আগে তার সুসংবাদ বহন করার জন্যে বাতাস প্রেরণ করেন; (এ সব কাজে)

بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ

مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا

عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا

تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ কি আছে? আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, ওরা যা কিছু তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে; ৬৪. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)– যিনি (গোটা) সৃষ্টিকে (প্রথম বার) অস্তিত্বে আনয়ন করে (মৃত্যুর পর) তা আবার সৃষ্টি করবেন, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করছেন? আছে কি কোনো মাবুদ আল্লাহর সাথে (এসব কাজে)? তাদের তুমি বলো (হে নবী), যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (তার সপক্ষে) তোমাদের কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো। ৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানে না; তারা এও জানে না, কবে তাদের আবার (কবর থেকে) উঠানো হবে! ৬৬. (মনে হচ্ছে,) আখেরাত সম্পর্কে এদের জ্ঞান নিশেষ হয়ে গেছে। (না, আসলে তা নয়,) বরং তারা (এ ব্যাপারে) সন্দেহে (নিমজ্জিত হয়ে) আছে, কিন্তু তারা সে সম্পর্কে (জেনে বুঝেই) অন্ধ হয়ে আছে।

রুকু ৬

৬৭. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা ও আমাদের বাপদাদারা (মৃত্যুর পর) যখন মাটি হয়ে যাবো, তখনও কি আবার আমরা (কবর থেকে) উত্থিত হবো! ৬৮. এমন (ধরনের) ওয়াদা তো আমাদের সাথে এবং এর আগে আমাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছিলো, (আসলে) এগুলো ভিত্তিহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়! যা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে। ৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে সফর করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে? ৭০. তুমি ওদের (কোনো) কাজের ওপর দুঃখ করো না, যা কিছু ষড়যন্ত্র ওরা তোমার বিরুদ্ধে করুক না কেন (তাতেও) মনোক্ষুণ্ন হয়ো না!

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ

رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى

النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ

كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ

هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ

بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ اِنَّكَ عَلَى

الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا

وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا

৭১. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (আযাবের) ওয়াদা কখন আসবে! ৭২. (হে নবী,) তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টি তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার কিছু অংশ সম্ভবত তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে! ৭৩. অবশ্যই তোমার মালিক মানুষদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করে না। ৭৪. যা কিছু তাদের মন গোপন করে, আর যা কিছু তা বাইরে প্রকাশ করে, তোমার মালিক তা ভালো করেই জানেন। ৭৫. আসমান ও যমীনে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা (আমার) সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই। ৭৬. অবশ্যই এ কোরআন বনী ইসরাঈলদের ওপর তাদের এমন অনেক কথা প্রকাশ করে দেয়, যার ব্যাপারে তারা (একে অপরের সাথে) মতভেদ করে থাকে। ৭৭. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) হেদায়াত ও রহমত। ৭৮. (হে নবী,) তোমার মালিক নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ীই এদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বজ্ঞ, ৭৯. অতএব (হে নবী, সর্বাবস্থায়ই) তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করো; নিসন্দেহে তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো। ৮০. তুমি মৃত লোকদের কখনো (কিছু) শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আওয়ায শোনাতে পারবে না, (বিশেষ করে) যখন তারা (তোমাকে দেখে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৮১. (একইভাবে) তুমি অন্ধদেরও (তাদের) গোমরাহী থেকে সঠিক পথের ওপর আনতে পারবে না; তুমি তো শুধু তাদেরই (তোমার কথা) শোনাতে পারবে, যারা আমার

مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ

دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ

نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰٓى اِذَا

جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَلَمْ

يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى

আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী (আল্লাহ তায়ালার কাছে) আত্মসমর্পণ করে। ৮২. (শুনে রাখো,) যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় তাদের ওপর এসে পড়বে, তখন আমি মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্যে এক (অদ্ভুত) জীব বের করে আনবো, যা (অলৌকিকভাবে) তাদের সাথে কথা বলবে, মানুষরা (অনেকেই) আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না।

রুকু ৭

৮৩. (সেদিনের কথা ভাবো,) যেদিন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে এক একটি দলকে এনে জড়ো করবো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতপর তাদের বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ করে দেয়া হবে। ৮৪. এমনি করে ওরা যখন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) হাযির হবে, তখন (আল্লাহ তায়ালা তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে (শুধু এ কারণেই) অস্বীকার করেছিলে এবং তোমাদের (সীমিত) জ্ঞান দিয়ে তোমরা সে (আয়াতের মর্ম) পর্যন্ত পৌঁছুতে পারোনি, (বলো, তার সাথে) তোমরা (আর কি) কি আচরণ করতে? ৮৫. যেহেতু এরা (দুনিয়ার জীবনে নানা ধরনের) যুলুম করেছে, (তাই আজ) এদের ওপর (আযাবের) প্রতিশ্রুতি পুরো হয়ে যাবে, অতপর এরা (আর) কোনো রকম উচ্চবাচ্যও করতে পারবে না। ৮৬. এরা কি দেখেনি, আমি রাতকে এ জন্যেই তৈরী করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে, (অপরদিকে জীবিকার প্রয়োজনে) দিনকে বানিয়েছি আলোকোজ্জ্বল; অবশ্যই এর (দিবারাত্রির পার্থক্যের) মাঝে তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে। ৮৭. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা যমীনে আছে, তারা সবাই সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে (তাদের কথা) আলাদা যাদের আল্লাহ তায়ালা (এ থেকে বাঁচাতে) চাইবেন; সবাই সেদিন তাঁর সামনে অবনমিত অবস্থায় হাযির হবে। ৮৮. (হে মানুষ,

الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

আজ) তুমি পাহাড়কে দেখতে পাচ্ছো, তুমি মনে করে নিয়েছো তা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; (কিন্তু কেয়ামতের দিন) এ পাহাড়গুলোই মেঘের মতো উড়তে থাকবে, এটা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টির শৈল্পিক নিপুণতা, যিনি প্রতিটি জিনিস মযবুত করে বানিয়ে রেখেছেন; তোমরা যা কিছু করছো অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সেসব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন। ৮৯. (সেদিন) যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হবে তাকে উৎকৃষ্ট (প্রতিফল) দেয়া হবে, এমন ধরনের লোকেরা (সেদিনের) ভীতিকর অবস্থা থেকেও নিরাপদ থাকবে। ৯০. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি কোনোরকম মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের (সেদিন) উল্টো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের বলবে); তোমরা যা কিছু করতে তার বিনিময় এ ছাড়া আর কি তোমাদের দেয়া যাবে? ৯১. (হে নবী, তুমি বলো,) আমাকে তো শুধু এটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ (মক্কা) নগরীর (আসল) মালিকের এবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, সব কিছুই তার জন্যে (নিবেদিত), আমাকে (এও) হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি (তাঁরই আদেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করি, ৯২. আমি যেন কোরআন তেলাওয়াত করি, অতপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করবে সে তো তা করবে তার নিজের (মুক্তির) জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (এরপরও) গোমরাহ থেকে যাবে, (তাকে শুধু) তুমি (এটুকু) বলো, আমি তো কেবল (তোমার জন্যে জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র! ৯৩. তুমি আরো বলো, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, অচিরেই তিনি তোমাদের এমন কিছু নিদর্শন দেখাবেন, যা (দেখলে) তোমরা তা সহজেই চিনে নেবে; তোমরা যা কিছু আচরণ করছো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন।

তাফসীর

আয়াত ৫৯-৯৩

এ পর্বটা সূরা নামলের সর্বশেষ অংশ। হযরত মূসা, দাউদ, সোলায়মান, সালেহ ও লুত (আ.)-এর কাহিনীর অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরার পর এই শেষ পর্বটার সূত্রপাত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই শেষাংশ সূরার প্রথমাংশের সাথেই যুক্ত। আর উভয় অংশের মাঝখানে যে কেসসা কাহিনী রয়েছে, তার সাথে প্রথমাংশ ও শেষাংশের সমন্বয় এবং সাযুজ্য রয়েছে। প্রত্যেক কাহিনীতে সূরার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অংশবিশেষ প্রতিফলিত হয়েছে।

এ অংশের শুরুতে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর মনোনীত রসূলদের প্রতি সালাম। ইতিপূর্বে তাদের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই প্রশংসা ও সালামের মাধ্যমে ইসলামী আকীদা এবং আদর্শের একটা বিবরণ শুরু করা হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য, মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরের বিভিন্ন দিক এবং অদৃশ্য জগত, কেয়ামত ও আখেরাতের কিছু লোমহর্ষক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই পর্বটাতে মানব জাতিকে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য ও মানব সত্তার অভ্যন্তরের বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছে, যার অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করতে পারে না এবং একমাত্র সর্বশক্তিমান, সর্বস্রষ্টা, নিখুঁত ব্যবস্থাপক ও একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এসব দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। শ্রোতাদের সামনে বহু অকাট্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে এবং বহু প্রশ্ন রাখা হয়েছে। যেমন, আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে। কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দিয়ে চমৎকার বাগান সৃষ্টি করেছে। কে পৃথিবীকে স্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছে, তার ভেতরে নদনদী ও খালবিল বানিয়েছে, তার ওপর পাহাড় পর্বত তৈরী করেছে এবং দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে? আর্ত মানুষ যখন প্রার্থনা করে তখন কে তা গ্রহণ করে এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে? কে তোমাদের পৃথিবীর খলীফা বানায়? কে তোমাদের অন্ধকারে জলে ও স্থলে সুপথ প্রদর্শন করে? কে স্বীয় দয়ার প্রতীক স্বরূপ সুসংবাদবাহী মেঘকুল পাঠায়? কে প্রথম সৃষ্টি ও পুন সৃষ্টি করে? কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দেয়? আর প্রত্যেক প্রশ্নের পর তাদের বিবেককে এই বলে কষাঘাত করে যে, আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা তো দাবী করতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ আছে। অথচ তারপরও আল্লাহ ছাড়া অন্যদের এবাদাত করে।

মানুষের মনের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তারকারী এই বিবরণটার পর তাদের আখেরাতের অস্বীকৃতি ও তা নিয়ে তাদের গোয়ার্তুমির পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অতীতে যারা তাদের মত আখেরাতকে অস্বীকার করেছে ও ধ্বংস হয়েছে, তাদের কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

এরপর কেয়ামতের ময়দানের লোমহর্ষক দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতপর মানুষকে আকস্মিকভাবে তার পার্থিব জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে, তারপর পুনরায় কেয়ামতের ময়দানে। এভাবে মানুষের মনে প্রবল আলোড়ন ও কম্পন সৃষ্টি করা হয়েছে।

সবার শেষে এক ভয়ংকর বর্ণনার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি ঘটেছে। রসূল (স.) মোশরেকদের ব্যাপারে নিজের দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেন। কেননা তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ ও কেয়ামতের ভয়ংকর পরিণতির দিকে বার বার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্তেও তারা তাঁর সাথে ব্যংগবিদ্রূপ অব্যাহত রেখেছে। তাই তিনি তাদের তাদের মনোনীত পরিণতির হাতেই সোপর্দ করেন।

'আমাকে তো কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে এই শহরের প্রভুর এবাদাত করতে............।' (আয়াত ৯১-৯২)

তারপর এ পর্বের সূচনা যেমন আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে হয়েছে, তেমনি সূরার সমাপ্তিও আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাতে তাদের নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করান, সে জন্যে তাদের আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

'আর বলো, আল্লাহর জন্যেই সকল প্রশংসা। শিগগিরই তিনি তোমাদের তার নিদর্শনাবলী দেখাবেন। তখন তোমরা তা জানবে। আর তোমার মালিক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নন।' (আয়াত ৯৩)

এখানে এসে এই মনোজ্ঞ বক্তব্যের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত হয়।

'বলো, আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা এবং আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের ওপর সালাম। আল্লাহ তায়ালা ভালো, না যাদের তারা শরীক মানে তারা?' (আয়াত-৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে আদেশ দিচ্ছেন যেন তিনি তাঁর কথাবার্তা, যুক্তিতর্ক ও দাওয়াত- সব কিছুই আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরুও করেন এবং শেষও করেন। কেননা এটাই ঈমানদারের উপযুক্ত কাজ। 'বলো, আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা।' কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের যেসব নেয়ামত দিয়েছেন, তার জন্যে প্রশংসার যোগ্য। সর্বপ্রথম যে নেয়ামত দিয়েছেন তা হলো, বান্দাদের আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানের শিক্ষা দান করেছেন।

'আর আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের ওপর সালাম।' কেননা তারা তাঁর বাণী ও বিধান বহন করে এনেছেন এবং তাঁর দাওয়াত প্রচার করেছেন।

বিবেকের দরজায় কোরআনের কষাঘাত

এই প্রাথমিক বক্তব্যের পর আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যানকারীদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখা হচ্ছে। প্রশ্নটা এমন যে, তার জবাবে তথাকথিত এসব দেব দেবী ও মূর্তিকে আল্লাহর সাথে শরীক করার বিপক্ষে মত দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। প্রশ্নটা হলো,

'আল্লাহ উত্তম- না যাদেরকে তারা শরীক করে তারা উত্তম?'

তারা যাদের শরীক করে তারা অবশ্যই দেব দেবী বা মূর্তি, ফেরেশতা কিংবা জ্বিন অথবা আল্লাহর কোনো না কোনো সৃষ্টি, আর এ কথা কোনো বিবেকবান মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না যে, আল্লাহর কোনো সৃষ্টি আল্লাহর সদৃশ সমকক্ষ বা সমতুল্য হতে পারে, আল্লাহর চেয়ে উত্তম হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্নের আকারে করা হলেও আসলে এটা প্রশ্ন নয়, নিছক ধমক ও শাসানি মাত্র। কেননা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তায়ালা উত্তম না অন্য কেউ উত্তম এ বিষয়টা নিয়ে কারো কাছে প্রশ্ন করাই চলে না এবং এর কোনো জবাবের আশাও করা যায় না।

এ কারণেই এ প্রশ্নের পর পুনরায় এমন একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, যা মানুষের আশেপাশে বিদ্যমান এবং সদা দৃশ্যমান বাস্তব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ভিত্তিতে করা হয়েছে। প্রশ্নটা হলো,

'তিনিই কি উত্তম নন, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ...? (আয়াত ৬০)

আকাশ ও পৃথিবী এমন এক প্রতিষ্ঠিত সত্য, যার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিংবা কিউ এ দাবীও করতে পারে না যে, কথিত দেব-দেবী, মূর্তি, ফেরেশতা, শয়তান এদের কেউ, সূর্য চন্দ্র কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্ট করেছে। জাজ্বল্যমান বাস্তবতাই এ দাবী সজোরে প্রত্যাখ্যান করছে। মোশরেকদের কেউ দাবী করতো না যে, এই বিশ্বজগত আপনা থেকেই সৃজিত

হয়েছে, যেমনটি সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে কিছুলোক দাবী করেছে। তাই সে সময়ে শুধুমাত্র আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়া এবং এ দুটো কে সৃষ্টি করলো, সেটা ভেবে দেখার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই শেরেকের ধারণা বাতিল সাব্যস্ত করার ও মোশরেকদের লা-জবাব করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। এ প্রশ্ন আজও বহাল রয়েছে। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকালেই বুঝা যায়, এ দুটো বস্তু সুপরিকল্পিতভাবে এবং পরিপূর্ণ সমন্বয় ও ভারসাম্য সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধরনের সৃষ্টি কখনো কাকতালীয় ও আকস্মিক হতে পারে না। তাই এ কথা স্বীকার না করেই পারা যায় না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এক অদ্বিতীয়। তাঁর একত্ব তাঁর এ সব সৃষ্টি দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটাও প্রমাণিত যে, গোটা সৃষ্টি জগতের জন্যে একটাই সুসমন্বিত রূপরেখা ছিলো। সে রূপরেখার প্রকৃতিও ছিলো এক এবং উদ্দেশ্য লক্ষ্যও অভিন্ন। তাই অনিবার্যভাবেই এই রূপরেখা ও সৃষ্টি একই ইচ্ছা, একই সিদ্ধান্ত ও একই পরিকল্পনার ফল না হয়ে পারে না। ছোট কিংবা বড় সকল সৃষ্টিতেই সেই একই সত্তার সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা সক্রিয়।

আয়াতে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রসংগের পরেই এসেছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের বিষয়টি। এটাও এক চাক্ষুষ সত্য। কোনোভাবেই এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, একজন অতীব সুদক্ষ সুনিপুণ স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তার নিজের তৈরী এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধি মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন, যে নিয়ম ও বিধি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণকেও অনুমোদন করে, শুধু বৃষ্টি বর্ষণকেই অনুমোদন করে না, বরং যেভাবে ও যে পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হলে এখানে বর্তমানের মতো জীবনের সমারোহ ঘটতে পারে, সেভাবে ও সে পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ অনুমোদন করে। কাজেই এসব কিছু অপরিকল্পিতভাবে ও আকস্মিকভাবে হওয়া সম্ভব নয়। আকস্মিক ঘটনাবলী কখনো এতো সুশৃংখল, সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে হয় না, যা যাবতীয় প্রাণীর বিশেষত মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করে।

এ বিষয়টাই কোরআনে 'তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন' এই কথাটা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতির জীবন ধারণে ও তাদের জীবনের চাহিদা পূরণে এই বৃষ্টির কি কি অবদান ও উপকারিতা রয়েছে তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে। যদিও তারা সেসব উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা করে না। আয়াতের পরবর্তী অংশে বৃষ্টির উপকারিতার উল্লেখ করে বলা হচ্ছে,

'অতপর তা দ্বারা আমি নয়নাভিরাম বাগানসমূহ উদগত করেছি। .... '

অর্থাৎ সুন্দর, আনন্দোদ্দীপক, তরতাজা বাগানসমূহ। বাগানের দৃশ্য দেখলেই মনে আনন্দ, সজীবতা ও উল্লাস সঞ্চারিত হয়। এই তরতাজা ও নয়নাভিরাম বাগানের সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করাই মনকে উজ্জীবিত করার জন্যে যথেষ্ট। বাগানে যে অভিনব সৃষ্টির নিদর্শন বিরাজ করে, তা দেখলে এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের মহান স্রষ্টার প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাগানে যে লক্ষ লক্ষ ফুল ফোটে, সমগ্র মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম কারিগররাও তার যে কোনো একটা ফুল তৈরী করতে সক্ষম হবে কি? একটা ফুলের ভেতরে যে রকমারি রংয়ের ব্যঞ্জনা, রেখার বৈচিত্র্য ও ছোট বড় পাপড়ির সমন্বয় দেখা যায়, তা এতো বড় অলৌকিক ব্যাপার যে, প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের সর্বোচ্চ দক্ষতা নৈপুণ্য প্রয়োগ করেও তা করা সম্ভব নয়। আর উদ্ভিদের প্রাণের ক্রমবিকাশ তো সবচেয়ে বড় রহস্য। এ রহস্য উদঘাটন করা আজও মানুষের সাধ্যাতীতই রয়ে গেছে। এ কথাই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে,

'বাগানের গাছপালা উৎপাদন তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' ...... বস্তুত মানুষ, জীবজন্তু কিংবা উদ্ভিদ কোনটারই জীবন রহস্যের কূল কিনারা মানুষ এখনো করতে পারেনি। এখনো পর্যন্ত কেউ

বলতে পারে না যে, এই জীবনের আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছে এবং কিভাবেই বা তা উদ্ভিদ, জীবজন্তু বা মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করেছে। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে হলে দৃশ্যমান এই জগতের বাইরের কোনো উৎসের কাছেই ধর্ণা দিতে হবে।

নয়নাভিরাম সুন্দর এসব বাগানে বিকাশমান জীবনের সামনে থমকে দাঁড়ানো মানুষের মনে যখন চিন্তার উদ্রেক হয়, তখনই তার কাছে প্রশ্ন তোলা হয়,

'আল্লাহর সাথে আর কি কোনো মাবুদ আছে?'

যেহেতু মাবুদ আছে বলে দাবী করার কোনো অবকাশ নেই, তাই আর কোনো মাবুদ নেই, এই মর্মে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকে না। আর এই পর্যায়ে মোশরেকরা পড়ে যায় দোটানা অবস্থায়। একদিকে যুক্তিতে হেরে গিয়ে স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। অপরদিকে অন্যান্য দেব দেবী ও উপাস্যদের আল্লাহর সমকক্ষ মেনে নিয়ে তাদের আল্লাহর মতোই পূজা উপাসনা করতে থাকে।

'বরঞ্চ তারা এমন এক মানবগোষ্ঠী, যারা অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে।'

'ইয়া'দেলুন' শব্দের দুটো অর্থ হতে পারে। প্রথমত. তারা দেব-দেবীকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। দ্বিতীয়ত. তারা সরে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সৃষ্টির কৃতিত্বে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ অংশীদার ছিলো না এ কথা জেনে বুঝেও উপাসনা আনুগত্যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার মাধ্যমে তারা সুস্পষ্ট সত্য থেকে দূরে সরে যায়। উভয়টাই অন্যায় ও ভুল কাজ।

এরপর আরো একটা জাগতিক সত্যের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে,

'অথবা তিনিই কি উত্তম নন, যিনি পৃথিবীকে স্থিতিশীল করেছেন, তার ভেতরে নদ নদী সৃষ্টি করেছেন ....' (আয়াত ৬১)

প্রথম জাগতিক সত্যটা ছিলো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি। আর এ আয়াতে যে সত্যটা তুলে ধরা হয়েছে তা হলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা। এটাকে আল্লাহ তায়ালা জীবন যাপনের, জীবন ধারণের, জীবন বিকশিত হওয়ার ও জীবের বংশ বৃদ্ধির উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। সূর্য ও চন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এখন যতোটুকু আছে, তার চেয়ে যদি বেশী বা কম হতো, পৃথিবীর আয়তন বা আকৃতি যদি ভিন্ন রকমের হতো, এর উপাদান ও পরিবেশ যদি পাল্টে যেতো, এর আহ্নিক গতি বা বার্ষিক গতি যদি অন্য রকমের হতো, অথবা এর চারপাশে চন্দ্রের আবর্তনের গতি যদি অন্য রকমের হতো, বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো যদি বিন্দুমাত্রও পাল্টে যেতো, তা হলে পৃথিবী জীবন ধারণের যোগ্য থাকতো না।

'অথবা তিনিই কি উত্তম নন যিনি পৃথিবীকে স্থিতিশীল বানিয়েছেন' .... আল্লাহর এই উক্তি থেকে এতোসব বিস্ময়কর তত্ত্ব তথ্য হয়তো বা সেকালের শ্রোতারা বুঝতে পারতো না, তবে তারা মোটামুটিভাবে দেখতো যে, পৃথিবী প্রাণীদের জীবন ধারণের যোগ্য। আর তারা এমন দাবীও কখনো করতে পারতো না যে, তাদের কোনো দেব-দেবী বা মূর্তি পৃথিবীকে এমন সুন্দরভাবে সৃষ্টি করার কাজে অংশগ্রহণ করেছে। এটুকুই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলো। এরপর আয়াতের মর্ম বিশ্লেষণের দরজা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতো প্রসার ঘটবে, মানুষ এর নিত্য-নতুন তাৎপর্য উপলব্ধি করতে থাকবে যুগ যুগ ধরে। এটাই কোরআনের অলৌকিকত্ব যে, সে সকল যুগের সকল পর্যায়ের বিবেকবুদ্ধিকে সম্বোধন করে কথা বলে।

পৃথিবীতে নদ নদী হচ্ছে জীবদেহে ধমনী সদৃশ। পূর্ব দিকে, পশ্চিম দিকে, উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে উর্বরা শক্তি, জীবনী শক্তি ও উন্নয়নের প্রাণপ্রবাহ নিয়ে ক্রমাগত বয়ে চলেছে এই সব নদ নদী। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বৃষ্টির সঞ্চিত পানি যেদিকে স্বাভাবিকভাবে গড়ায়, সেদিকেই নদীর সৃষ্টি হয়। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা নিজেই মেঘমালা সৃষ্টি, বৃষ্টি বর্ষণ ও নদ নদী প্রবাহের পরিকল্পনা তৈরী করেন। কেউ বলতে পারে না যে, দক্ষ স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ এই জগত সৃষ্টিতে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছে। নদ নদীর প্রবাহ এমন এক দেদীপ্যমান বাস্তবতা, যা মোশরেকরাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে থাকে। এই বাস্তবতা কে সৃষ্টি করলো? 'আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি?'

'রাওয়াসী' অর্থ পাহাড় পর্বত, যা পৃথিবীর ওপর স্থির ও স্থিতিশীল হয়ে বিদ্যমান। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই পাহাড় পর্বতই নদ নদীর উৎস। বৃষ্টির পানি এখান থেকেই সমতল ভূমিতে গড়িয়ে যায়। এই পানি পর্বতের চূড়া থেকে প্রবল শক্তি নিয়ে নেমে আসার মাধ্যমে মাটিতে খাদ কেটে এগিয়ে যায়। এখানে কোরআন যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট তুলে ধরেছে, সে দৃশ্যপটে প্রবহমান নদ নদীর বিপরীতে রয়েছে পাহাড় পর্বত। এরূপ দৃশ্যপটগত বৈপরীত্য উপস্থাপনই কোরআনের স্থায়ী রীতি। এখানেও সেই রীতিই প্রতিফলিত হয়েছে। এ জন্যেই নদ নদীর পর পাহাড় পর্বতের উল্লেখ করা হয়েছে।

'আর দুই সাগরের মাঝে তিনি অন্তরায় বানিয়েছেন।'

একটা লবণাক্ত সাগর এবং একটা মিষ্টি পানির নদী। দুটোই জলাশয় বিধায় দুটোর মধ্যে যেটি বৃহত্তর, সেটিকে প্রাধান্য দিয়ে উভয়কে একত্রে 'দুই সাগর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'অন্তরায়' দ্বারা প্রধানত প্রাকৃতিক অন্তরায় বুঝানো হয়েছে, যার কারণে সমুদ্রের পানি নদীতে প্রবাহিত হয় না। কেননা নদী-পৃষ্ঠ সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর। এটাই উভয়ের পানিকে আলাদা করে রেখেছে। অথচ সাধারণ নিয়মে নদীর পানি সমুদ্রেই গড়ায়। সমুদ্রের পানি কখনো নদীতে গড়ায় না, এমনকি নদী-পৃষ্ঠ সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে নীচু হলেও নয়। যে কারণেই হোক না কেন, নদী ও সমুদ্রের পানির ঘনত্বের প্রকৃতি থেকেই এই অন্তরায় সৃষ্টি হয় ও বহাল থাকে। কেননা নদীর পানি হালকা ও সমুদ্রের পানি ভারী হওয়ায় উভয়ের স্রোতধারা পৃথক থাকে, পরস্পর মিশ্রিত হয় না এবং একটা অন্যটার ওপর চড়াও হয় না। এটা পৃথিবীতে চালু আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও তার সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশবিশেষ।

কিন্তু কে করলো এ সব?

আল্লাহর সাথে আর কেউ কি আছে এ সব কৃতিত্বের অংশীদার? এসব কৃতিত্বের দাবী আর কেউ করতে পারে না। কেননা সমগ্র সৃষ্টি জগতের পরিকল্পনা ও নকশার যে ঐক্য অভিন্নতা আমাদের সামনে বিদ্যমান, তা আমাদের স্রষ্টার একত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে,

'বরং তাদের অধিকাংশেরই জ্ঞান নেই।'

এখানে জ্ঞানের উল্লেখের কারণ এই যে, এই প্রকৃতির তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অত্যাবশ্যক, যাতে সৃষ্টির সমন্বয়, নৈপুণ্য ও প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। তা ছাড়া আমি আগেই বলেছি যে, সূরা নমলের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হলো এলেম বা জ্ঞান।

এরপর আলোচনার ধারা প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ থেকে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে,

'বিপন্ন মানুষ যখন ফরিয়াদ করে, তখন যিনি ফরিয়াদ শোনেন, বিপদ দূর করেন এবং তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান, তিনিই কি ভালো নন? আল্লাহর সাথে কি আর কোনো মাবুদ আছে? তোমরা খুব কমই স্মরণ করে থাকো।' (আয়াত ৬২)

এখানে মানুষের আবেগকে স্পর্শ করা হয়েছে এবং মানুষের মনের বিচিত্র ধ্যান ধারণা ও তার বাস্তব অবস্থা স্মরণ করানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কঠিন সমস্যা সংকটে পতিত হয়, সে তার অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার মুহূর্তে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সহায় হিসেবে পায় না। তাই দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের জন্যে সে আল্লাহকেই ডাকে। মানুষ কঠিন বিপদে পড়ে যখন চারদিকে তাকায়, তখন তার নিজের হাতেও কোনো ক্ষমতা দেখতে পায় না আর উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় উপকরণ বা সাহায্য সহযোগিতারও সাক্ষাত পায় না। বিপদের সময় যে যে স্থান থেকে সাহায্য পাবে বলে ধারণা করেছিলো তার সবই উধাও হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতেই তার বিবেক জেগে ওঠে। সাহায্য করা ও উদ্ধার করার ক্ষমতাসম্পন্ন একমাত্র সত্তা মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে, যদিও ইতিপূর্বে সুখের সময় তাঁকে ভুলে থাকে। তার মনে পড়ে যায় যে, তিনিই তো আর্তের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ও তার সুখ শান্তি পুনর্বহালকারী একমাত্র সত্ত্বা।

সুখের সময় মানুষ এ সত্য ভুলে থাকে। তাই দুর্বল ও অক্ষম পার্থিব শক্তিগুলোর কাছে সে শক্তি, সাহায্য ও নিরাপত্তা চাইতে থাকে, কিন্তু যখন কঠিন মসিবতে পড়ে দিশেহারা হয়ে যায়, তখন তার বিবেক থেকে উদাসীনতা ও শৈথিল্যের পর্দা ওঠে যায় এবং মহান আল্লাহর শরণাপন্ন হয়। পূর্বে যত শৈথিল্য ও উদাসীনতাই থাক, তা সে ঝেড়ে ফেলে।

কোরআন দাম্ভিক অবিশ্বাসীদের বিবেককে এই সত্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। এ সত্য তাদের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে। সে তার সামনে প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ও জাগতিক দৃশ্যগুলো তুলে ধরে, যথা, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, চোখ জুড়ানো ও মন মাতানো বাগ বাগিচা জন্মানো, পৃথিবীকে পাহাড় পর্বত দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল করা, নদ নদী ও সমুদ্র প্রবাহিত করা এবং দুই সাগরের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা। এ সব দৃশ্যের সাথে আল্লাহর কাছে বিপন্ন মানুষের ফরিয়াদ জানানো ও একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার ফরিয়াদ শ্রবণের সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমোক্ত বিষয়গুলো জাগতিক আর শেষোক্তগুলো মানসিক, এই যা পার্থক্য। এরপরে জীবনের অন্যান্য বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের আবেগকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

'আর তিনি তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান।'

কে তাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি বানায়, তিনি কি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা নন, যিনি তাদের পূর্ববর্তীদের প্রথমে প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন? তারপর এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পৃথিবীর রাজত্ব পরিচালনায় তাদের এক দল আরেক দলের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ ব্যবস্থা কি আল্লাহ করেন না?

তিনি কি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই নন, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই রচিত সেসব প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি অনুসারে সৃষ্টি করেছেন, যার ভিত্তিতে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও বসবাসের অবকাশ জন্মে? তিনিই তাদের সেসব শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন, যা তাদের পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে।

যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম পৃথিবীকে মানুষের জন্যে বসবাসযোগ্য বানায়, গোটা বিশ্বজগতকে সুসমন্বিত করে এবং এতে জীবন যাপনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলে, সেগুলোই মানুষকে তার

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনেরও ক্ষমতা যোগায়। এই বিশ্বজগতকে সুসম করার জন্যে প্রয়োজনীয় বহুসংখ্যক শর্তের মধ্য থেকে কোনো একটা শর্তও যদি উধাও হয়ে যেতো, তাহলে এ পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়তো। (সূরা ফোরকানের ২ নং আয়াতের শেষাংশের তাফসীর দেখুন)

সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই কি জীবন ও মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না এবং এক প্রজন্মকে আরেক প্রজন্মের উত্তরাধিকারী করেন না? পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকেরা যদি সবাই বেঁচে থাকতো, তাহলে পরবর্তী ও পূর্ববর্তীদের একত্রে বসবাস করার জন্যে পৃথিবীতে স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হতো এবং জীবন, সভ্যতা ও চিন্তার গতি শ্লথ হয়ে যেতো। কেননা নতুন নতুন প্রজন্মের আনাগোনাই চিন্তা, অভিজ্ঞতা, চেষ্টা সাধনা ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে গতি সঞ্চার করে, নতুনত্ব আনে। এক প্রজন্মের তিরোধানে আরেক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটার কারণেই প্রাচীন ও নবাগতদের মধ্যে কোনো বাস্তব সংঘাত ছাড়াই চিন্তা, কর্ম ও জীবন পদ্ধতিতে দ্রুততা এবং নতুনত্ব আসে। যা কিছু সংঘাত ঘটে তা কেবল চিন্তা ও অনুভূতির জগতেই ঘটে। প্রাচীন মানুষেরা যদি বেঁচে থাকতো,তাহলে প্রকাশ্যে ও বড় আকারে সংঘাত ঘটতো এবং জীবনের অগ্রযাত্রা থেমে যেতো।(১)

এ সত্যগুলো মানসিক এবং সে সত্যগুলো জাগতিক। কে এই সত্যগুলোর আবির্ভাব ঘটালো? আল্লাহ ছাড়া কি আর কেউ?

মানুষ ভুলে যায়। অথচ এ সত্যগুলো তাদের মনে সুপ্ত এবং বাস্তব জীবনে দৃশ্যমান থাকে।

'তোমরা খুব কমই স্মরণ করে থাকো।'

মানুষ যদি এ সব সত্য মনে রাখতো এবং চিন্তা গবেষণা করতো, তাহলে আল্লাহর সাথে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠতো, তাঁর সম্পর্কে সে উদাসীন হতো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতো না।

---

(১) মানুষের বয়েস বাড়ানোর জন্যে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিন্তু চেষ্টার কোনো শেষ নেই। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষের 'ডিএনএ' থেকে বয়েস বাড়া সংক্রান্ত 'জিনস'কে যদি মডিফাই করা যায়, তাহলে অনায়াসেই একজন মানুষের গড়পড়তা বয়েস ৭৫ থেকে (ইউরোপের হিসাব অনুযায়ী) বাড়িয়ে তা ১২৫ কিংবা ১৫০ করা সম্ভব, কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে সমাজবিজ্ঞানীদের একটি মারাত্মক 'আশংকা' নিয়ে। সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের বয়েস বাড়ানো হলে মানব জাতির গোটা অস্তিত্বই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে যাবে। কেননা, একজন মানুষের স্বাভাবিক কর্ম ক্ষমতা (ইউরোপে সে সীমা ৬৫-৭৫) বাড়ানোর কিন্তু কোনো উপায় নেই। হিউম্যান 'ডিএনএ'-তে মানবীয় কর্মক্ষতা সংক্রান্ত 'জিনস'গুলো এ সীমা পর্যন্তই বাঁচে। তাই তারা মনে করেন, বয়েস বাড়ানোর পর (অবশ্য যদিও এটা অবাস্তব বিলাস স্বপ্ন) কি হবে, তার জীবনের বাকী ৭৫ বছর অকর্মণ্য জীবনকে সমাজের বাকী অংশ কি এমনি এমনি লালন পালন করবে? বুড়োদের নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার মানুষগুলো এমনিই ভীষণ সমস্যায় আছে। একমাত্র গ্রেট বৃটেনেই প্রতি ৩ জন মানুষের একজন হচ্ছে পেনশনভোগী বুড়ো। আগামী শতকে এই হার ৫০ ঃ ৫০ হয়ে যাবে বলে অনেকেই আশংকা প্রকাশ করছেন। বয়েস বাড়ানোর এই অসাধ্য কাজটি কোনো দিন যদি সফল হয়ও, এর ফলে নিসন্দেহে আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ভেংগে খান খান হয়ে যাবে, সমাজে কর্মক্ষম মানুষ যখন আর পাওয়া যাবে না, যখন গোটা জনশক্তির অর্ধেক অংশ শুধু একটি পেটসর্বস্ব জীবে পরিণত হবে, তখন পুনরায় এতে 'ব্যালেন্স' আনার জন্যে সেই রোমান শাসক 'নিরো'-র মতো বিপুল পরিমাণ 'মৃত্যুশালা' বানাতে হবে, এক পর্যায়ে পৃথিবীর সব বুড়োগুলোকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে এই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা স্বীকার করুন আর নাই করুন– আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক এই জীবন মৃত্যুর পদ্ধতিই হচ্ছে সমাজের একমাত্র জীয়ন-কাঠি। আল্লাহ তায়ালা– যিনি মানুষদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি ভালো করেই জানেন, একজন মানুষের কতোদিন পর্যন্ত কর্মক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে এবং কতোদিন তার এই দুনিয়ার কর্মশালায় বেঁচে থাকা দরকার।–সম্পাদক

এরপর আরো কয়েকটা অনস্বীকার্য সত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'তিনিই কি উত্তম নন, যিনি জল ও স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান? ....' (আয়াত ৬৩)

কোরআন নাযিল হবার সমকালীন লোকেরা সহ সাধারণ মানুষ পর্যটনকালে জল ও স্থল দিয়ে চলাচলের নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করতো। কে তাদের পথ প্রদর্শন করতো? তাদের কে বোধশক্তি দান করেছে? কে তাদের নক্ষত্র, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নিদর্শনাবলী দ্বারা গন্তব্য পথের সন্ধান লাভের যোগ্যতা দিয়েছে?

তাদের স্বভাব প্রকৃতিকে সৃষ্টি জগতের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল করেছে কে? কে তাদের প্রকৃতির রহস্য অনুধাবনের যোগ্যতা দান করেছে? কানকে শোনার, চোখকে দেখার এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে অনুভব করার শক্তি কে দিয়েছে? অতপর এসব অংগ প্রত্যংগ দ্বারা উপকৃত হওয়া ও এগুলোর অর্জিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে বুদ্ধি বা বিবেক নামক বস্তুটি কে সৃষ্টি করেছে? তিনি কি আল্লাহর সহযোগী কেউ? না স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা?

'আর যিনি বাতাসকে তার করুণার বার্তাবহ হিসেবে পাঠান।'

বাতাসের কারণ ও উপাদান সম্পর্কে যা কিছুই বলা হোক না কেন, তা আসলে আদি মহাজাগতিক পরিকল্পনারই আওতাধীন। সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তা চলাচল করে, মেঘমালাকে বহন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় আল্লাহর করুণাবাহী বৃষ্টির সুসংবাদ দেয়। বস্তুত এই বৃষ্টিই জীবনের উপাদান।

কে এ বিশ্বজগত ও এই বাতাস এভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি আল্লাহর কোনো সহযোগী, না স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা?

পুনরুত্থান প্রথম সৃষ্টিরই অনিবার্য দাবী

সর্বশেষে যে প্রশ্ন রাখা হয়েছে তা মানুষের সৃষ্টি, আখেরাতে তার পুনরুত্থান এবং আকাশ ও পৃথিবী থেকে তার জীবিকার সংস্থান সংক্রান্ত। শুধু প্রশ্ন নয়, এই সাথে চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে,

'তিনি কি উত্তম নন, যিনি সৃষ্টির সূচনা ও পুন সৃষ্টি করেন।' (আয়াত ৬৪)

প্রথম সৃষ্টি একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনোভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব নয়। আল্লাহর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কারণ এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করে। এ বিশ্ব জগত যে একটা সুপরিকল্পিত সৃষ্টি, তা এর দিকে তাকালেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর এ ধরনের একটা সুপরিকল্পিত সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের উৎস বা কারণ দর্শানোর জন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আল্লাহর একত্বও অনস্বীকার্য। কেননা এ বিশ্বজগতে আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যের যে নিদর্শনগুলো বিদ্যমান, সেগুলোই আল্লাহর একত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। এ বিশ্বজগতের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা– দুটোই যে একই প্রকৃতির, আর এর পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক সমন্বয় যে একই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং একই সিদ্ধান্তের প্রতীক, তা থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টাও একক সত্ত্বা।

এরপর আসে আখেরাতের পুনরুত্থানের প্রসংগ। এ বিষয়টা নিয়ে মোশরেকরা তর্কে লিপ্ত হতো, কিন্তু প্রথম সৃষ্টিকে সত্য মেনে নিলে পুন সৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এভাবেই মানুষ ক্ষণস্থায়ী জগতে কৃত যাবতীয় কর্মের সঠিক প্রতিফল লাভ করতে পারে। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে পরিপূর্ণ কর্মফল পাওয়া সম্ভব নয়, হয়তো বা আংশিক ফল কখনো কখনো পাওয়া যেতে পারে। এই বিশ্বজগতে যে সর্বাত্মক সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়, এখানে কৃতকর্ম

ও কর্মফলের মধ্যেও সেই সর্বাত্মক সমন্বয় থাকা অপরিহার্য। অথচ এটা দুনিয়ার জীবনে সংঘটিত হয় না। তাই অন্য একটা জীবনকে সত্য মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না– যেখানে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করবে। এই পৃথিবীতে কর্ম ও কর্মফলের মাঝে সেই পরিপূর্ণ সমন্বয় কেন সংঘটিত হয় না সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এর জবাব এই যে, এর প্রকৃত রহস্য মহান সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। এটা এমন এক অজানা রহস্য, যা তিনি কাউকে জানাননি।

প্রথম সৃষ্টি স্বীকার করলে দ্বিতীয় বা পুনসৃষ্টি মেনে নেয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় বলেই ৬৪ নং আয়াতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে,

এই সৃষ্টি ও পুন সৃষ্টি কি আল্লাহর কোনো সহযোগীর কৃতিত্ব, না স্বয়ং আল্লাহর?

আকাশ ও পৃথিবী থেকে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে যা কিছু আসে সেগুলো যেমনি আসে তেমনি আবার ফিরেও যায়। মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পৃথিবীর জীবজন্তু, গাছ পালা, পানি ও বাতাস থেকে সংগ্রহ করে এবং এগুলোকে সে নানাভাবে ব্যবহার করে; খাদ্য, পানীয়, শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদির কাজে সে এগুলো লাগায়। এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর পেটের মধ্য থেকে সংগৃহীত সম্পদ, খনিজ দ্রব্য, ধাতব পদার্থ, সামুদ্রিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-সামগ্রী এবং নানা প্রকার সৌন্দর্যের বস্তু; রয়েছে বিস্ময়কর চুম্বক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ও বৈদুত্যিক সরঞ্জামাদি। এমনিভাবে মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া আরও অনেক প্রকার দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে, যা এখনও মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে ধরা পড়েনি– আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ সেগুলো সম্পর্কে কিছু জানেও না। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে নতুন নতুন বস্তু যখন মানুষের জ্ঞান-গবেষণায় ধরা পড়ে এবং সেগুলো ব্যবহার করে যখন মানুষ অপূর্ব আনন্দ পায়, তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

আর পার্থিব জীবনে ব্যবহার্য মানুষের প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ, যেগুলো আকাশ থেকে আসে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আলো-তাপ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা বহু প্রকার শক্তি। আখেরাতের যিন্দেগীর জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাঁর মহাদান– যা তাদের চেষ্টা সাধনা ও সৎ কর্মের পুরস্কার আকারে আসবে। যে বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং এগুলোই আকাশ থেকে আসবে বলে বুঝানো হয়েছে। এটা হচ্ছে কোনো কিছুকে উর্ধ্বে তোলা ও মহান বানানোর একটা প্রক্রিয়া।

শুরু করা ও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলার পর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের রেযেক আসে আসমান ও যমীন থেকে, কারণ আকাশ ও পৃথিবী থেকে আগত দ্রব্য সম্ভারের সাথে শুরু হওয়া ও ফিরে যাওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর রেযেক (দ্রব্য সামগ্রী)-এর শুরুর সাথে সম্পর্ক কিভাবে রয়েছে তা মানুষের জানা আছে, কারণ এই জীবন ধারণ সামগ্রী নিয়েই তো মানুষ জীবন যাপন করে। আখেরাতের সাথে তার (জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রীর) সম্পর্ক এভাবে যে, পার্থিব জীবনে এসব সামগ্রী লাভ করার পর মানুষ যেভাবে এগুলো ব্যবহার করবে, সেভাবে সে আখেরাতের জীবনে তার বিনিময় পাবে।

আকাশ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রীর সম্পর্ক সৃষ্টির শুরুর সাথে কিভাবে রয়েছে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। কারণ সেগুলোও দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন এবং তার সঠিক ব্যবহারের ফল মানুষ (দুনিয়াতে পাওয়ার সাথে সাথে) আখেরাতেও পাবে। আল কোরআনে এসব প্রসংগে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচনা এসেছে।

যে কোনো জিনিসের প্রারম্ভ ও পরিশেষে তার প্রত্যাবর্তন একটা বাস্তব সত্য, একইভাবে আকাশ ও পৃথিবী থেকে আগত জীবন সামগ্রীও এক বাস্তব সত্য; কিন্তু এ সত্য সাধারণভাবে মানুষ বুঝতে চায় না, যার কারণে আল কোরআন তীব্র ভাষায় তাদের এই উদাসীনতার সমালোচনা করেছে এবং তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলছে,

'আছে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সর্বশক্তিমান?' তাদের বলো (হে রসূল), এ বিষয়ে তোমরা কোনো দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।' কিন্তু ওরা অবশ্যই তাদের দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, এ পর্যন্তও পারেনি। আকীদা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করার এই হচ্ছে আল কোরআনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই হচ্ছে সৃষ্টির দৃশ্যসমূহ এবং খোদ মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সেগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে হৃদয়ের গভীরে মানুষ এসব রহস্য সম্পর্কে অনুভব করতে পারে, মানুষের বিবেককে জাগাতে পারে এবং সুস্পষ্ট যুক্তি সহকারে সে এই সুবিশাল সৃষ্টিলোকের বিস্ময়কর রহস্য অনুধাবন করতে পারে। সর্বোপরি তার চেতনা জাগিয়ে তাকে তার সঠিক কেন্দ্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আসলে এসব এমনই রহস্য যার দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে মানুষ বহু অজানা বিষয়ের সন্ধান পেতে পারে, কিন্তু মানুষের দুর্বলতা হচ্ছে, সে বিলাসব্যসনে এমনভাবে মজে থাকে যে, গভীরভাবে কোনো কিছু দেখা বা গভীরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যার কারণে তার নযরের ওপর পর্দা পড়ে যায়, সে দেখেও বহু সত্য দেখতে পায় না, এর ফলে সে এসব অস্বীকার করে বসে।

এ জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গোটা বিশ্বকে তার সামনে এক বিশাল পুস্তক হিসেবে হাযির করে দিয়েছেন যা তার অন্তরের নিকট গ্রহণযোগ্য সর্বপ্রকার যুক্তি প্রমাণ পেশ করে, এগুলো দেখে তার হৃদয়ের গ্রন্থিগুলো খুলে যায়, বিবেক জেগে ওঠে এবং এগুলোর দিকে একটু খেয়াল করে যখন সে তাকায় তখন তার গোটা সত্ত্বা সচল হয়ে ওঠে, তার মধ্যে পূর্ণ এক আবেগের সৃষ্টি হয়। এমনই এক বিশেষ মুহূর্তে তার সামনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহস্য ভান্ডারের বহু দরজা খুলে যায়, গাফলতির ঘুম তার ভেংগে যায়, তখন আল্লাহর নেয়ামতগুলো সে আর অস্বীকার করতে পারে না। সত্যের বাতি তার হৃদয়ে জ্বলে ওঠে এবং সে কর্তব্য সচেতন হয়ে ওঠে, এই রহস্যময় মহাবিশ্ব সকল কিছুর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাকে আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন আল্লাহর মহান খলীফা হিসাবে গড়ে তোলে। সে তখন তাওহীদের মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করে।

গায়বে বিশ্বাস গায়বের এলম এক নয়

মহান আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা ও শেরেকের কদর্য থেকে বাঁচার লক্ষ্যে, আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত রহস্যসমূহের পরিক্রমা এবং অনুসন্ধান কাজ সমাপ্ত করার পর আল্লাহর অনুগত বান্দা পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকা অজানা অচেনা আরও অনেক রহস্য জানতে চায়– জানতে চায় সে আখেরাত ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও। এ জন্যে সে তার সামনে অনুপস্থিত সৃষ্টির সাহায্য নিয়ে মূল ব্যাপারটা বুঝতে চায়, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে সে আর কিছুই বুঝতে পারে না, যেহেতু সেগুলো একমাত্র আল্লাহ আলেমুল গায়েবের জানার বস্তু, তিনি ছাড়া আর কোনো সৃষ্টি সে রহস্য ভেদ করতে পারে না, তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলো (হে রসূল), আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মধ্যে কেউই গায়েবের খবর রাখে না এবং আল্লাহ ছাড়া সেসব রহস্য সম্পকের্ক আর কেউই কিছু জানে না। তারা কেউই জানে না

তাদের কখন আবার যিন্দা করে তোলা হবে......... আর অবশ্যই তোমার রব জানেন যা বক্ষসমূহের মধ্য গোপন রয়েছে এবং যা তারা প্রকাশ করে। আকাশমন্ডলী ও গায়েবের যাবতীয় খবর একটি সুস্পষ্ট কেতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে।' (আয়াত ৬৫-৭৫)

বিশ্বাস সম্পর্কিত যতো জিনিস আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, হাশরের ময়দানে সবার হাযির হওয়া এবং হিসাব নিকাশ বাদ শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়া। এসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস না থাকলে মানুষ দুনিয়ার সঠিক পথে টিকে থাকতে পারে না এবং লোভ-লালসা দমন করে সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে পারে না। অতএব, যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার আশা করে, সেখানে সঠিক প্রতিদান পেতে চায়, নিজের কাজের সঠিক মর্যাদা পাওয়ার আশা করে, সর্বোপরি পেতে চায় অন্তরের মধ্যে অনাবিল শান্তি, সে যেন তার কাজ ও কথায় মিল রেখে চলে, নিজের হিসাব নিজে নেয় এবং পরকালে যে প্রতিদানের আশা সে করে সে অনুযায়ী তার যাবতীয় কাজ ও ব্যবহার পরিচালনা করে এবং সময় থাকতেই তার সকল যোগ্যতা কাজে লাগায়।

অবশ্যই এ জীবন শেষে আর এক জীবন আসবে এবং আখেরাতের সে যিন্দেগীতে আল্লাহর কাছে তাকে হাযির হতে হবে, এসব বিষয়ে বিভিন্ন যুগে মানুষ নানা দৃষ্টিভংগি পোষণ করে এসেছে, এর ব্যাপকতা ও প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তা করেছে, কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (স.) তাদের কাছে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে ওঠতে হবে বলে সংবাদ দিলেন– জানালেন যে, বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সবাই অনন্ত আর এক জীবনে ফিরে আসবে, তখন তারা চরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, অথচ তারা কখনও চিন্তা করতে চায় না, অথবা এ বিষয়টিও তাদের কাছে আশ্চর্য লাগে না যে, তাদের জীবনের প্রথম সূচনাটা হলো কি করে; তারা একটুও বুঝতে চায় না যে, একেবারে 'না' থেকে অস্তিত্বে আনার তুলনায় অস্তিত্ব থেকে তার পুন আগমন কি অনেক সহজ নয়! এই বুঝতে না চাওয়ার কারণেই তারা আখেরাত সম্পর্কে সন্দিহান। এক পরীক্ষিত চরিত্রের মানুষ, তাদের সবার জানা শোনা মানুষ, সবার একান্ত ভাল মানুষটি যখন এ খবর দিচ্ছেন তখন তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না; বরং তারা চরম হঠকারিতার সাথে তাঁকে ও তাঁর কথাকে অস্বীকার করে চলেছে এবং শুধু অস্বীকার করেই তৃপ্তি পাচ্ছে না; বরং চির সত্যবাদী, তাদেরই দেয়া খেতাবে ভূষিত 'আল আমীন' (স.)-কে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করার জন্যে আদাপানি খেয়ে লেগে গেছে।

হাঁ, আখেরাত, পরকালীন জীবন, অবশ্যই তা এক অদেখা সত্য। মানুষের চোখের অন্তরালে অদেখা এ সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। অন্য কেউই এ বিষয়ে কিছু জানে না। তাদের দাবী হচ্ছে, 'ঠিক আছে, আখেরাত সম্পর্কিত কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি, সত্য বলে মেনে নিতে পারি যদি আপনি আমাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দি[illegible] পারেন যে, অমুক সময়ে বা এতোদিন পরে তা সংঘটিত হবে, তাহলে বুঝবো আপনি একটা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মানুষ! এসব কথা বলে প্রকারান্তরে তারা নবীকে অস্বীকার করেছে, উপেক্ষা করেছে এবং মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছে। বলেছে, এসব প্রাচীনকালের লোকদের মনগড়া কল্পকাহিনী মাত্র অথচ এসব কথার বিবরণ ইতিপূর্বে আরও অনেক এসেছে, কিন্তু কিছুতেই সে হঠকারীরা নবীদের এসব কথা মানেনি।

এজন্যে এখানে পুনরায় জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, গায়েবের খবর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ভান্ডারের গোপন রহস্যসমূহের অন্যতম। আসলেই ওদের আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত অল্প ও সীমাবদ্ধ। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, কেউ জানে না গায়েবের খবর, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী অন্য কেউ, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া, তারা কেউ জানে না তাদের কখন পুনরায় তোলা হবে।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পৃথিবীতে তাঁর হুকুম আহকাম চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সকল প্রকার যোগ্যতা, শক্তি সামর্থ ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পেয়েছে। এ গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্যে তার স্থান নিরূপিত হয়েছে স্বয়ং আল্লাহর পরেই, এ দায়িত্ব কোনো ছোটো খাটো দায়িত্ব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন বিশ্বের সব কিছুর সহযোগিতা। তাই সকল জীব-জানোয়ার, কীট পতংগ ও সকল জড় পদার্থকে তার খেদমতে নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য এটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বুঝতে হবে যে, সে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি, কোনো কিছুর মালিক সে নয়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকলের এবং সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক। তার কর্তব্য মালিকের অনুগত থাকা এবং সকল কিছু মালিকের হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার করা। সে যদি নিজে মালিক হতে চায় এবং মালিকের অধিকার আত্মসাৎ করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছা কাজে লাগাতে চায়, অর্থাৎ মালিককে তার অধিকার না দিয়ে সে অধিকার নিজের কাজে লাগায়, তাহলে মালিকের কোপ দৃষ্টিতে সে পড়তে বাধ্য। আল্লাহর খলীফা হিসেবে নিয়োজিত থাকার কারণেই তাকে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যা আর কাউকে দেয়া হয়নি এবং দেয়া হয়েছে ততোটুকু, যতোটুকু তার দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন, তার বেশী নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু জ্ঞান তাকে দিয়েছেন এবং সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তাকে যতোটুকু জানিয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই তার কল্যাণ। এই নির্দিষ্ট সীমার বাইরের রহস্যরাজি তাকে জানানো তার জন্যে কল্যাণকর হবে বলে যদি আল্লাহ তায়ালা বুঝতেন, তাহলে তার সামনে তিনি তাঁর রহস্য ভান্ডারের দ্বার আরও বেশী প্রশস্ত করে দিতেন।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় থেকে নিয়েই মানুষের মধ্যে, এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগ্যতা, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। এর বেশী সে ইচ্ছা করলেও পেতে পারে না। তাকে প্রদত্ত এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে সৃষ্টির সকল রহস্য জানা তার জন্যে জরুরীও নয়। তবে অবশ্যই এটা সত্য, যদি কোনো ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করার জন্যে গভীরভাবে নিবেদিত (প্রাণ) হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন কিছু বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং তার সামনে তার রহস্য ভান্ডারের এমন কিছু দিক খুলে দেন, যা সাধারণভাবে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এহেন সত্য-সঠিক ও সত্য পথে আত্মউৎসর্গীকৃত প্রাণ বান্দাকে মহান আল্লাহ পৃথিবীর গভীরে লুকায়িত বহু অজানা বস্তুর সন্ধান দিয়ে থাকেন, তাকে জানার ব্যবস্থা করে দেন অতলান্ত সাগরের গভীরে লুকিয়ে থাকা অনেক তথ্য। তাকে মহাশূন্যলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু বিষয় জানান। সৃষ্টির বহু নিয়ম কানুন এবং গোপন শক্তি সম্পর্কে তাকে জানিয়ে দেন। এমন সব গোপন রহস্যও তাকে জানান যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর, যা পৃথিবী সৃষ্টির মূল উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, যা সকল কিছুকে অস্তিত্বে এনেছে এবং এদের নানা আকৃতি ও বর্ণ দিয়েছে; আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করার পর সকল কিছুকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বানিয়েছেন এবং মানুষকে আবিষ্কার করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। তাকে এমন সব বিষয় জানিয়েছেন যা ইতিপূর্বে আর কারও জানা ছিলো না। এভাবে এ পৃথিবীতে মানুষ তার ভূমিকাকে পূর্ণতা দান করেছে এবং তাকে পৃথিবীতে খলীফা বানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন তিনি তা পূর্ণ করেছেন।

শুধু মানুষের কাছেই যে সৃষ্টি রহস্য গোপন রাখা হয়েছে তা নয় বরং ফেরেশতা, জ্বিন এবং অন্য যেসব সৃষ্টিকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার নিজের পক্ষ থেকে জ্ঞান দিয়েছেন, তাদের থেকেও তিনি সৃষ্টির রহস্য গোপন রেখেছেন, তারা ততোটুকুই জানে যতোটুকু মহান আল্লাহ তাদের জানাতে চেয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তার বেশী জানার ক্ষমতা কারও নেই। এভাবে তাঁদের প্রত্যেককেই তিনি বিশেষ বিশেষ এক দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব জানে এবং আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সবাই সচেতন। একমাত্র মানুষ ও জ্বিন ছাড়া, কিন্তু কেউই তার নিজ দায়িত্ব ছাড়া অপরের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না। পরিশেষে সবার রহস্য জানেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। এই কথাটিই মহান আল্লাহর কালামে ঝংকৃত হয়েছে,

'বলো, কেউ জানে না আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যারা আছে, তাদের গায়েব সম্পর্কে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া'। যাবতীয় সন্দেহের উর্ধে যে মহান কেতাব চূড়ান্ত দিশারী হিসেবে মানব সমাজে বর্তমান রয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন আজও সম্পূর্ণ নির্ভুল, অকাট্য তার দলীল-প্রমাণ। এ পাক কালাম ছাড়া সারা বিশ্বের বুকে অন্য কোনো এমন গ্রন্থ নেই যা এই ভাবে নির্ভুল হওয়ার দাবী করতে পারে, এর মধ্যে ধারণা বা আন্দাজ অনুমান বলতে কিছু নেই। কোনো সাময়িক সমাধান দানকারী কেতাবও এটা নয়। বিশ্ব মানবতাকে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এ কেতাবই চূড়ান্ত ও শেষ সমাধান হিসেবে এসেছে।

পুনরুত্থান নিয়ে সন্দেহবাদীদের বিতর্কের অপনোদন

এভাবে, 'গায়েবের খবর কেউ রাখে না আল্লাহ ছাড়া' এ কথাটা সাধারণভাবে সবার জন্যে একইভাবে সত্য। একথা জানিয়ে দেয়ার পর আবার খাস করে বলা হয়েছে আখেরাতের কথা, কারণ এটাই হচ্ছে সে বিষয় যা নিয়ে তাওহীদের পরই মানুষের মধ্যে প্রচন্ড মতভেদ গড়ে ওঠেছে। মোশরেকদের সাথে মোমেনদের মতপার্থক্য বিরাজ করেছে। আল্লাহর বাণীতে কথাটা কী চমৎকারভাবে উল্লেখিত হয়েছে,

'আর ওরা কেউ জানে না, কখন ওদের (পুনরায় জীবিত করে) তোলা হবে।'

এ কথা দ্বারা পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না বলে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কেয়ামত ও 'বা'স ওয়া বা'দাল মওত' (মৃত্যুর পর আবার আসা যিন্দেগী) কখন এটা সংঘটিত হবে, এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানানো হয়নি। মানুষ যতোই জ্ঞান-সাধনা করুক না কেন এবং এ বিষয়ে যতোভাবেই জানার চেষ্টা করুক না কেন, এটিই একমাত্র বিষয় যার সম্পর্কে কারও কিছুই জানার উপায় নেই এ বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ মজবুর। কথাটিকে আরও বেশী জোরদার করার জন্যে বলা হয়েছে যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে কোথাও কেউ নেই যে, এ বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞান রাখতে পারে। তারপর উদাহরণ দিয়ে কথাটি বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে, যেন মানুষ আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করে এবং আখেরাত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস কি সে বিষয়ে মত বিনিময় করে। তাই বলা হচ্ছে,

'বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ, যতোই তারা আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা করুক না কেন এবং যতো বেশীই তারা এ বিষয়ে বুঝার চেষ্টা করুক না কেন, আখেরাত সম্পর্কে জানার জন্যে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। অনুমান করতে করতে তারা মনে করেছে, এই বুঝি আমরা জেনে ফেলবো; কিন্তু অবশেষে তারা বুঝেছে, হায়, একেবারে শেষ প্রান্তে এসে আমরা ব্যর্থই হয়ে গেলাম!

অন্ধরা যেমন চোখে না দেখে অনুমান করে, আলো বুঝি এই রকম। এভাবে তাদের সকল অনুমানই যেমন নিষ্ফল হয়ে যায়; তেমনই আখেরাতের চিন্তা মানুষের কাছে সে অন্ধের মতোই

এক নিষ্ফল চিন্তা। এ ভয়ংকর অবস্থার চিত্র তাদের মনের পর্দায় আঁকা এ রকমই এক ব্যর্থ চেষ্টা। সে দিনে কি কঠিন অবস্থা হবে, তার প্রকৃতিই বা হবে কি রকম, তা অনুমান করা মানুষের জন্যে একেবারেই অসম্ভব।

'বরং সে বিষয়ে (তাদের ধারণা কল্পনার মধ্যে আনতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে) তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়।'

অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আখেরাত সংঘটিত হবে বলে তারা আর একীন করতে পারে না। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে নিছক একটি ধারণার মধ্যেই তারা থেকে যায় এবং এ ঘটনা ঘটবে বলে তারা শুধু এন্তেযারই করতে থাকে।

'বরং এ বিষয়ে তারা একেবারেই অন্ধ বনে যায়।'

অর্থাৎ, এ বিষয়টি বুঝার ব্যাপারে তাদের অবস্থা হয় একেবারেই একজন অন্ধের মতো, সে বিষয়ে সে কিছুই দেখতে পায় না এবং তার অবস্থা কি হবে কিছুতেই তা বুঝতে পারে না, এটা হচ্ছে আন্দায-অনুমান– এই দুই অবস্থা থেকে বহু দূরের এক অবস্থা।

'আর কাফেররা বলে, আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা পচে গলে মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, সে অবস্থা থেকে কি আমাদের পুনরায় বের করা হবে?' (আয়াত ৬৫)

অর্থাৎ এই সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়াই কাফেরদের আসল অবস্থা। সদা সর্বদা তারা এই বিশ্বাসের গোলমালের মধ্যে পড়ে আছে যে, আমাদের দেহ থেকে যখন প্রাণ আলাদা হয়ে যাবে, আমাদের দেহ পচে গলে যখন কবরে মধ্যে মিশে যাবে এবং একেবারে মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন আসবে সে কেয়ামত? তখন আবার দেহ তৈরী হবে এবং আবার যিন্দা হতে হবে? এ যে এক অদ্ভুত কথা! আরও যেসব কথা বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পরে কবরস্থ করে দেয়ার পর বহু বহু বছর অতীত হয়ে যাবে, তারপর সংঘটিত হবে কেয়ামত! আমরা, আমাদের বাপ-দাদারা, যারা কতোকাল পূর্বে গুযরে গেছে, তাদের সবাইকে আবার যিন্দা করে তোলা হবে। মরে পচে গলে সম্পূর্ণভাবে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর আবার জীবিত করে তোলা হবে? (একি অদ্ভুত কথা শোনানো হচ্ছে? এসব কথাও বিশ্বাস করতে হবে?)'

তারা এ কথা বলে এবং তাদের ও আখেরাতের যিন্দেগীর ধারণার মাঝে এই বস্তুগত জীবনের অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এ সময় তারা ভুলে যায় যে, তাদের এমন অবস্থা থেকেই তো পয়দা করা হয়েছে যখন তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। কেউ জানত না যে এসব জীবকোষ ও এসব উপাদান, যা দ্বারা তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে, তা শুরুতে কোথায় ছিলো। প্রকৃতপক্ষে সব উপাদান তো পৃথিবীর মাটির স্তরসমূহের মধ্যে, সাগরের পানিতে ও শূন্যলোকের মধ্যে বিরাজমান অণু পরমাণুর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর মাটি, পানি, বাতাস ও সুদূর মহাশূন্যে অবস্থিত সূর্যের কিরণ থেকে তার সৃষ্টির উপাদানগুলো জড়ো করা হল এবং এভাবে সৃষ্টি হল মানুষ, বৃক্ষ, লতা-পাতা, পশু-পাখী ও কীট-পতংগ। সেসব কিছু থেকে তাদের সৃষ্টির মূল উপাদানগুলো সবাই পেলো, তাদের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান পেলো, যেমন পানি, যা থেকে তৃপ্তির সাথে পান করে; স্বচ্ছ বায়ু, যার দ্বারা তারা শ্বাস গ্রহণ করে এবং সূর্যের কিরণ, যার থেকে তারা পায় আলো ও তাপ। তারপর যখন মৃত্যু আসে তখন এই মানব দেহের টুকরাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কত অসংখ্য টুকরায় এগুলো ছড়িয়ে পড়ে তা কেউ জানে না একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এবং কোত্থেকেই বা উদ্গত হয়েছে এই দেহ প্রাণ, তার খবরও কেউ জানে না একমাত্র তিনি ছাড়া মানব দেহের এই বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুগুলো একদিন আবার একত্রিত হয়ে পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হবে। অথচ প্রথম পয়দা হওয়ার সময় মাতৃগর্ভে একটি শুক্রকীট থেকে এই মানুষ বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি পূর্ণাংগ মানুষে পরিণত হয়েছে, একটি ঝুলন্ত

গোশতের টুকরা, যা পরে পরিপূর্ণ মানব আকারে আত্মপ্রকাশ করে পুনরায় কাফনের মধ্যে জড়ানো অবস্থায় মাটির মধ্যেই ফিরে গেছে। এই যদি হয় তার প্রথম সৃষ্টির ইতিবৃত্ত, তাহলে আবারও তার মানব আকার ধারণ করা অথবা অন্য কোনো অবস্থায় আবার জীবিত হওয়ার মধ্যে বিস্ময় কি আছে! কিন্তু তবুও তারা বিস্মিত হতো এবং সংশয় প্রকাশ করে এ রকম কথাই বলতো। ওদের কেউ কেউ আজও সামান্য কিছু শাব্দিক হেরফেরসহ এ একই কথা বলে!

বরাবর এভাবেই তারা কথাটি বলত। তারপর সেই পরিত্যক্ত জাহেলী কথাটা ঘৃণার সাথে তারা আবারও বলে এবং একান্ত খারাপ লাগা সত্তেও তারা অনুসরণ করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'এর পূর্বে আমাদের ও আমাদের বাপ-দাদাদের সাথে এভাবেই ওয়াদা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা প্রাচীন কালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, এর আগে ওদের বাপ-দাদাদের কাছে রসূলরা এসেছেন এবং পুনরুত্থান দিবস ও আল্লাহর দরবারে একত্রিত হতে হবে বলে তাদের সতর্কও করেছেন। তাদের কথায় এটাও প্রমাণিত হয় যে, আরবদের মন মগয ঈমানের মূল আকীদা বিশ্বাস থেকে একেবারেই মুক্ত ছিলো তা নয় এবং এ বিশ্বাসের প্রকৃত মর্ম কি তা যে তারা জানতো না তাও নয়। তারা শুধু এটাই হিসাব করছিলো যে, শেরেক ও অন্যায় কাজের কারণে যেসব আযাবের কথা বলা হয়েছে, তা বহু বহু কাল আগের কথা, এগুলো এখন আর দেখা যায় না। এ কারণেই তাদের কাছে আযাবের ভয় দেখানোটা ছিলো অতীতের মতোই এক ঠাট্টা মস্কারি, যা আবার নতুন করে তাদের সামনে আসছে। এই জন্যেই তারা বলতো, এটা প্রাচীন কালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা মোহাম্মদ (স.) আবার নতুন করে জানাচ্ছে। এসব কথা বলে তারা কেয়ামতকে ভুলে থাকতে চাইতো, যা অবশ্য নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। তাদের নাফরমানীর কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে তা নয়, মনে মনে তারা যদি চায় যে কেয়ামত আরও একটু দেরীতে আসুক– তাও হবার নয়। অবশ্যই কেয়ামত সংঘটিত হবে ঠিক সেই নির্ধারিত সময়েই, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। এ সম্পর্কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থিত আল্লাহর সকল বান্দা সমানভাবে অজ্ঞ। তাই রসূল (স.) জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর বলেছিলেন, 'যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, সে জিজ্ঞাসাকারী থেকে বেশী জানে না।(১)

এখানে এসব মিথ্যারোপকারীদের মোকাবেলা করার জন্যে মোমেনদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। যারা রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে এবং অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরামকেও মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চেয়েছে, এখানে তাদের প্রতি আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে,

এ উদ্দেশ্যে তাদের চিন্তার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করতে বলা হচ্ছে। অতপর আরো জানানো হচ্ছে যে, কোনো এক যুগের মানুষও গোটা পৃথিবীর মানবমন্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মানব গোষ্ঠী নয়। তারা সবাই সে সকল নিয়মে বাঁধা যা সকল মানুষের জন্যে একই নিয়মে একইভাবে প্রযোজ্য এবং সবার জন্যে তা তাদের সৃষ্টিকর্তা সমভাবে দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা অপরাধীদের জন্যে ইতিপূর্বে যেসব শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন, পরবর্তীদের জন্যেও দিয়েছেন সেই একই ঘোষণা। এই নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই– না এ নিয়ম কারও সাথে কোনো প্রকার আপোষ করে চলে। পৃথিবীর বুকে যারা ভ্রমণ করে এবং গভীর দৃষ্টিতে সব কিছুর দিকে তাকায়, তারা দেখতে পায়, এ কথার পরিপূর্ণ বাস্তবতা সর্বত্র বিরাজমান রয়েছে। তারা এ সব কিছু থেকে বিশ্ব প্রভু, দোজাহানের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহর কথার সত্যতা জানতে পায়। এ শিক্ষা লাভ করে তাদের গোটা দেহ মন রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতাভরে নুয়ে পড়ে।

(১) ঈমান ও ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে' এ আলোচনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে।

তাদের চিন্তা চেতনা আল্লাহর রহমতের ঝলমলে আলোকে রংগিন হয়ে যায়। এর ফলে দুনিয়ার সকল আকর্ষণ, সকল লোভ লালসা, হীনমন্যতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের আল্লাহর অত্যন্ত কাছাকাছি অনুভব করে, তাদের কাছে মনে হয় দিক চক্রবালে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টিলোকের মধ্যে বিরাজমান সব কিছু নিশিদিন বুঝি রহমানুর রহীমের জয়গান গেয়ে চলেছে। সেখানে কোনো জড়তা নেই, কোনো স্থবিরতা নেই, কোনো সংকীর্ণতা নেই, নেই পারস্পরিক কোনো বিচ্ছিন্নতা। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি এই সুন্দর মানুষের মনকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার পর তাঁর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, সত্যবিমুখ ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের সকল আচার আচরণ থেকে তাঁর হাত দুটি গুটিয়ে নিতে এবং তাদেরকে তাদের নিয়তির হাতে ছেড়ে দিতে তাদের সেই ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, যার দৃশ্যসমূহের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্যে সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, সত্যকে নস্যাৎ করার জন্যে তাদের সকল অপপ্রয়াসে তাঁর হৃদয় যেন সংকীর্ণ না হয়ে যায়, কারণ কোনো কিছুই তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর তিনিও যেন তাদের ভীষণ পরিণতির কথা চিন্তা করে দুঃখিত না হন, কেননা তাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করেছেন, যথাযথভাবে তিনি তাদের কাছে আল্লাহর অমীয় বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাদের সত্যের শুভ্র সমুজ্জ্বল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার এরশাদ হচ্ছে,

'না, তুমি দুঃখিত হয়ো না তাদের জন্যে। (সত্যের বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্যে) যেসব চক্রান্ত তারা চালাচ্ছে, তার জন্যে তোমার হৃদয় যেন সংকীর্ণ না হয়ে যায়।'

এ আয়াতাংশটি রসূলের হৃদয়ানুভূতির কী চমৎকার ছবি এঁকে দিয়েছে তা লক্ষণীয়। এ আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট ইংগিত দিচ্ছে যে, মহানবী (স.) দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর জাতি কঠিন পরিণামের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তাদের পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী জাতিসমূহের ব্যাপারে আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র কতো কঠিন, কতো তীব্র ছিলো, আরও জানিয়ে দিচ্ছে যে, কতো গভীর হৃদয়াবেগ নিয়ে মহানবী (স.) তাদের নিকট দাওয়াত পেশ করেছেন এবং তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার জন্যে মুসলমানরা কি কি কোরবানী দিয়ে চলেছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী রহমাতুল্লিল আলামীন (স.)-এর সুপ্রশস্ত হৃদয়ও এর ফলে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

পুনরুত্থান নিয়ে ঠাট্টা মশকারার পরিণতি

পুনরুত্থান বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা এগিয়ে চলেছে, তাই তাদের না-ফরমানীর পরিণতিতে দুনিয়া আখেরাতে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে, এ ধমকিকে তারা তুচ্ছ মনে করে চলেছে। নীচের আয়াতাংশে সেই কথাটির বর্ণনা পাওয়া যায়,

'আর ওরা বলে, পুনরুত্থান ও কেয়ামত দিবস সম্পর্কে তোমরা যে ভয় দেখাচ্ছো, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বলো না, তা কখন সংঘটিত হবে?'

যখনই তাদের সামনে তাদের পূর্বেকার অপরাধীদের কঠিন পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়, তখনই তারা এসব কথা বলে, অথচ সাধারণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু জাতির ঘটনাই তাদের জানা রয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেসব এলাকাবাসীর ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে তারা মাঝে মাঝে যাতায়াতও করে থাকে। যেমন, লূত (আ.)-এর এলাকা সিরিয়া অভিমুখে প্রায় একশত পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সামূদ জাতির এলাকা এবং মহাপ্রলয় তাড়িত বালুর পাহাড়সমূহে ঘেরা আদ জাতির এলাকার ধ্বংসাবশেষ এবং প্রলয়ংকরী পানির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সাবা জাতির জনমানবশূন্য পরিত্যক্ত এলাকার দৃশ্যসমূহ ....এসব দেখা সত্তেও তারা ঠাট্টা মস্কারিচ্ছলে

বলতো, 'কবে আসবে তোমার সেই ওয়াদার (গযব নাযিলের) দিন, বলো না যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো!' অর্থাৎ যে আযাবের ভয় তোমরা আমাদের দেখাচ্ছো, তা কবে সংঘটিত হবে? তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকলে এখনই নিয়ে এসো না। অথবা, কবে আসবে সে আযাব– তা নির্দিষ্ট করে বলো না!

এই পর্যায়ে এসে এমন এক ভাষায় তাদের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যা তাদের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রচন্ড এক ভয় সৃষ্টি করছে এবং অত্যন্ত অল্প কথায় তাদের মনের এই ভীতিজনক অবস্থার দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,

'বলো, হয়তো শীঘ্রই তোমাদের পেছনে সেই আযাবের কিছু অংশ ছুটে আসছে যার জন্যে তোমরা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছো।'

এখানে মনে রাখতে হবে, যারা ঠাট্টা-মস্কারি করছিলো, তারা নবী মোহাম্মদ (স.)-কে ছোটবেলা থেকে চিনতো, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার কথা জানতো। গরীবের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ সম্পর্কে জানতো, পরের হিতে তাঁর নিজের অসাধারণ আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব ইতিহাসও জানতো। এজন্যে যখন তাঁর মুখ দিয়ে আযাবের সংবাদ তারা শুনেছে, তখন তাদের অন্তরাত্মা প্রচন্ডভাবে কেঁপে ওঠেছে, যেমন বেলালের সাবেক মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ, আবদুর রহমান ইবনে আওফের মুখে যখন শুনেছিলো, অচিরেই তারা মুসলমানদের হাতে নিহত হবে, তখন তার বুক থরথর করে কেঁপে ওঠেছিলো এবং জিজ্ঞেস করে যখন সে জেনে নিয়েছিলো যে, তাদের মৃত্যু হবে মক্কার বাইরে। তখন সে কসম খেয়েছিলো যে আর কখনও মক্কার বাইরে যাবে না। তাই হয়তো 'শীঘ্রই আসবে সেই আযাব যার জন্যে তারা এত ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলো।'– একথা শোনার সাথে সাথে তাদের মন দারুণভাবে আতংকিত হয়ে পড়লো, পেরেশানী এতোদূর তাদের ঘিরে ফেললো যেন তারা ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখেছে যে, প্রবল বেগে তাদের দিকে সর্বগ্রাসী এক আযাব ছুটে আসছে, ছুটে আসছে এমনভাবে যেমন করে কোনো পশুর ওপর আরোহী যাত্রীকে তার অজান্তে কোনো ঘোড়সওয়ার ধাওয়া করে। তাই, 'আযাব নাযিল হোক,' বলে যারা জলদি করে তারা হয়তো ভুলে রয়েছে যে, তাদের পেছনে ধেয়ে আসছে সেই কাংখিত আযাব। সুতরাং হায় আফসোস, হঠাৎ করে যখন তাদের ঘিরে ফেলবে সেই কঠিন আযাব তখন তাদের হাড্ডির জোড়াগুলো ভীষনভাবে কাঁপতে থাকবে, যেমন করে কাঁপতে শুরু করেছে সেই মুহূর্তে– যখন তারা শুনেছে শীঘ্রই আযাব নাযিল হবে।

মানবজাতির ক্ষমাহীন উদাসীনতা

কেই বা জানে গায়বের রহস্য! গায়ব বলতে বুঝা– চোখের অন্তরালে যা কিছু আছে, তা তো আসলে পর্দার আড়ালেই রয়েছে, তা কেমন কে তার খবর রাখে! সে পর্দা তো ঝুলে রয়েছে পায়ের তলদেশ পর্যন্ত, এর অপর পাশে কি আছে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না– তারা তো গাফলতির নিদ্রায় নিদ্রিত! প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি যে সতর্ক হয়ে চলে, সে পোখতা এরাদা করে এবং প্রতি মুহূর্তেই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্যসমূহ জানার ও বুঝার জন্যে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার রব সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্যে অবশ্যই মেহেরবান, কিন্তু তাদের অধিকাংশই শোকরগোযারী করে না।'

অর্থাৎ অপরাধী হওয়া সত্তেও অথবা ওরা কর্তব্য পালনে বিরত থাকা সত্তেও ওদের ওপর আযাব নাযিল করাতে যে বিলম্ব করা হচ্ছে, তাদের (সংশোধনের জন্যে) সুযোগ দেয়া হচ্ছে, এটা তাঁর অসীম মেহেরবানীরই অংশ। আহ্, ওরা যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতো, সঠিকভাবে এর মর্যাদা বুঝতো, এ সুযোগ কাজে লাগাতো, তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতো এবং

সময় থাকতেই যদি ওরা সত্য সুন্দর ও মযবুত পথটি বুঝতো (তাহলে তা ওদের জন্যে কতোই না ভালো হতো!) 'কিন্তু ওদের অধিকাংশই শোকরগোযারী করে না।' এ মহান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, এই রহমতের হক ওরা আদায় করে না, বরং তারা ঠাট্টা-মস্কারি করে এবং আল্লাহর আযাব দেখার জন্যে ব্যস্ততা দেখায়। আসলে ব্যস্ততা দেখানোর মাধ্যমে তারা এটাই বুঝাতে চায় যে, আযাব নাযিল হওয়ার যে ধমকি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, তা মোটেই কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়, কোনোদিনই এটা আসবে না। একটা ভুয়া কথা বলে মোহাম্মদ তাদের ওপর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায় মাত্র, অথবা বলা যায়, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, কি করবে না করবে কিছুই তারা বুঝে ওঠতে পারছে না। একদিকে তাদের মনের মধ্যে মোহাম্মদ (স.)-এর বর্তমান ও অতীতের পবিত্র সত্যনিষ্ঠ জীবন, তাঁর সত্যসন্ধ তৎপরতা ও পরোপকারী কার্যাবলী ধাক্কা দিচ্ছে। অপরদিকে বাপ-দাদার ধর্ম, রীতি-নীতি সব পরিত্যাগ করার কষ্ট এবং সর্বোপরি রয়েছে নেতা কর্তাদের পক্ষ থেকে জাগিয়ে দেয়া আত্মমর্যাদাবোধের নিদারুণ নেশা, কিন্তু একবারও তারা ভাবছে না এ সবের শেষ কোথায়। তাই তাদের মধ্যে সঠিক চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে মহান করুণাময় রব্বুল আলামীন বলছেন,

'তোমার রব, তিনি অবশ্যই জানেন যা কিছু ওদের বক্ষসমূহ গোপন করে রেখেছে এবং যা কিছু ওরা প্রকাশ করছে।

অর্থাৎ মহান পরওয়ারদেগার সংশোধনের জন্যে তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ দিচ্ছেন এবং আযাব নাযিল করায় যথেষ্ট বিলম্ব করছেন। যদিও তাদের বুকের মধ্যে যা কিছু গোপন রয়েছে এবং যা কিছু ওরা ওদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করছে তা সবই তিনি জানেন। জেনে বুঝেই তিনি সুযোগ দিচ্ছেন এবং এই সুযোগ দান করা তাঁর মহা মেহেরবানীর বহিৰ্প্রকাশ মাত্র। তবে পরিশেষে বলা হচ্ছে, অবশ্যই তাদের এসব কাজ, কথা ও চিন্তার হিসাব নেয়া হবে যা তাদের বুকের মধ্যে বিরাজ করছে এবং যা তারা প্রকাশ করছে।

আলোচ্য এ প্রসংগের বিরতি টানা হচ্ছে এ কথার ওপর যে, মহান আল্লাহর এলেম (জ্ঞান) পরিব্যাপ্ত রয়েছে সকল কিছুর ওপর এবং আসমান যমীনের কোনো কিছুই তার কাছে গোপন নেই। নীচের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে,

'আসমান যমীনের যেখানে যা কিছু গোপন রয়েছে তা সবই সুস্পষ্ট কেতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'

ওপরের কথা দ্বারা মানুষের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা সুউচ্চ আকাশ ও বিশাল এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, চোখের অন্তরালে যা কিছু বস্তু বা বিষয় নিহিত রয়েছে তা জানানো হচ্ছে। যা কিছু শক্তি ও তথ্য তা সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহর মহান জ্ঞানভান্ডারের মধ্যে মজুদ রয়েছে। এ ভান্ডার থেকে কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়া বা তাঁর নযর এড়িয়ে কোনো কিছু বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যা কিছু এ সূরার মধ্যে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহর সর্বব্যাপী ও অসীম জ্ঞানের মধ্যে সব কিছুই বর্তমান রয়েছে। এখানে কোনো জিনিস তাঁর জানা-শোনার বাইরে নেই। এটাই এ সূরার শেষ ও চূড়ান্ত কথা।

ইহুদীদের বিকৃতি ও মতভেদে লিপ্ত হওয়া

এ প্রসংগে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ও নিরংকুশ জ্ঞান সম্পর্কে কথা এসেছে। যার বর্ণনা আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। তাই দেখা যায়, বনী ইসরাঈল জাতি যেসব বিষয়ে মতভেদ করেছে সেগুলোর ব্যাপারে তিনি পৃথক পৃথকভাবে ওদের সম্বোধন করেছেন। তাঁর নিশ্চিত ও অবাধ জ্ঞান দ্বারা ওদের মতভেদের বিষয়গুলো জেনে তিনি তার সঠিক ফয়সালা দান করেছেন। এ জ্ঞান তাঁর মেহেরবানীর নমুনা। এ জ্ঞান দ্বারা তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে ফয়সালা

করেছেন। তিনি বিবদমান প্রত্যেক গ্রুপকে সম্বোধন করেছেন যাতে করে তার চূড়ান্ত জ্ঞান দ্বারা রসূল (স.)-কে সম্মানিত করা যায় এবং আল্লাহর দুশমনদের তার হাতে ছেড়ে দেয়া যায়, যেন তিনি তার অদৃশ্য জ্ঞান অনুযায়ী উভয় শ্রেণীর মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিতে পারেন। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই এ কোরআনে বনী ইসরাঈলদের মতভেদ দূর করার জন্যে এতো বেশী কথা বলেছেন যা ওদের বিবদমান বিষয়গুলো থেকেও বেশী (যেন সহজেই এরা মতভেদ করা থেকে বিরত হতে পারে)।'

তুমি অন্ধ কোনো ব্যক্তিকে, তাদের ভুল পথ থেকে সঠিক পথে জোর করে টেনে আনতে পারবে না। শুধু তাকেই তুমি শোনাতে পারবে যে আমার আয়াতগুলোর ওপর ঈমান রাখে, অতপর তারাই হবে মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) । (আয়াত ৭৬-৮১)

নাসারারা ঈসা মাসীহ (আ.) ও তার মা মারইয়ামের ব্যাপারে নানাপ্রকার মতভেদ করেছে।

একদল বলেছে, ঈসা মসীহ শুধু একজন মানুষ এবং আর একদল বলেছে, বাপ, ছেলে এবং পবিত্র আত্মা– এই তিনটি একই অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপ, যাদের সম্পর্কে মানুষকে বুঝানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা নিজে এইভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ওদের ধারণায়, আল্লাহ তায়ালা এই তিনে মিশে এ মহাশক্তির সমাহার, পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা। অতপর রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) আকারে আল্লাহ তায়ালা নিজে নেমে এসেছেন এবং মারইয়ামের মধ্যে দেহ ধারণ করেছেন, যার কারণে তার থেকে 'ইয়াসূ' আকারে এক বাচ্চার জন্ম হয়েছে। আর একদল বলেছে, পিতার মতো পুত্র কোনো চিরন্তন সত্ত্বা নয়, সে বিশ্বজগতের পক্ষ থেকে আগত এক সৃষ্টি। সুতরাং সে পিতা থেকে আলাদা এক সত্ত্বা এবং তাঁর কাছে অবনত। আর এক দল আছে, যারা সর্বশক্তিমান হিসেবে রুহুল কুদুসের অস্তিত্বই অস্বীকার করে। আর ৩২৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সমাবেশে এ 'তিনে মিলে এক মহাসুন্দর' এ কথার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং ৩৮১ খৃষ্টাব্দে কনষ্টানটিনোপলের মহাসমাবেশে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, সর্বশক্তিমান পিতার (সাহায্যের জন্যে) রুহুল কুদুস এবং পুত্র– দুই ব্যক্তিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনাদিকাল থেকে পিতার মধ্য থেকে পুত্রের জন্ম হয়েছে। আর রুহুল কুদুসের আবির্ভাব হয়েছে পিতা থেকে। এরপর ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভার টলেডোতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় কনফারেন্সে ঘোষণা দেয়া হলো যে, রুহুল কুদুস পুত্রের মধ্য থেকে আবির্ভূত হতে পারে। এরপর এই বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গির্জাগুলো বিভক্ত হয়ে যায় .... তারপর মহাগ্রন্থ আল কোরআন এই মতপার্থক্যের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। আল কোরআন এ বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দিতে গিয়ে ঈসা মসীহ (আ.) সম্পর্কে জানায় যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর এক বিশেষ ক্ষমতা, হাঁ, অবশ্যই তিনি আল্লাহর ক্ষমতার এক নিদর্শন। তাঁর এই নিদর্শন তিনি দান করেছেন মারইয়ামের কাছে এবং তাঁর কাছ থেকে আগত এটা একটা আত্মা এবং অবশ্যই সে একজন মানুষ .... 'সে একজন বান্দা মাত্র, যার ওপর আমি মহান আল্লাহ আমার নেয়ামত বর্ষণ করেছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্যে তাকে আমার ক্ষমতার এক দৃষ্টান্ত বানিয়েছি। যে বিষয়ে ওরা মতভেদে লিপ্ত ছিল, সে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেয়ার জন্যে এ ছিলো এক চূড়ান্ত ব্যবস্থা।'

এভাবে তারা মতভেদ করলো তাকে শূলিতে চড়ানোর বিষয়েও। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, তাকে শূলিতে চড়ানোর পর তিনি মারা গেছেন এবং দাফন করার তিন দিন পর তিনি যিন্দা হয়ে ওঠেন, এরপর তাকে তুলে নেয়া হয় উর্ধ্বাকাশে। ওদের মধ্যে আর এক দল বলেছে, তাঁর বিশিষ্ট সাহাবাদের মধ্যে ইয়্যাহুদা নামক এক ব্যক্তি ছিলো। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, যার ফলে (আল্লাহর ইচ্ছায়) তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে গেলো এবং তাকেই ধরে শূলিতে চড়ানো হলো। ওদের আর এক দল বলেছে, সাইমুন নামক এক ব্যক্তির চেহারাকে

তাঁর মতো করে দেয়া হলো এবং তাকে ধরে শূলিতে চড়ানো হল ...... তাই কোরআনুল করীম এ বিষয়ে সঠিক ও সুনিশ্চিত কাহিনীর বর্ণনা পেশ করেছে, 'ওরা তাকে হত্যা করেনি বা শূলিতেও চড়ায়নি, বরং তাদের কাছে সে (ধৃত) ব্যক্তিকে তার মতোই মনে হয়েছিল।' এরপর আল কোরআন বলছে, 'হে ঈসা, অবশ্যই আমি তোমাকে ওফাত দান করব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নিয়ে আসবো এবং তোমাকে পবিত্র করবো।' .... এভাবেই, আল কোরআন এ চূড়ান্ত কথা দ্বারা সকল মতভেদের অবসান ঘটিয়েছে।

এর আগেই ইহুদীরা তাওরাত পরিবর্তন করে ফেলেছিলো এবং আল্লাহ তায়ালার আইন-কানুন থেকে তারা সরে গিয়েছিলো। অতপর আল কোরআন এসে সেই আসল আইনটা চালু করেছে যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি মহান আল্লাহ, তাদের জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করার জন্যে (বিধান) প্রেরণ করলাম, যাতে বলা হলো, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং প্রত্যেক যখমের জন্যে রয়েছে অনুরূপ শাস্তি।'

কোরআন তাদের ইতিহাস ও তাদের নবীদের ইতিহাস থেকে সত্য কথাগুলোই তুলে ধরেছে। এ সব কথা সে সকল কাল্পনিক কাহিনী থেকে মুক্ত, যেগুলো সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা এসেছে। নবীদের জন্যে মানহানিকর যেসব বাজে কথা তারা বর্ণনা করেছে, আল কোরআন সেগুলো থেকে নবীদের পবিত্রতা ঘোষণা করেছে। বনী ইসরাঈলের নেতারা নবীদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন যেসব বর্ণনা পেশ করেছে সেগুলো এতো অবমাননাকর যে, সেগুলোর দিকে খেয়াল করে দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় এবং প্রশ্ন জাগে, এ জাতি এমন করে আল্লাহর নবীদের সম্পর্কে এসব জঘন্য কথা আরোপ করতে পারলো? তারা কোনো একজন নবীকেও সেসব কদর্য অপবাদ থেকে রেহাই দেয়নি। এসব রেওয়ায়াত এক সময় এই ধারণারই জন্ম দেয় যে, শয়তানের তাবেদারি করতে গিয়ে তারা ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছে, এ কারণে তাদের নীতি নৈতিকতার মান এতোদূর নেমে গিয়েছিলো যে, নবীদেরও তারা নিজেদের মতো আত্ম-পূজারী হিসাবে গণ্য করেছে এবং তাদের ঘিরে বহু অলীক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। .... দেখুন, নবী ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তারা কী জঘন্য কাহিনী বানিয়েছে! তারা দাবী করেছে যে, ফিলিস্তিনের বাদশাহ আবু মালেকের কাছে ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন। আর এক সময় মিসরের বাদশাহ ফেরাউনের কাছে (তার স্ত্রীকে) তিনি তাঁর বোন পরিচয় দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা ও আর্থিক আনুকূল্য লাভ করা যায়!

আবার দেখুন ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কে তাদের ব্যবহার! ইয়াকুব (আ.)-ই পরে ইসরাঈল বলে পরিচিত হয়েছেন, যাঁর নামে এই জাতির নাম হয়েছে বনী ইসরাঈল। তাঁর পিতা হচ্ছেন ইসহাক (আ.) এবং দাদা ইবরাহীম (আ.)। এই ইয়াকুব (আ.) তাঁর পিতা ইসহাক (আ.)-এর মাধ্যমে, দাদা ইবরাহীম (আ.) থেকে চুরি হিলা-বাহানা এবং মিথ্যা কথা বলে বরকত লাভ করেছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এ বরকতের স্বত্ত্বাধিকারী বা ন্যায্য পাওনাদার ছিলো ইয়াকুব (আ.)-এর বড় ভাই ঈসূ!

লূত (আ.) সম্পর্কে তাদের বর্ণনা আরো জঘন্য, তারা দাবী করে, তার দুই কন্যা তাকে শারীরিকভাবে উত্তেজিত করে এবং তারা উভয়ই অন্তত এক রাত্রির জন্যে তাকে তাদের শয্যাসাথী বানাতে চেয়েছে, ফলে তাদের গর্ভে তার ঔরসজাত সন্তানের জন্ম হবে এবং সেই সন্তান বা সন্তানেরা তার ওয়ারিস হবে এবং তাদের বাপের সম্পদ আর বাইরে যাবে না। আর লূত (আ.)-এর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় এ প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়েছে। এর ফলে সে দুই কন্যা যা চেয়েছিলো তাই পূরণ হয়েছে।

নবী দাউদের ব্যাপারে তাদের ঔদ্ধত্য দেখুন। দাউদ (আ.) তার বাড়ীর ছাদ থেকে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়ে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানতে পারলেন, সে মহিলার স্বামী তাঁরই সেনাবাহিনীর একজন সদস্য; অতপর সে মহিলাকে পাওয়ার জন্যে সে সৈনিককে তিনি এক কঠিন সমরে পাঠিয়ে দেন, যাতে করে সে মারা যায় এবং তাকে পাওয়ার পথ তাঁর জন্যে সুগম হয়ে যায়। আর নবী সোলায়মান (আ.) ওদের কথা অনুযায়ী একবার এক খচ্চরের পূজা করার দিকে (নাউযু বিল্লাহ) ঝুঁকে পড়েন, উদ্দেশ্য প্রচুর যৌনশক্তির অধিকারী হওয়া। কেননা তাঁর এক স্ত্রীকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি তার যৌনক্ষুধা মেটাতে পারতেন না, এ জন্যে তাকে তিনি ভাড়া দিতে বাধ্য হতেন।(১)

এমনই এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আল কোরআন নাযিল হলো এবং নবীদের চরিত্রের ওপর ইসরাঈলীদের আরোপিত কলংক কালিমাগুলো নিশেষে মুছে দিলো, যেগুলো (তাদের দাবী মতে) আসমান থেকে অবতীর্ণ তাওরাতের মধ্যে লিখিত রয়েছে। এভাবে মারইয়াম পুত্র ঈসা (আ.) সম্পর্কে ওদের রটানো বদনামগুলোও আল কোরআন এভাবে সংশোধন করেছে।

কোরআন হচ্ছে মোমেনদের পথ প্রদর্শক

মহাগ্রন্থ আল কোরআন তার পূর্বে অবতীর্ণ সকল কেতাবের পরিদর্শক, পর্যালোচনাকারী ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করেছে এবং সেসব মতভেদের ফায়সালা করে দিয়েছে যার মধ্যে অন্যান্য কেতাবের অনুসারীরা লিপ্ত হওয়ার ফলে নানা মত ও পথে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে এবং কলহ-বিবাদ ও মারামারি-কাটাকাটি করে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে গেছে। এ হিসেবে আল কোরআন বিবদমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অনেকটা বিচারকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই এ কেতাব হেদায়াত (পথ প্রদর্শক) ও মোমেনদের জন্যে রহমত।'

'হেদায়াত' এ অর্থে যে, ওদের মতভেদ ও ভুল পথে চালিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তাদের জন্যে একটি মাত্র জীবন পথ নিরূপণ করে দিয়েছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, শান্তি ও কল্যাণের পথ মাত্র একটি। এরপর তাদের জানিয়েছে যে, মহা সৃষ্টির সকল নিয়ম কানুনের সাথে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে যা কোনো সময় বদলায় না এবং যে নিয়ম কখনও থেমেও যায় না। এভাবে আল কোরআন তাদের মধ্যে বিরাজমান সকল মতভেদ দূর

(১) বনী ইসলাঈলের এই নর্দমার কীটগুলো অতীত যমানায় যে এসব করেছে তাই নয়– নিজেদের কুলাংগার চরিত্রের মতো নবীদেরও এ চরিত্র হনন প্রক্রিয়া তারা ইতিহাসের সর্বযুগেই চালু রেখেছে। তাদের এ আচরণ ইদানীং ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি ইলেকট্রোনিক মিডিয়া তথা চলচ্চিত্র, কম্পিউটার সিডি ও ইন্টারনেটের ওপর গিয়ে ভর করেছে। ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু বলে কথিত হলিউড থেকে যেসব চলচ্চিত্র ইদানীং তৈরী হচ্ছে তার প্রতিটি স্তরে তাদের এ ষড়যন্ত্রের স্বাক্ষর আপনার নযরে পড়বে। 'কিং সলোমান ও কুইন অব শিবা' ছবিতে হযরত সোলায়মানকে যৌন বিকৃত একজন প্রেমিক বাদশাহ হিসেবে শিবার রানীর নগ্ন প্রায় দেহের সাথে ঢলাঢলি খেতে দেখানো হয়েছে। ধর্মভিত্তিক বিখ্যাত ছবি 'টেন কমান্ডমেন্টে' ফেরাউনের মহলে মূসার চরিত্রেও চার্লটন হেস্টনের নৈতিক বেলেল্লাপনা দেখুন। বাছুর পূজার প্রতি হারুনের তীব্র আশক্তির কল্পিত কাহিনীও দেখুন। বৃটিশ টিভির পপুলার কমেডি সিরিজ 'ও ব্রাইন'-এ হযরত ঈসাকে নির্লজ্জভাবে অপমান করা হয়েছে। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি হলিউডের জনৈক ইহুদী পরিচালকের ছবি 'লাস্ট টেম্পটেশান অব ক্রাইস্ট' ছবিটি সম্ভবত নোংরামি ও কদর্যে সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই ছবিতে হযরত ঈসাকে একজন সমকামে আসক্ত ও পতিতাভক্ত দেখানো হয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্মীয় গুরু পোপ জন পল সহ অনেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইহুদী চক্রান্তের পাতানো জালে সে কণ্ঠগুলোও একসময় আটকা পড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে, কেউই টের করতে পারেনি। যারা নবী রসূলদের নিয়ে এই নির্মম তামাশা করে তাদের ওপর আল্লাহর গযব শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।–সম্পাদক

করেছে, বিভিন্ন মত ও পথের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তারা যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, সেই কঠিন অবস্থা থেকে তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। অতপর তাদের পরম করুণাময় আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছে, যাঁর সান্নিধ্য লাভ করে তারা ধন্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, পরম পরিতৃপ্তিতে এবার তাদের মন ভরে ওঠে। শান্তির সাথে নিজেদের পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী ও সকল শ্রেণীর জনগণকে নিয়ে বাস করতে শুরু করে। এভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে ধন্য হয় এবং পরকালের সঠিক সাফল্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যায়।

মানুষকে নতুন জীবন দান করার জন্যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পদ্ধতিই হচ্ছে একমাত্র ও অনবদ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই তাদের খাঁটি প্রকৃতির ধর্মে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কেননা এর মধ্যে সে তার প্রয়োজনীয় সব কিছু পায়, যা একজন সামাজিক জীব হিসেবে তার পাওয়া প্রয়োজন। এই জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমেই সৃষ্টির সব কিছুর সাথে সে সহজেই এবং বিনা কষ্টে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। এই পদ্ধতি অবলম্বনে সে তার জীবনের মূল্যবোধও খুঁজে পাবে।

মানুষ এমন এক বিশ্বে বাস করছে যার মধ্যে বিরাজমান প্রত্যেকটি জিনিস একটি অপরটির সাথে নিশিদিন সহযোগিতা করে চলছে, কোনো জিনিস একটি আর একটির সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক নয়, সাংঘর্ষিক হতেই পারে না। যেহেতু এসব কিছুর মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই এগুলোকে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনামাফিক চালাচ্ছেন। তাঁর এই ইচ্ছা ও পরিকল্পনা সঠিকভাবে মোমেন ব্যক্তিই বুঝতে পারে। যখন সে আল্লাহর বিধানমতে এগুলো ব্যবহার করে তখনই এগুলো থেকে সে আশানুরূপ ফায়দা পেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই মানুষ মহাবিশ্বের সব কিছুকে নিজেদের সর্বাধিক কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর যেখানে যখন মানুষ আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী সব কিছু ভোগ ব্যবহার করতে চেয়েছে, তখন সেখানে সব কিছুই তার সাথে সহযোগিতা করে তাকে অভাবনীয় কল্যাণ দিয়েছে, মানুষে মানুষে ভালোবাসাবাসি পয়দা হয়েছে, আর তখনই প্রকৃতপক্ষে সকল রূপ ও অর্থে আল্লাহর রহমত অযুত ধারায় দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছে।.............

দ্বীনবিমুখ অন্ধদের মোকাবেলায় দায়ীদের অবস্থান

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনা শেষে আসুন, আমরা একবার আল্লাহর সেই অপার রহমতের বারিধারার দিকে নযর বুলাই, যা এই কোরআনের ধারক বাহকদের ওপর সিঞ্চিত করা হয়েছে, এটা বনী ইসরাঈলদের বিবদমান বিষয়াদির ফয়সালা করে দিয়েছে, মোমেনদের হেদায়াতের পথে পরিচালনা করেছে এবং তাদের জন্যে তার রহমতের ভান্ডারও অবারিত করে দিয়েছে।............. সুস্পষ্টভাবে রসূলকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাঁর রব শীঘ্রই তাঁর ও তাঁর জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তিনি তাঁর সেই চূড়ান্ত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করে দেবেন যা কেউই থামাতে পারবে না। তাঁর এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি রচিত হয়েছে সুনিশ্চিত জ্ঞান ও অবিচল বিশ্বাসের ওপর। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব (হে নবী), ভরসা করো আল্লাহর ওপর, অবশ্যই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছো।'

অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন চিরন্তন। চূড়ান্ত সত্য হিসেবে তিনি সত্যের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন দান ঠিক তেমনি অবধারিত ও সুনিশ্চিত করে দিয়েছেন যেমন করে আসমান যমীনের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত একটি সত্য, যেমন সত্য রাত ও দিনের আনাগোনাও। এ এমন এক নিয়ম যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। এ সব কিছু চলছে, ধীর ও মন্থর গতিতে আবর্তিত হচ্ছে, এমন ধীর গতিতে যেন এর বাসিন্দারা ছিটকে না পড়ে যায়, এ হচ্ছে আল্লাহর এক অমোঘ এবং

অনির্বচনীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা যে উদ্দেশ্যে তিনি দান করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন এবং তার সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্যেই মূলত এ সব আয়োজন। এ ব্যবস্থা বিরতিহীনভাবে চলতে থাকবে- এটা আল্লাহর ওয়াদা এবং তিনি তাঁর ওয়াদা কখনও খেলাফ করেন না। এটা অবশ্যই সত্য কথা যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য- এ কথার ওপর আস্থা রাখা ঈমানের একটি অপরিহার্য অংগ। অতএব এ ওয়াদা পূরণের জন্যে অবশ্যই আমাদের কিছুটা সময় এন্তেযার করতে হবে, তাঁর ওয়াদা পূরণ হবেই এবং সময়মতোই তা পূরণ হবে, তার আগেও নয় পরেও নয়।

এরপর কাফেরদের বিরূপ আচরণের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। জাহেলিয়াতের মধ্যে অবিচল ও অনড়ভাবে টিকে থাকার জন্যে তাদের জিদ এবং সত্য সঠিক ব্যবস্থা এসে যাওয়ার পরও তার প্রতি অবজ্ঞার কারণে যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছিলো তা ঝেড়ে মুছে ফেলে আল্লাহর রহমত ও কুদরতের ওপর ভরসা রাখার জন্যে তাঁকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে রসূলুল্লাহ (স.) হঠকারীদের সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, বিরোধিতা, ঘৃণা, কটাক্ষপাত, অপমান ও বিদ্রূপবাণ সহ্য করে তাঁর সর্বোত্তম চরিত্র ও মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যের যে বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর দেশবাসীকে অবিশ্রান্তভাবে যে নসীহত করে চলেছিলেন, তার প্রতি আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় তাঁর মনের ওপর যে কঠিন চাপ পড়ছিলো তা লাঘব করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জানাচ্ছেন, 'না- ওদের এসব কদর্য ব্যবহার তাঁর দাওয়াতকে কখনই হেয় করতে পারবে না।'

অবশ্যই ওদের মধ্য থেকে কিছু যিন্দা দিল লোক এগিয়ে আসবে, সংখ্যায় কম হলেও তাদের কানগুলো তাঁর কথাকে হেফাযত করবে, তাদের অন্তরগুলোতে তাঁর কথা যথাযথভাবে দোলা লাগবে এবং তারা সর্বান্তকরণে ও পরম বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর দাওয়াত কবুল করবে। যাদের দিল মরে গেছে, হেদায়াত ও ঈমানের প্রদীপ্ত প্রদীপ দেখা থেকে যাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, কোনোভাবেই তারা সঠিক পথ দেখতে পাবে না, তাদের অন্তরের ঘনান্ধকারের মধ্যে সত্যের জ্যোতি কোনোভাবেই প্রবেশের পথ খুঁজে পাবে না এবং তাদের এই গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকা ও সত্য থেকে পালিয়ে বহু দূরে চলে যাওয়া তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'(মনে রেখো,) তুমি মৃত লোকদের কখনো (তোমার কথা) শুনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আওয়ায শোনাতে পারবে না, (বিশেষ করে) যখন তারা (তোমাকে দেখে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তখন তো শোনানোর প্রশ্নই আসে না। একইভাবে) তুমি (সত্যের ব্যাপারে) অন্ধদেরও (তাদের) গোমরাহী থেকে (বের করে) সঠিক পথের ওপর আসতে পারবে না, তুমি তো শুধু তাদেরই (তোমার কথা) শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পণ করে।'

আল কোরআনের কী চমৎকার ব্যাখ্যা। এর মধুর ভাষা ও বর্ণনাশৈলী সত্যকে চিত্রিত করেছে এক জীবন্ত সত্ত্বা হিসাবে, যা এমন সব আত্মাকে গতি দান করেছে যার মধ্যে কোনো চেতনাই ছিলো না। এরা ছিলো জড় পদার্থের মতো। এদের অন্তর ছিলো পাথরের মতো চেতনাহীন, এদের রূহগুলো ছিলো স্থবির, ওদের অনুভূতির মধ্যে বোকামি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো এবং বোধশক্তি ছিলো নির্বাপিত, অতপর রসূলুল্লাহ (স.) যখন ওদেরে আহ্বান জানান তখন মৃতের মতো এরা কোনো সাড়া দেয় না, এমনকি ওরা ডাক শোনে বলেও মনে হয় না, কারণ মৃতদের যেমন বুঝ থাকে না এদেরও বুঝশক্তি বলতে কোনো জিনিস নেই! এদের কোনো সময় বের করে নেয়া হবে বধির হিসেবে, যেহেতু এদের ডাকলে এরা সাড়া না দিয়ে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়, মনে হয় এরা শোনেই না। ওরা পরস্পরের সামনে এভাবে হাযির হয় যেন তারা নড়ানড়ি করা এক দেহমাত্র যদিও তারা নিজেদের খুবই জ্ঞানী ও অনুভূতিশীল মনে করে!

আল্লাহর দৃষ্টিতে মৃত, অন্ধ ও বধিরদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মোমেনরা– এরাই তার দৃষ্টিতে যিন্দা, এরাই সব শুনে, এরাই সব দেখে। এ জন্যেই তিনি বলছেন,

'তুমি তাদেরই শোনাতে পারবে যারা আমার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে এবং তারাই মুসলমান।'

অর্থাৎ, তুমি শুধু সেসব ব্যক্তিদের শোনাতে পারবে যাদের অন্তর শোনার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে এবং যারা জীবনের সকল সজীবতা দিয়ে, শোনার শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়ে আছে। জীবনের লক্ষণ হচ্ছে চেতনা থাকা এবং শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির লক্ষণ হচ্ছে তার কাছ থেকে কান ও চোখের খেদমত নেয়া। প্রকৃতপক্ষে মোমেনরাই তাদের জীবদ্দশায় কান ও চোখের সদ্ব্যবহার করে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাতের যিন্দেগীর মধ্য থেকে গৃহীত শিক্ষাসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগায়। রসূলুল্লাহ (স.) তাদের আল্লাহর বাণী শোনান এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদের পরিচালনা করেন, যার কারণে মুসলমানরা প্রতি মুহূর্তে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং নিজেদের অন্তরের আবেগসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

অবশ্যই ইসলাম একমাত্র ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত জীবন ব্যবস্থা, মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এর মধ্যেই রয়েছে। এ ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সকল দাবী পূরণ করে। এ ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোনো নির্দেশ নেই যা তার জন্যে অকল্যাণকর বা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইসলামের সকল ব্যবস্থা জেনে বুঝে, মন প্রাণ দিয়ে মেনে না নেয়া পর্যন্ত এ ব্যবস্থার সৌন্দর্য, উপযোগিতা ও উপকারিতা বুঝা সম্ভব নয়। কেউ আল্লাহর বিধানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেই সে দেখতে পাবে যে, এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আর এভাবে আল কোরআন সেসব অন্তরেরই ছবি এঁকেছে, যারা হেদায়াতের দিকে এগিয়ে আছে, সত্য কথা শুনতে সদা সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে, যারা বাজে তর্ক করে না এবং রসূলুল্লাহ (স.) যে বিষয়ে তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন সে বিষয়ে পুনরায় চিন্তা করার কোনো দরকার মনে করে না, তারাই হচ্ছে মোমেন।

কেয়ামতের কিছু আলামত

এরপর সূরাটির মধ্যে বর্ণিত শেষ ঘটনা বলার পূর্বে আর একটি পরিভ্রমণের কথা আসছে। তা হচ্ছে, আখেরাতের পূর্ব শর্তসমূহ ও তার কিছু দৃশ্য সম্পর্কে .... এ পরিক্রমায় উল্লেখিত হয়েছে অদ্ভুত এক জন্তুর আগমনের কথা, যা মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করবে, কথা বলতে থাকবে তাদের সাথে যারা ঈমান আনবে না। এ হবে এমন এক ঘটনা, যা সৃষ্টির বুকে বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর অন্যতম। এ নিদর্শন রোয হাশরের দৃশ্যের এক চমৎকার ছবি অংকন করবে, যা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে এক প্রচন্ড ধমক হিসেবে কাজ করবে। এসব অবস্থা দেখে সে হঠকারী কাফেরদের দল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে, তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরবে না। অতপর এ দৃশ্য থেকে তাদের নযর আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে রাত ও দিনের মধ্যে বর্তমান আরো নিদর্শনসমূহের দিকে, যা দিবানিশি তাদের চোখের সামনে ভাসছে, তবু তারা দেখছে না।

দ্বিতীয় বারের মত পুনরায় তাদের সেই দিনের সেই ভয়ানক দৃশ্যের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, শিংগায় ফুঁক দেয়ামাত্রই দেখা যাবে পাহাড় পর্বতগুলো স্থানচ্যুত হয়ে চলতে শুরু করেছে এবং সবকিছু মেঘমালার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এমনই কঠিন সময়ে তাদের নিরাপদে অবস্থানকারী ও এহসানকারী আর একটি দলকে সামনে আনা হবে, আর এদের পাশাপাশি থাকবে অন্যায়কারীদের আর একটি দল, যাদের চেহারাগুলো আগুনের মধ্যে ঝলসে দেয়া হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের ওপর কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় এসে যাবে, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের জন্যে পৃথিবী থেকে এমন একটি জন্তু বের করবো যে ওদের সাথে কথা বলবে, বলবে, হে মানুষ, আমরা (আল্লাহর ক্ষমতার) নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করতাম না।' (আয়াত ৮২)

'যেদিন আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেসব লোকের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু জনসমষ্টিকে আলাদা আলাদা আলাদা করে একত্রিত করবো, যারা আমার আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করতো। অতপর......... , সেসব জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা যা কিছু করছিলে তা কোনো (নিশ্চিত) জ্ঞানের ভিত্তিতে তো করনি।' (আয়াত ৮৩-৮৫)

'ওরা কি দেখেনি যে আমি মহান আল্লাহ, বানিয়েছি রাত্রিকে যেন .... তোমাদেরকে তারই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা করেছ।' (আয়াত ৮৬-৯৩)

ওপরে বর্ণিত সে বিশেষ জন্তুটি সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বিশুদ্ধ হাদীস আছে, কিন্তু সে সহীহ হাদীসগুলোর মধ্যে উপরোল্লিখিত জন্তুর চেহারা ছবি কেমন হবে সে বিষয়ের কোনো বর্ণনা নেই। যেসব রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলোতে সে জন্তুর গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে আমরা এ গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। তবে সেসব বর্ণনার মধ্যে যে কথাগুলো পাওয়া যায় তা হচ্ছে, এ জন্তুটির দৈর্ঘ হবে ষাট হাত, তার শরীর থাকবে ঘন মোলায়েম পশমে ঢাকা, তার পাখনা ও ক্ষুর থাকবে, তার দাড়ি থাকবে, মাথা হবে ষাঁড়ের মাথার মতো, তার চোখ হবে শুয়োরের চোখের মতো, কান হবে হাতির কানের মতো, নর হরিণের শিংয়ের মতো হবে তার শিং। ঘাড় হবে উট পাখীর ঘাড়ের মতো, বুক হবে সিংহের বুকের মতো, রং হবে চিতা বাঘের রংয়ের মতো, পাছা হবে বিড়ালের পাছার মতো, লেজ হবে পুরুষ ভেড়ার লেজের মতো এবং ঠ্যাংগুলো হবে উটের ঠ্যাংয়ের মতো .... এভাবে শেষ পর্যন্ত আরও যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার বর্ণনা করতে গিয়ে তাফসীরকাররা বেশ মুশকিলে পড়ে গেছেন।

তবে কোরআন ও সহীহ হাদীসে প্রাপ্ত বর্ণনার ওপর তৃপ্ত থাকাই আমরা যথেষ্ট মনে করি, যা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের এতোটুকু জানায় যে, অকল্পনীয় এই জন্তুটি হবে কেয়ামতের লক্ষণাবলীর অন্যতম। যখন এ জন্তুর আবির্ভাব হবে তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তাওবা করলে কোনো ফায়দা হবে না। তখন যারা দুনিয়ায় থাকবে তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়াটা অবধারিত হয়ে যাবে, যেহেতু তখন কারও তাওবাই কবুল করা হবে না। তখন যারা যে যে আমল আখলাকের ওপর অবস্থান করবে সে অনুযায়ীই তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে।

.... এমনই কঠিন সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে এ অভূতপূর্ব জানোয়ারটি বের করবেন, যা তাদের সাথে কথা বলবে। বাস্তবে আমরা জানি, কোনো জন্তু জানোয়ারই কথা বলে না, বা মানুষ তাদের কথা বুঝে না, কিন্তু সেদিন মানুষ এ জানোয়ারটির কথা বুঝবে এবং জানতে পারবে যে, এটা এক অলৌকিক জীব, যা কেয়ামতের আলামত হিসেবেই পাঠানো হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে তখন মানুষ বুঝে যাবে যে, কেয়ামত অত্যন্ত কাছে এসে গেছে। বিশেষভাবে সেসব সীমালংঘনকারী-হঠকারী-নাফরমানদের জন্যেই এ চূড়ান্ত আলামত পাঠানো হবে যারা আল্লাহর আয়াতগুলো বিশ্বাস করে না এবং ওয়াদা করা কেয়ামতের আগমন সংবাদ প্রত্যাখ্যান করে।

সূরা নামলের মধ্যে যেসব বর্ণনা এসেছে তাতে আমরা অনেকগুলো দৃশ্য এক সাথে দেখতে পাই। সেখানকার বর্ণনায় অতি সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে সোলায়মান (আ.), কীট-পতংগ, পাখী ও জ্বিন জাতির কথা। অতপর এসেছে সে বিশেষ জন্তুর, বর্ণনা যার সাথে মানুষ কথা বলবে। এই অভিনব জীবের আগমন সংবাদ সূরার মধ্যে উল্লেখিত আরও বহু অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার সাথে

সামঞ্জস্যশীল। এ বর্ণনা আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আরো বহু বর্ণনার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেয়ামতের দিন সাধারণ যে দৃশ্যটি সামনে আসবে এবং তার মধ্যে যতো কিছু সংঘটিত হবে, সে সবের একটি সমন্বিত চিত্র এ সূরার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (১)

এ প্রসংগের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, কেয়ামতের যেসব আলামত এ সূরাটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে তা কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে বুঝানোর জন্যে যথেষ্ট।

দ্বীন প্রত্যাখ্যানকারীদের করুণ পরিণতি

'সেদিন, যেসব জনগোষ্ঠী আমার আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে আমি আলাদা করে নেবো। অতপর পৃথকভাবে তাদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।'

সকল মানুষকেই সেদিন হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে তাদের কথা, যারা নবী ও নবীর আনীত কেতাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। 'তাদের আলাদাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে', অর্থাৎ প্রথম সারিতে যারা থাকবে তাদের থেকে আলাদা করে তাদের টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এমন সব লোকদের সামনে, যারা কোনো অন্যায় কাজে কখনো অগ্রণী ভূমিকা নেয়নি। এই দাঁড়ানোর ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা, আকাংখা এখতিয়ার কোনো কিছুই খাটানোর কোনো উপায় থাকবে না।

'এমনকি যখন ওরা আসবে, বলবে, তোমরা কি আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলে। অথচ তোমাদের তো সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান ছিলো না? আর যদি এটা নাই করে থাকো, তাহলে বলো না, কি করছিলে তোমরা? .... '

আসলে এটা এমনই একটা প্রশ্ন হবে যে, সেদিন চুপ থাকা ও পেরেশান হওয়া ছাড়া যার কোনো জওয়াব সেদিন তাদের কাছে থাকবে না; যার কাছে প্রশ্ন করা হবে তার অবস্থাটা সেদিন এমনই দাঁড়াবে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং এ কষ্টের কথা অন্তরের মধ্যে চেপে রাখা ছাড়া তাদের কোনো উপায়ই থাকবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের যুলুমের কারণে তাদের ওপর আযাবের ওয়াদা সেদিন পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু তখন তারা কোনো কথাই বলতে পারবে না।'

অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব যুলুমে লিপ্ত ছিলো তারই কারণে তাদের ওপর আমার ফয়সালা কার্যকর হয়ে যাবে। তারা চরম অস্থিরতা অনুভব করতে থাকবে এবং তারা সবাই নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ইতিমধ্যেই সে অভিনব জন্তুটার আবির্ভাব হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে সে জন্তুটি কথা বলতে শুরু করবে। এ সময়ে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা তারা চোখে দেখতে পাবে। এ জন্যে তারা আর কোনো কথাই বলতে পারবে না। এই হচ্ছে আল কোরআনের চমৎকার ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন পদ্ধতি এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, যার বর্ণনা আল কোরআন আমাদের সামনে পেশ করেছে।

এ প্রসংগে যে পরিভ্রমণের কথা বলা হয়েছে তার সাথে সাথে পরবর্তীতে আর একটি বিশেষ অবস্থা আসবে বলে জানানো হয়েছে, আর তা হচ্ছে দুনিয়ার দৃশ্য ও আখেরাতের দৃশ্যের এক সন্ধিক্ষণ। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে গমনের দৃশ্য। রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখ দিয়ে যখন একথাগুলো বেরোচ্ছিলো, তখন চরম হঠকারীও স্থির থাকতে পারছিলো না, তারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলো।

---

(১) দেখুন, 'আত তাসওয়ীরুল ফাননি ফিল কোরআন' নামক গ্রন্থটির মধ্যে 'ফাসলুত্ তানাসুকুল ফান্নি' নামক অধ্যায়টি (পৃঃ ৮৬-১০৭) ৩য় সংস্করণ।

আল্লাহর নিদর্শন ও কেয়ামতের মহাপ্রলয়

হাশরের ময়দানে, আল্লাহর আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যানকারীরা কী ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে, এখানে তার দৃশ্য তুলে ধরার পর দৃষ্টি পুনরায় দুনিয়ার দৃশ্যাবলীর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। এসব দৃশ্য মানুষের মধ্যে গভীর আবেগ সৃষ্টি করার জন্যে যথেষ্ট, যে আবেগ তাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান নিয়ম শৃংখলা সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়, আহ্বান জানায় তাদের সেসব জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে, যা সাধারণভাবে তাদের নযরের সামনে ভাসছে এবং বিশ্বের সবকিছু তাদের অন্তরে এ কথা জাগায় যে, এ সবের মূলে অবশ্যই আছেন এমন এক ক্ষমতাধর সত্ত্বা, যাকে নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই।

তিনিই সবার এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী এবং একমাত্র তিনিই সবাইকে পরিচালনা করছেন, তাদের সবার জন্যে জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রী তিনিই যোগাড় করে দিচ্ছেন, তাদের জন্যে সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশের উপাদান সরবরাহ করা এসব একমাত্র তাঁরই দান। তিনিই সৃষ্টির সব কিছু তাদের জীবনের জন্যে উপযোগী বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সবের কোনোটাই তাদের ক্ষতির জন্যে নয়, নয় তাদের জীবন বিপন্ন করার জন্যে বা তাদের জীবনের সাথে সংঘর্ষশীল বানিয়ে এগুলো তাদের জীবনকে ব্যাহত করার জন্যে নয়, বা তাদের জীবন চিরস্থায়ী বানানোর জন্যেও নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি দেখছে না যে, আমি রাত্রিকে এমনভাবে বানিয়েছি যে, তার মধ্যে তারা শান্তি পায়, আর বানিয়েছি দিনকে দেখার জন্যে, অবশ্যই এসব কিছুর মধ্যে রয়েছে (রব্বুল আলামীনকে চেনার জন্যে) বহু নিদর্শন– সেই জাতির জন্যে যারা ঈমান রাখে।'

রাত্রির দৃশ্য হচ্ছে, তা আরাম ও শান্তি আনয়নকারী– ক্লান্তিহারক, দিনের অবস্থা হচ্ছে, তা প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান দৃশ্যসমূহ থেকে দেখার কাজে মানুষকে সাহায্য করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৃষ্ট এই দুটি প্রাকৃতিক অবস্থা মানুষের মধ্যে আপনা থেকেই এক আনুগত্যবোধ জাগায় এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে তার গভীর একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তাকে জানায় যে, তিনিই রাত ও দিনের আনাগোনা নিয়ন্ত্রণ করেন। রাত ও দিন, এ দুটি অবস্থার দিকে তাকিয়ে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তাহলে অবশ্যই এ অবস্থা তার অন্তরের মধ্যে ঈমানী যোগ্যতা পয়দা করবে, কিন্তু আফসোস, গভীর দৃষ্টিতে মানুষ এগুলোর দিকে তাকায় না বলেই তারা ঈমান আনে না, ঈমান আনতে সক্ষম হয় না।

রাত বলতে কোনো অবস্থা যদি না হতো তাহলে সারাক্ষণ দিনই থাকত এবং পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেতো। এমনি করে যদি সারাক্ষণ রাত হতো তাহলে জীবন অসম্ভব হয়ে যেতো, শুধু তাই নয়, যদি বর্তমানের তুলনায় রাত বা দিন, যে কোনোটাই দশ গুণ বেশী বা কম হতো তাহলে পৃথিবীর সব কিছু জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যেতো, অথবা সব গাছপালা জমে বরফ হয়ে যেতো এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে যেতো। এজন্যে এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই এবং এক বিশেষ পরিমাপমতো রাত ও দিনের আনোগোনা চালু রাখা হয়েছে, যাতে করে জীবনের প্রয়োজনে এসব অবস্থা মানুষের খেদমত করতে পারে, এই জন্যেই বলা হয়েছে, 'রাত্র-দিনের আনাগোনার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তবু ওরা ঈমান আনে না।'

পৃথিবীতে রাত ও দিন– এ দুটি নিদর্শন থেকে এবং সৃষ্টির বুকে বিরাজমান এই সূক্ষ্ম নিয়ম শৃংখলার মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত চিন্তাশীল লোকরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার নিদর্শন দেখতে থাকবে, তারা এসব থেকে শিক্ষা নেবে যারা অন্তরের চোখ দিয়ে সেই দৃশ্যের দিকে তাকাবে, শিংগায় ফুঁক দেয়ার দিনে সেই ভয়ানক অবস্থার দিকে দেখবে, যা সারা আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং সকল সৃষ্টির ওপর নেমে আসবে, তবে এই কঠিন অবস্থা থেকে তারাই রেহাই পাবে যাদের আল্লাহ

তায়ালা বাঁচাতে চাইবেন। যে পর্বতমালা সারা পৃথিবীকে মযবুত করে রেখেছে, যাদের তিন ভাগের এক ভাগ উপরে এবং বাকি তিন ভাগের দুই ভাগ মাটির নীচে থাকার কারণে সেগুলো খুঁটা বা 'আওতাদ' হিসেবে কাজ করছে। যেগুলো দৃঢ়তা দান করার প্রতীক হিসাবে কাজ করে চলছে সেসবই সমূলে উপড়ে গিয়ে সঞ্চালিত হতে থাকবে এবং শেষে সেই ভয়াবহ দিন আসবে যেদিন সত্য ও সৎ পথ অবলম্বীদের পুরস্কার হিসেবে নিরাপত্তা ও কল্যাণ এবং হঠকারী ও অন্যায়কারীদের জন্যে চরম আতংক নেমে আসবে, পরিশেষে আসবে দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চরম শাস্তি। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে .... তোমাদের তারই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা (পৃথিবীর জীবনে) করে এসেছো।' (আয়াত ৮৭-৯৩)

উল্লেখিত এই শিংগা হচ্ছে এক ভয়ংকর বাঁশি, যার প্রলয়ংকর আওয়ায হবে এমন ভয়ানক যা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের গ্রাস করে ফেলবে। এ কঠিন অবস্থা থেকে তারাই শুধু বাঁচতে পারবে এবং তারাই নিরাপদ থাকবে যাদের প্রতি মহান আল্লাহর মেহেরবানীর দৃষ্টি থাকবে। .... বলা হয়েছে, যারা নিজেদের আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই শাহাদাত বরণ করেছেন, সেই শহীদরা সে ভয়ানক অবস্থা থেকে নাজাত লাভ করবেন। ..... সে অবস্থায় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে, একমাত্র তারা ছাড়া যাদের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বাঁচিয়ে নেবেন।

এরপর আসবে পুনরুত্থান দিবসের শিংগার ফুৎকার। তারপর আসবে আর একটি শিংগা ফুৎকার। এর ফলে সবাই এক বিশাল প্রান্তরে সমবেত হবে। এরশাদ হয়েছে, 'সমবেতভাবে ওরা এগিয়ে আসবে তার কাছে অবনত মস্তকে ও হীনতার সাথে, সেদিন তারা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাবে।'

এই ভয়-ভীতির সাথেই সেই প্রলয়ংকরী মহা উলট পালট সংঘটিত হবে, যা গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। বিশ্বের চারদিকে আবর্তনরত সকল ব্যবস্থা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। এই বিপ্লব শুরু হলে আকাশচুম্বী পর্বতগুলো চলতে শুরু করবে এবং এতো হালকা ও দ্রুততা থাকবে এর মধ্যে, যেন এগুলো সব ভাসমান মেঘমালা। আর পর্বতসমূহের এই চলতে থাকার দৃশ্য হবে এক প্রচন্ড ভীতিজনক দৃশ্য। যা দেখা তো দূরে থাক, এর বিবরণ শুনলেও মানুষের অন্তর কাঁপতে থাকে। তখন মনে হয়, যতো প্রকার ভয়ের জিনিস থাকতে পারে এ ভয়ংকর দৃশ্য সব কিছুর উর্ধ্বে। এ ভয় যখন মনের ওপর চেপে বসে তখন মানুষ সকল শক্তি হারিয়ে ফেলে, পেরেশানীতে হুঁশ হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়, এমনভাবে এ ভয় গোটা দেহ মনের ওপর জেঁকে বসে যে, তা আর নামতে চায় না, এমন এক অস্থিরতা এসে যায় যে, মানুষ সকল স্বস্তি হারিয়ে ফেলে। এরশাদ হচ্ছে,

'এসব আল্লাহরই কীর্তি, তিনি সব কিছুকে মযবুত বানিয়েছেন।'

মহান আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। এই অস্তিত্বের সব কিছুর মধ্যে তাঁর নিপুণ কর্ম-কুশলতা প্রকাশ পায়। তিনি যা কিছু করতে চান তা যে কোনো সময়ে করতে পারেন। তাঁর কোনো ব্যর্থতা নেই বা তাঁর কাজ বাধাগ্রস্ত করারও কেউ নেই। তাঁর কীর্তিসমূহের মধ্যে কোনো কমতি কিংবা কোনো ত্রুটি নেই, কোনো গরমিল বা কোনো ভ্রান্তি নেই। তাঁর বিস্ময়কর সকল কীর্তির মধ্যে সুচিন্তিত এক পরিকল্পনা দেখা যায়। এমন নয় যে, যে কোনো একটি উপাদান দ্বারা তিনি এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, যার সাথে অন্য কোনো জিনিসের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং ছোট-বড়, গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ সব কিছুই তিনি পয়দা করেছেন এবং পরিকল্পনার অধীন এক নির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী। প্রতিটি জিনিসই এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, সুনির্দিষ্ট

এক বিধানমতে সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সংযোগ রয়েছে। একটি আর একটির সম্পূরক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।(১)

অবশ্যই তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে খবর রাখেন। রব্বুল আলামীনের কাছে যখন মানুষ সেই হিসাব দিবসে পৌঁছবে, সেদিন তিনি তাদের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি যে পূর্ণতা দান করেছেন, অবশ্য তা এক বিশেষ পরিমাপমতোই দিয়েছেন। সবাই সেই ওয়াদা করা নির্দিষ্ট দিনে হাযির হবে– এক মুহূর্ত আগেও নয় এক মুহূর্ত পরেও নয়। সেদিন তারা সবাই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির জন্যে যে চিরস্থায়ী বিধান পাঠিয়েছেন। সেই অনুসারে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাওনা বুঝে পাবে। এভাবে উভয় জীবন– ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর সৃষ্টি, যার দ্বারা সকল জিনিসকে তিনি পূর্ণত্ব দান করেছেন .... অবশ্যই খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করছো।'

এই কঠিন ও ভয়াবহ দিনে (কাফেরদের জন্যে যেমন নানাপ্রকার শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে, তেমনি) মোমেনদের জন্যেও নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা থাকবে। তারা সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে। তারা দুনিয়ার জীবনে যেসব ভালো কাজ করেছে এবং মানুষের সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছে, তারই প্রতিদানস্বরূপ তারা এই বাড়তি পুরস্কার পাবে। অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার হিসেবে যা পাওয়ার তা তো পাবেই, মান সম্ভ্রম, নিরাপত্তাবোধ ও নিশ্চিন্ততা হবে তাদের অতিরিক্ত পুরস্কার এবং এটা এতোবেশী তারা পাবে, যা হবে তাদের পাওনার চাইতেও অনেক বেশী। এরশাদ হচ্ছে,

'যে কোনো নেক কাজ নিয়ে আসবে, তাকে তার উচিত প্রতিদান থেকেও উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে, তারা সেদিনকার কঠিন ভয় থেকে নিরাপদ থাকবে।'

প্রকৃতপক্ষে সে দিনের প্রচন্ড ভয় থেকে নিরাপদ থাকাটাই হবে বড় প্রতিদান, এরপর অন্য যা কিছু দেয়া হবে তা হবে আল্লাহর অতিরিক্ত মেহেরবানী এবং এহসান। তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে সর্বদা ভয় করে চলেছে; সুতরাং দুনিয়ার ভয় এবং আখেরাতের আতংক আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে একত্রিত করবেন না; বরং তিনি আসমান যমীনের যাবতীয় আতংক থেকে ওদের নিরাপদ রাখবেন। পরবর্তীতে এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা সেদিন আসবে মন্দ কাজ নিয়ে, তাদেরকে তাদের মুখের ওপর উপুড় করে দোযখের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে।'

এ হবে এক ভয়ানক দৃশ্য, তাদের মুখের ওপর তাদেরকে (ধাক্কা মেরে) জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। এরপর তাদের ওপর ধ্বংসকর আযাব এবং তিরস্কার বাড়তেই থাকবে। বলা হবে,

'তোমাদের সেই কাজেরই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে, যা কিছু তোমরা দুনিয়ায় করে এসেছো।'

দুনিয়ার জীবনে সঠিক পথকে তারা লাঞ্ছিত করেছিলো, এজন্যেই আগুনের মধ্যে ফেলে তাদের ঝলসে দেয়া হবে এবং দোযখের সেই কঠিন আগুনে মুখের ওপর উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। দুনিয়াতে ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট সত্য থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, অথচ এ মহা সত্য তাদের কাছে দিন ও রাতের মতোই পরিষ্কার ছিলো।

আল্লাহর সার্বভৌমত্বই ইসলামের মূল চেতনা

পরিশেষে আসছে আখেরাতে যা ঘটবে সে অবস্থাসমূহের বিবরণ। যেসব দৃশ্যের বর্ণনা দান করে রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর দাওয়াত এবং তাঁর মিশনের নির্যাস তুলে ধরছেন, তাদের সেই গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন যার বর্ণনা দ্বারা তাদের মন-মগয ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা

(১) সূরায়ে ফোরকান এর আয়াত 'ওয়া খালাক্বা কুল্লা শাইইন ফাক্বদ্দারাহু তাক্বদীরা'–র তাফসীরে দেখুন।

বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা ঘোষণা দ্বারা এ অধ্যায়টির সমাপ্তি টানা হচ্ছে। এই অধ্যায় শুরুও করা হয়েছিলো তাঁর প্রশংসা দ্বারা, পুনরায় তাদের সামনে তাঁর নিদর্শনসমূহ তুলে ধরে তাদের চূড়ান্তভাবে সেসব কাজের হিসবে নেয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এবাদাত করি এই শহরের রবের, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, তিনিই সব কিছুর মালিক.................. তোমার রব গাফেল নন সেসব জিনিস থেকে, যা তোমরা করে চলেছো।' (আয়াত ৯১-৯৩)

মক্কাবাসীরা এই সম্মানিত শহর ও মর্যাদাপূর্ণ ঘরের দোহাই দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতো। এ ঘরের সম্মানের সাথে তারা জড়িত, একথা বলে তারা গোটা আরবের বুকে নিজেদের প্রাধান্য কায়েম করে রেখেছিলো। এই ঘরের কারণেই তাদের ধারণা ছিলো যে, তারা সমগ্র আরবের নেতা। এর পরেও তারা মহান আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানা কায়েম করতে প্রস্তুত ছিলো না। যিনি এই পবিত্র ঘরকে মর্যাদাবান বানিয়েছেন এবং তাদের জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সবই এই ঘরের ওসীলাতেই পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন।

রসূলুল্লাহ (স.) যথাযথভাবেই আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চালু করার কাজ করে চলেছেন। এ জন্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছেন, তাঁকে এই ঘরের রবেরই বন্দেগী (পূর্ণাংগ ও নিরংকুশ আনুগত্য) করতে হুকুম দেয়া হয়েছে, যাকে তিনি মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছেন তার কোনো শরীক নেই। পূর্ণাংগ ইসলামী চিন্তা চেতনা এই কথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে যে, সমগ্র বিশ্বের সর্বময় কর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, আর এই শহরের যিনি রব, তিনি প্রতিপালক ও মালিক, সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর 'মালিকানা একমাত্র তাঁর।' এরপর রসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করছেন যে, তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যেন তিনি পরিপূর্ণভাবে যারা আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। মুসলমানদের যা কিছু আছে সেসব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা একথা তারা যেন সর্বান্তকরণে স্বীকার করে। এই মালিকানায় অন্য কেউ সামান্যতম অংশীদার, এ কথা কোনোভাবেই যেন তারা না মানে বা চিন্তা না করে। তারা সেসব জনপদের মানুষ বলে বিবেচিত যারা সর্বযুগে একমাত্র আল্লাহর কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করেছে।

এটাই হচ্ছে তাঁর দাওয়াতের মূল কথা, এটাই মুসলমানদের পরিচালিকা শক্তি। আর এই দাওয়াতের ওসীলাই হচ্ছে আল কোরআনের তেলাওয়াত, এটাই হচ্ছে তার মূল প্রাণশক্তি। তাই রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে বলা হচ্ছে,

'(আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে) আমি যেন আল কোরআন তেলাওয়াত করি।'

সুতরাং এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো যে, কোরআন এই দাওয়াতেরই কেতাব, দাওয়াতের বিধান, তাকে এ কোরআন দিয়েই কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বলা হয়েছে। একমাত্র এরই মধ্যে রয়েছে অন্তরাত্মা ও বুদ্ধি-বিবেকের সাথে জেহাদের সকল মাল মসলা, এরই মধ্যে রয়েছে মানুষকে সকল দিক দিয়ে গড়ে তোলার জন্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা। জ্ঞানভান্ডার ও চেতনাসমূহের গতিপথও রয়েছে এখানে।

এ পাক কালামের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অনুসন্ধানী অন্তরসমূহকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করে এবং এমন চিন্তার সৃষ্টি করে যে, তারা স্থির থাকতে পারে না। এরপর যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র এই জন্যে যে, তারা যেন সকল প্রকার বিপদ-আপদে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ও সত্য বিরোধীদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে, এ মহান কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার আযাদী লাভ করতে পারে এবং তারা যেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারী ক্ষমতা লাভ করে আল্লাহর যমীনে তাঁর আইন-কানুন চালু করতে পারে। আসলে ইসলামের দাওয়াত দান

করার জন্যে দাওয়াতের এ মহান কেতাবই যথেষ্ট .... 'আর আমি যেন কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি।'

'অতএব, যে হেদায়াত কবুল করবে সে তার নিজের স্বার্থেই হেদায়াত কবুল করবে, যে ব্যক্তি ভুল পথ ধরবে তুমি তাকে বলে দাও, অবশ্যই আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।'

ওপরের আয়াতটিতে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহর বিচারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বক্তিগতভাবে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে হোক বা ভুল পথের পথিক হওয়ার কারণে হোক। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মের জন্যে দায়ী হবে বলার কারণে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের সম্মানই বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা কারও জন্যে অন্য কাউকে পুরোপুরিভাবে দায়ী করা হবে না– এটাই ইসলামের বিধান। এ জন্যে বিরাট বিরাট দলকে কখনও এক সাথে হুকুম দিয়ে ঈমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়নি। এ দাওয়াতদান শুরু হয়েছিলো কোরআনের তেলাওয়াত দ্বারা, যারা ঈমান আনতে থাকলো তাদের স্বেচ্ছায় ঈমানের দাবী অনুসারে কাজ করার জন্যে ছেড়ে দেয়া হলো। এটা ছিলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য, তার আবেদনের সূক্ষ্ম ও গভীর গ্রহণযোগ্যতা, তার মায়াভরা আকর্ষণ, যা মানব প্রকৃতিকে মহব্বতের সাথে কাছে টেনে নেয়। তার সম্মোহনী শক্তি মানুষের অন্তরের মধ্যে যে আবেদন সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে, 'এ ব্যবস্থা তো আমাদের জন্যে সার্বিক কল্যাণের সুধা বয়ে এনেছে, আমরা কেন এর থেকে দূরে থাকবো!' আর মহাগ্রন্থ আল কোরআন এ অমীয় সুধার বার্তা বয়ে এনেছে। তাই আল কোরআনের শিক্ষা হচ্ছে,

'আর বলো, আলহামদু লিল্লাহ (যাবতীয় কৃতিত্ব ও প্রশংসা আল্লাহর)। বিশ্ব প্রভুর কাছে আবেদন পেশ করার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করার এ শিক্ষা আল কোরআনের এক অনবদ্য পদ্ধতি। এরপর বলা হচ্ছে,

'শীঘ্রই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা বুঝতে পারবে (কি মহা নেয়ামত) তোমাদের জন্যে এ কেতাব বয়ে এনেছে।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেন, অতপর মানুষ যখন সত্যসন্ধিৎসু মন নিয়ে এবং অন্তরের চোখ দিয়ে তাকায়, তখন সে নিজের মধ্যে এবং তার সামনে মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রতিদিনই আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার কোনো না কোনো নিদর্শন দেখতে পায়। তখনই তার সামনে রহস্যভরা এ মহা সৃষ্টির তথ্যসমূহ ভেসে ওঠে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যা তোমরা করে চলেছো তোমার রব সে ব্যাপারে গাফেল নন।'

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই শেষ ও চূড়ান্ত কথাটা তার মনের মধ্যে জাগিয়ে দিচ্ছেন, সেই সূক্ষ্ম কথাটি জাগিয়ে দিচ্ছেন এই চমৎকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে, যা প্রথমেই মানুষের মনে ভয়ের অনুভূতি পয়দা করে, তারপর যে কাজ করা প্রয়োজন সে তা করতে শুরু করে দেয়। তখন তার অন্তরের এ কথাটা সদা জাগরূক হয়ে যায় এবং গভীরভাবে একথাটা রেখাপাত করতে থাকে যে, 'তোমার রব মোটেই গাফেল নন সেসব বিষয়ে যা তোমরা করছো।'

সূরা আল কাছাছ

আয়াত ৮৮ রুকু ৯

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

طٰسٓمّٓ ﴿١﴾ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ﴿٢﴾ نَتۡلُوۡا عَلَيۡكَ مِنۡ نَّبَاِ مُوۡسٰى

وَفِرۡعَوۡنَ بِالۡحَقِّ لِقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِى الۡاَرۡضِ وَجَعَلَ

اَهۡلَهَا شِيَعًا يَّسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةً مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ اَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡىٖ

نِسَآءَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيۡدُ اَنۡ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيۡنَ

اسۡتُضۡعِفُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ اَٮِٕمَّةً وَّنَجۡعَلَهُمُ الۡوٰرِثِيۡنَ ۙ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ

لَهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ وَنُرِىَ فِرۡعَوۡنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوۡدَهُمَا مِنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا

يَحۡذَرُوۡنَ ﴿٦﴾ وَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰٓى اُمِّ مُوۡسٰٓى اَنۡ اَرۡضِعِيۡهِ ۚ فَاِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. ত্বা-সীম-মীম। ২. এ হচ্ছে সুস্পষ্ট কেতাবের আয়াত। ৩. (হে নবী, এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে) আমি তোমাকে মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা ঠিক ঠিক করে বলে দিতে চাই, (এটা) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে। ৪. (ঘটনাটা ছিলো এই,) ফেরাউন (আল্লাহর) যমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো, সে তার (দেশের) অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো, সে তাদের একটি দলকে হীনবল করে রেখেছিলো, সে তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রেখে দিতো; অবশ্যই সে ছিলো (যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের একজন। ৫. (ফেরাউনের এসব নিপীড়নের মোকাবেলায়) আমি সে যমীনে যাদের হীনবল করে রাখা হয়েছিল তাদের ওপর (কিছুটা) অনুগ্রহ করতে এবং আমি তাদের (ফেরাউনের সেবাদাস থেকে উঠিয়ে দেশের) নেতা বানিয়ে দিতে এবং তাদেরকে (এ যমীনের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়ার এরাদা করলাম; ৬. আমি (ইচ্ছা করলাম) সে দেশে তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউন, হামান ও তার লয় লশকরদের সে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেবো, যে ব্যাপারে তারা আশংকা করতো। ৭. (এমনি এক সময় মূসার জন্ম হলো, যখন) আমি মূসার মায়ের কাছে এ আদেশ পাঠালাম, তুমি তাকে বুকের দুধ খাওয়াও, যদি কখনো তার (নিরাপত্তার) ব্যাপারে তোমার ভয় হয় তাহলে (বাক্সে

فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي

بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ

قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ

الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ

وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ

ভরে) তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো, কোনো রকম ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, অবশ্যই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো, আমি তাকে রসূলদের মধ্যে শামিল করবো। ৮. (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী মূসার মা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিলো,) অতপর ফেরাউনের লোকজন তাকে (সমুদ্র থেকে) উঠিয়ে নিলো, যেন সে তাদের জন্যে দুশমনী ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়তে পারে; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো ভয়ানক অপরাধী। ৯. ফেরাউনের স্ত্রী (এ শিশুটিকে দেখে তার স্বামীকে) বললো, এ শিশুটি আমার এবং তোমার জন্যে চক্ষু শীতলকারী (হবে), একে হত্যা করো না, হয়তো একদিন এ আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও (তো) গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তারা (তখন আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই) বুঝতে পারেনি। ১০. (ওদিকে) মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিলো, (আমার প্রতি) আস্থাশীল থাকার জন্যে যদি আমি তার মনকে দৃঢ় না করে দিতাম, তাহলে সে তো (দুশমনদের কাছে) তার খবর প্রকাশ করেই দিচ্ছিলো! ১১. সে মূসার বোনকে বললো, তুমি (সাগরের পাড় ধরে) এর পেছনে পেছনে যাও, (কথানুযায়ী) সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো যে, ফেরাউনের লোকেরা টেরও করতে পারলো না। ১২. (ওদিকে) আগে থেকেই আমি তার ওপর (ধাত্রীদের) স্তনের দুধ খাওয়ানো নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম, (এ অবস্থা দেখে) সে (বোনটি) বললো, আমি কি তোমাদের এমন একটি পরিবারের নাম (ঠিকানা) বলে দেবো, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন পালন করবে, সাথে সাথে তারা এর শুভানুধ্যায়ীও হবে। ১৩. আমি তাকে (আবার) তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে (নিজের সন্তানকে দেখে) তার চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সে কোনো রকম দুঃখ না পায়, সে

أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗ
وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ، وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ
الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ز هٰذَا
مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ
مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ز قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ، إِنَّهٗ
عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ،
إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا
لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ، قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ

(একথাটাও ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যদিও অধিকাংশ লোক এটা জানে না।

রুকু ২

১৪. যখন সে (পূর্ণ) যৌবনে উপনীত হলো এবং (শারীরিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, (তখন আমি তাকে) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলাম; আমি নেককার লোকদের এভাবেই প্রতিফল দান করি। ১৫. (একদিন) সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন (সেখানে) নগরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় (আরাম কর) ছিলো, অতপর সে সেখানে দু'জন মানুষকে মারামারি করতে দেখলো, এদের একজন ছিলো তার নিজ জাতি (বনী ইসরাঈলের) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো তার শত্রু দলের (লোক), যে ব্যক্তি ছিলো তার দলের, সে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির মোকাবেলায় তার সাহায্য চাইলো, যে ছিলো তার শত্রু দলের, তখন মূসা তাকে একটি ঘুষি মারলো, এভাবে সে তাকে হত্যাই করে ফেললো, (সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে) সে বললো, এ তো একটা শয়তানী কাজ; অবশ্যই সে (হচ্ছে মানুষের) দুশমন এবং প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী। ১৬. সে (আরো) বললো, হে আমার মালিক, (অনিচ্ছাকৃত এ কাজ করে) আমি তো আমার নিজের ওপর (বড়ো) যুলুম করে ফেলেছি (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১৭. সে (আরো) বললো, হে আমার মালিক, তুমি যেভাবে আমার ওপর মেহেরবানী করেছো, (সে অনুযায়ী) আমিও (তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,) আমি আর কখনো কোনো অপরাধী ব্যক্তির জন্যে সাহায্যকারী হবো না। ১৮. অতপর ভীত শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তার ভোর হলো, হঠাৎ সে দেখতে পেলো, আগের দিন যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, সে (আবার) তাকে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে; মূসা (এবার) তাকে বললো, তুমি তো দেখছি ভারী ভেজালে লোক! ১৯. (তারপরও) যখন সে

أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوسٰىٓ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوسٰىٓ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيٓ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ز وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ــ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ إِلَى

(ও ফরিয়াদী ব্যক্তিটি) তাদের উভয়ের শত্রুর ওপর হাত উঠাতে চাইলো (তখন এ ফরিয়াদী ব্যক্তিটি মনে করলো, মূসা বুঝি তাকে মেরেই ফেলবে), তাই সে বললো, তুমি কি আজ আমাকে সেভাবেই হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, তুমি তো যমীনে দারুণ স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছো, তুমি কি মোটেই শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না! ২০. (এর কিছুক্ষণ পরই) এক ব্যক্তি নগরীর (আরেক) প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে বললো, হে মূসা (আমি এমাত্র শুনে এলাম), ফেরাউনের দরবারীরা তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ করছে, অতএব তুমি এক্ষুণি (শহর থেকে) বের হয়ে যাও, আমি হচ্ছি তোমার একজন শুভাকাংখী (বন্ধু)! ২১. অতপর সে ভীত আতংকিত অবস্থায় নগরী থেকে বের হয়ে গেলো এবং (যেতে যেতে) বললো, হে মালিক, তুমি আমাকে যালেম জাতি (-র হাত) থেকে রক্ষা করো।

রুকু ৩

২২. (মিসর ছেড়ে) যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আমি আশা করি আমার মালিক আমাকে সঠিক পথই দেখাবেন। ২৩. অবশেষে যখন সে মাদইয়ানের (একটি) পানির (কূপের) কাছে পৌছলো, তখন দেখলো তার পাশে অনেক মানুষ, তারা (পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে সে দু'জন রমণীকে (দেখতে) পেলো, যারা (নিজ নিজ পশুদের) আগলে রাখছে, সে (তাদের) জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কি হলো (তোমরা পশুদের পানি খাওয়াচ্ছো না)? তারা বললো, আমরা (পশুদের) পানি খাওয়াতে পারবো না, যতোক্ষণ না এ রাখালরা (তাদের পশুদের) সরিয়ে না নিয়ে যায় এবং আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ বলে আমরা পশুদের পানি খাওয়াতে নিয়ে এসেছি)। ২৪. (একথা শোনার পর) সে এদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিলো, তারপর (সরে)

الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ

اِحْدٰهُمَا تَمْشِیْ عَلَی اسْتِحْیَآءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْكَ لِیَجْزِیَكَ اَجْرَ

مَا سَقَیْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ قف

نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰهُمَا یٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اِنَّ خَیْرَ

مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَی

ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ عَلٰۤی اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ج فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِنْدِكَ ج وَمَآ اُرِیْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَیْكَ ط سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿٢٧﴾

قَالَ ذٰلِكَ بَیْنِیْ وَبَیْنَكَ ط اَیَّمَا الْاَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ ط

একটি (গাছের) ছায়ার দিকে গেলো এবং (আল্লাহকে) বললো, হে আমার মালিক, (এ মুহূর্তে) তুমি (নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে) যে নেয়ামতই আমার ওপর নাযিল করবে, আমি একান্তভাবে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো। ২৫. (আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত আসতে দেরী হলো না, মূসা দেখতে পেলো) সে দুই রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে তার কাছে ডেকেছেন, তুমি যে আমাদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিয়েছিলে তার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চান; অতপর সে তার কথামতো তার (পিতার) কাছে এলো এবং (নিজের) কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলো, (সব শুনে) সে (মূসাকে) বললো, তুমি কোনো ভয় করো না। (এখন) তুমি যালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছো। ২৬. সে দু'জন (রমণীর) একজন তার (পিতাকে) বললো, হে (আমার) পিতা, একে বরং তুমি (তোমার) কাজে নিয়োগ করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে (ব্যক্তিই) উত্তম (বলে প্রমাণিত) হবে, যে হবে (শারীরিক দিক থেকে) শক্তিশালী এবং (চরিত্রের দিক থেকে) বিশ্বস্ত। ২৭. (এরপর রমণীদের) পিতা (তাকে) বললো, আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, (তবে তা হবে) এ কথার ওপর, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি (আট বছরের জায়গায়) দশ বছর পুরো করতে চাও, তবে তা হবে একান্ত তোমার ব্যাপার, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট (-কর শর্ত) আরোপ করতে চাই না; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে। ২৮. সে (এতেই রাযি হলো এবং) বললো (ঠিক আছে), আমার এবং আপনার মাঝে এ চুক্তিই (পাকা হয়ে) থাকলো; আপনার দেয়া দু'টো মেয়াদের যে কোনো একটি যদি আমি পূরণ করি, তাহলে (আপনার পক্ষ থেকে) আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করা হবে না (এ

وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ
اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا
لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ
اَتٰهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا
تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ
اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ
سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ

নিশ্চয়তাটুকু আমি চাই); আমাদের এ কথার ওপর আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী (হয়ে থাকলেন)।

রুকু ৪

২৯. অতপর মূসা যখন (তার চুক্তিবদ্ধ) মেয়াদ পূর্ণ করে নিলো, তখন সপরিবারে (নিজ দেশের দিকে) রওনা করলো, যখন সে তূর পাহাড়ের পাশে আগুন দেখতে পেলো, তখন সে তার পরিবারের লোকদের বললো, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে (রাস্তাঘাট সম্পর্কিত) কোনো খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারবো, আর তা না হলে (কমপক্ষে) জ্বলন্ত আগুনের কিছু টুকরো তো নিয়ে আসতেই পারবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে। ৩০. যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছালো, তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিস্থিত একটি গাছ থেকে (গায়বী) আওয়ায এলো, হে মূসা, আমিই আল্লাহ– সৃষ্টিকুলের একমাত্র মালিক, ৩১. (তাকে আরো বলা হলো,) তুমি তোমার হাতের লাঠিটি যমীনে নিক্ষেপ করো; যখন সে তাকে দেখলো, তা (জীবন্ত) সাপের মতোই ছুটাছুটি করছে, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগলো, পেছনের দিকে তাকিয়েও দেখলো না; (তার প্রতি তখন আদেশ করা হলো,) হে মূসা, তুমি এগিয়ে এসো, ভয় পেয়ো না। তুমি হচ্ছো নিরাপদ মানুষদেরই একজন। ৩২. তুমি তোমার হাত তোমার (বুক) পকেটের ভেতরে রাখো (দেখবে), কোনো রকম অসুস্থতা ছাড়াই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসছে, (মন থেকে) ভয় (দূরীভূত) করার জন্যে তোমার হাতের বাজু তোমার (বুকের) সাথে মিলিয়ে রাখো, এ হচ্ছে ফেরাউন ও তার দলীয় প্রধানদের কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) দুটো প্রমাণ; সত্যিই তারা এক গুনাহগার জাতি। ৩৩. সে বললো, হে আমার মালিক, আমি (নিতান্ত ভুলবশত)

مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾ وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا

فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْۤ ز اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ

عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَا ۚ

اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا

مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ

مُوْسٰى رَبِّيْۤ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ

اِلٰهٍ غَيْرِيْ ج فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ

اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى لا وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ

তাদের একজন মানুষকে হত্যা করেছি, তাই আমার ভয় হচ্ছে তারা (সে হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে) আমাকে মেরে ফেলবে! ৩৪. আমার ভাই হারুন, সে আমার চাইতে ভালো করে কথা বলতে পারে, অতএব তুমি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, যাতে করে সে আমাকে সমর্থন করতে পারে, আমার ভয় হচ্ছে, (আমি একা গেলে) তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ৩৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (তুমি চিন্তা করো না), আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্তিশালী করবো এবং আমার আয়াতসমূহ দিয়ে আমি তোমাদের (এমন) শক্তি যোগাবো যে, অতপর তারা (আর) কখনো তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না, (পরিশেষে) তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই তাদের ওপর বিজয়ী হবে। ৩৬. অতপর যখন মূসা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নিয়ে ওদের কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, এ তো কতিপয় অলীক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা আমাদের বাবা-দাদাদের যমানায়ও তো এমন কিছু (ঘটতে) শুনিনি! ৩৭. মূসা বললো, আমার মালিক ভালো করেই জানেন কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং (সেদিনের মতো আজ) কার পরিণাম কি হবে? (তবে একথা ঠিক,) যালেমরা কখনোই সফল হয় না। ৩৮. ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদরা, আমি তো জানি না, আমি ছাড়া তোমাদের আরও কোনো মাবুদ আছে (অতপর সে হামানকে বললো), হে হামান (যাও), আমার জন্যে (ইট তৈরীর জন্যে) মাটি আগুনে পোড়াও, অতপর (তা দিয়ে) আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি (তাতে ওঠে) মূসার মাবুদকে দেখে নিতে পারি, আমি অবশ্য তাকে মিথ্যাই মনে করি! ৩৯. সে এবং তার বাহিনীর

وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ

لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

লোকেরা অন্যায়ভাবেই (আল্লাহর) যমীনে অহংকার করলো, ওরা ধরে নিয়েছিলো, ওদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না! ৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার গোটা বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, অতএব (হে নবী), তুমি দেখো, (বিদ্রোহ করলে) যালেমদের পরিণাম কি ভয়াবহ হয়ে থাকে! ৪১. আমি ওদের এমন সব লোকদের নেতা বানিয়েছি যারা (জাহান্নামের) আগুনের দিকেই ডাকবে, (এ কারণেই) কেয়ামতের দিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে না।

রুকু ৫

৪২. দুনিয়ায় (যেমন) আমি তাদের পেছনে আমার লানত লাগিয়ে রেখেছি, (তেমনি) কেয়ামতের দিনও তারা নিতান্ত ঘৃণিত লোকদের মধ্যে শামিল হবে। ৪৩. অতীতের বহু মানবগোষ্ঠীকে আমার সাথে বিদ্রোহের আচরণের জন্যে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে (তাওরাত) কেতাব দান করেছি, এ কেতাব ছিলো মানুষদের জন্যে জ্ঞান ও তত্ত্বকথার সমাহার, (সর্বোপরি) এ (কেতাব ছিলো) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে তারা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটি মক্কা মোয়াযযামায় অবতীর্ণ সমস্যা। এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত নগণ্য এবং নানা প্রকার দুর্বলতাও তাদের ঘিরে রেখেছিলো। অপরদিকে মোশরেকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তারা যেমন ছিলো শক্তিশালী, তেমনি আর্থিক দিক দিয়েও ছিলো খুবই সচ্ছল, মান-সম্মানও তাদের যথেষ্ট ছিলো এবং তারা ছিলো বহু ক্ষমতার অধিকারী। ঠিক এই সময়ে সূরাটি নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে তাদের শক্তি ও মূল্যবোধকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর এ আয়াতগুলো এই কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলো যে, এই সৃষ্টিজগতের সবখানে একটি শক্তিই কাজ করে যাচ্ছে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি; সমগ্র বিশ্বের একটি জিনিসেরই স্থায়ী মূল্য আছে, আর তা হচ্ছে 'ঈমান'। সুতরাং এটা মানতেই হবে, যাদের সাথে আল্লাহর শক্তি রয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই, যদিও শক্তি প্রকাশের যতো প্রকার মাধ্যম আছে বাস্তবে তখনো তার কোনোটাই তাদের হাতে আছে বলে দেখা যায় না; যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর শক্তি মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের

না আছে নিরাপত্তা, না আছে শান্তি, এমনকি তাদের অবস্থানকে সমর্থন দেয়ার মতো নানা প্রকার যুক্তি প্রমাণ হাযির করা সত্তেও তাদের মনের মধ্যে সদা সর্বদা প্রচন্ড এক দুর্বলতা বিরাজ করতে থাকে। যার কাছে ঈমানের সঠিক মূল্য আছে সে সবচেয়ে বেশী কল্যাণের অধিকারী, আর এই মূল্যবোধটা যে হারিয়ে ফেলে সে মূলত কোনো জায়গা থেকেই কোনো কল্যাণ পেতে পারে না।

সূরাটির শুরুতে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী পেশ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সূরাটির মূল বক্তব্য ফুটে ওঠেছে, ফুঠে ওঠেছে কারুন তার জাতির সাথে যে ব্যবহার করেছিলো তার মধ্য দিয়েও। অবশেষে মূসা (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে বহু শিক্ষামূলক কথাও এখানে এসেছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সূরাটি সর্বপ্রথম যে কাহিনী পেশ করেছে তা হচ্ছে মিসরের তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষের শক্তি প্রদর্শনের কথা। এ প্রসংগে অহংকারী, বিদ্রোহী ও অত্যাচারী ফেরাউনের শক্তি প্রদর্শন ও মানুষের মধ্যে তার পক্ষ থেকে প্রচন্ড আতংক সৃষ্টি করে রাখার কথা বলা হয়েছে, এর মোকাবেলায় বর্ণিত হয়েছে মূসা (আ.)-এর কথা, যিনি ছিলেন তারই ঘরে লালিত পালিত এক দুগ্ধপোষ্য শিশু (সম), তার না ছিলো কোনো শক্তি, না ছিলো কোনো আশ্রয়, আর না ছিলো তার জন্যে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা। অথচ ফেরাউন ছিলো তৎকালীন পৃথিবীতে সর্বাধিক ক্ষমতাধর বাদশাহ। সে তার প্রজাদের তার জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত বানিয়ে রেখেছিলো এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে সকল দিক থেকে দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও অবস্থায় ফেলে রেখেছিলো, তাদের ছেলেদের সে হত্যা করছিলো এবং মেয়েদের এই নিষ্ঠুর হত্যা থেকে রেহাই দিচ্ছিলো। এই ভাবে সে গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে তার কব্জার মধ্যে রেখে আতংকগ্রস্ত করে রেখেছিলো, কিন্তু যখন নবুওতের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মূসা (আ.) নির্ভীক চিত্তে এই অগ্নিগর্বী-বলদর্পী যালেম শাসকের দরবারে হাযির হলেন, তখন ফেরাউনের দর্প, শক্তি-সাহস, ঔদ্ধত্য ও আত্মসম্মানবোধ সবই এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো যে, বাস্তবে তার মনোবল, জনবল, শক্তি সরঞ্জাম সবই যেন ভোঁতা হয়ে গেলো।

কি মহা আশ্চর্যের ব্যাপার, নিজেকে যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান বলে দাবী করে এসেছে, যে নিজের শক্তি ক্ষমতা নিষ্কন্টক রাখার জন্যে এতো লোককে হত্যা করে এসেছে, আজ সে তারই ঘরে লালিত পালিত সে দিনকার এক শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন এক অজানা অদেখা ভয় তার হৃদয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। এমন এক আতংক তাকে পেয়ে বসেছে যে, মূসা (আ.)-এর ওপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা, তার সামনে থেকে যেন সরতে পারলেই সে বেঁচে যায়। কেন এমন হচ্ছে? কার ইচ্ছা এখানে কাজ করছে, মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে কার শক্তি-ক্ষমতার বহিপ্রকাশ ঘটছে? আসলে বাহ্যিক দিক দিয়ে মূসা (আ.) শক্তিহীন, সাথীহীন ও নিরস্ত্র হলেও তিনি যে অদেখা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রত্যক্ষ খবরদারিতে রয়েছেন, যাঁর শক্তির বেষ্টনী এমনভাবে তাকে ঘিরে রেখেছে যে তার দিকে রক্ত চক্ষু তুলে তাকায় এমন সাহস কারও নেই। বরং মূসা (আ.)-এর এক একটি কথা তার বুকের মধ্যে শেলের মতো বিঁধছে, প্রবল এক ভয় তার কলিজার মধ্যে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, সে কি করবে আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। দিশেহারা হয়ে সে বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তো! আমি মূসাকে কতল করে ফেলি, সে তার রবকে ডাকুক। আমার ভয় হচ্ছে যে, সে তোমাদের ধর্ম-কর্ম সব বদলে ফেলবে, অথবা সারা রাজ্যে সে এক প্রচন্ড বিশৃংখলা ছড়িয়ে দেবে। (আয়াত ৪০, ২৬)

এই আয়াতটিতে ফেরাউনের কি অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে! তাকে কে ধরে রেখেছিলো যে, ছাড়তে হবে? সে না সর্বশক্তিমান? তাহলে কেন সে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারছে না যে তার গোটা রাজ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে দেবে বলে সে আশংকা করছে? আসলে, এ কথা বলে সে পিঠটান দিতে চায়। সে দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে যে, সে দিনের সে শিশু মূসা (আ.)-কে অলংঘনীয় এক গায়বী মদদ ঘিরে রেখেছে। তার গায়ে হাত দেয়া থেকে তার হাত পা যেন কে বেঁধে ফেলেছে। মহাশক্তিমান সিংহ সে, কিন্তু এখন ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিজ গর্তে ফিরে যেতে পথ পাচ্ছে না, পেছন থেকে তার হাত যেন কে বেঁধে ফেলেছে। কাপুরুষের মতোই তার অন্তর কাঁপতে শুরু করেছে। তাই মূসা (আ.)-এর কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তার অন্তরের মধ্যে সে ভয়ে কিভাবে চুপসে গেছে তা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারছে।

দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি এ সূরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করা। বিশেষ করে, যার সাথে জ্ঞানের যোগ রয়েছে। এ মহামূল্য সম্পদ যেমন মানুষের উপকার করে, তেমনি মানুষকে হিংস্র পশুর স্তরেও নামিয়ে দেয়। এই সম্পদই মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্ম দেয়। তাই দেখা যায়, কারুন তার জাতির মধ্যে এই সম্পদ নিয়ে চরম জাঁকজমকপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয়েছে। এমনভাবে সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলো যে মানুষের মধ্যে এ কথাটা সাধারণভাবে জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো, তার অর্থভান্ডারের চাবিগুলো বহন করতে গিয়ে শক্তিশালী একদল(১) লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন 'দল' বলতে যদি দশ জনও হয় তাহলে দশ জন শক্তিশালী লোক কমপক্ষে দশ মণ বোঝা বইতে পারে। কমপক্ষে দশ মণ যদি চাবির বোঝা হয়, আর সে চাবিগুলো যদি কামরার বা বাক্স সিন্দুকের হয়, তাহলে কতগুলো বাক্স ভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আবার জ্ঞানের কারণেও কারুন অহংকার করতো এবং সে মনে করতো, এই যে বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদের মালিক সে হয়েছে– এটা তার জ্ঞান ও জ্ঞানগত যোগ্যতারই ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কওমের মধ্যে যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, তারা সম্পদ কম হলেও কারুনের তুলনায় নিজেদের কখনো ছোট মনে করতো না, বা কারুনের জাঁকজমক ও জৌলুস দেখে হীনমন্যতায় ভুগতো না; বরং সাধনা করা ও সঠিক পথে থেকে জীবন যাপন করা এবং অপরকে সাহায্য করার বিনিময়ে তারা আল্লাহর কাছেই প্রতিদান আশা করতো। তারা জানতো যে আল্লাহ তায়ালাই উত্তম এবং তিনিই চিরস্থায়ী।

তারপর যখন কারুনের অহংকার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাকে তার সহায় সম্পদসহ মাটির মধ্যে ধসিয়ে দিলেন। সে সময়ে তার ধন সম্পদ ও জ্ঞান তাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারলো না। তখন তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ করলেন, যেমন সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন ফেরাউনের ব্যাপারে। সবার নযরের সামনে তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তাকে ও তার বাহিনীকে সাগরের উত্তাল তরংগের মধ্যে ফেলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। নিসন্দেহে ফেরাউনও ডুবে মরেছিলো।

অবশ্যই বনি ইসরাঈল জাতির ওপর সে যবরদস্তি করেছিলো। একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং স্বেচ্ছাচারী শাসন ক্ষমতা চালিয়ে গোটা দেশে এক চরম নৈরাজ্য ও চরম অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিলো। একভাবে কারুনও তার অর্থ সম্পদ ও জ্ঞানের দাপট দেখিয়ে মানুষকে বশীভূত করে রেখেছিলো। ফলে তার সেই একই পরিণতি হয়েছিলো, যা হয়েছিলো ফেরাউনের। তাকে তার ধনদৌলত ও বাড়ীঘর দুয়ারসহ পৃথিবীর বুকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অপরদিকে

---

(১) দল বলতে বুঝায় দশ বা দশের ওপরের কোনো সংখ্যা। যেমন সূরা ইউসুফে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলেছিল, আমরা তো একটি দল। তারা সংখ্যায় ছিলো এগার জন। আর একটি পরিভাষা 'বিদউন-অর্থাৎ তিন থেকে নয়, সুতরাং দল (উসবাতুন) বলতে বিদউনের ওপরের যে কোনো সংখ্যাই হবে।

সীমা-লংঘনকারী, বলদর্পী আল্লাহর সে দুশমন ফেরাউন ও তার দোসরদের দিকে লক্ষ্য করুন। কেমন করে গভীর সাগরের উত্তাল তরংগাভিঘাতে হাবুডুবু খেয়ে তারা মরছে, কতো অসহায়ভাবে তারা বাঁচার জন্যে হাত পা ছুঁড়ছে, কিন্তু হায়, এ যে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছে! ভূধরে, সাগরে, অন্তরীক্ষে এমন কেউ নেই যে তাঁর হুকুম রদ করতে পারে। আল্লাহর যমীনে বাস করে যারা তাঁর না-ফরমানী করবে, তাঁর ক্ষমতাকে উপেক্ষা করার দৌরাত্ম্যদেখাবে, তার নিজের শক্তি ক্ষমতা কায়েম করতে চাইবে তাদের অবস্থাও হবে এমনি। বিদ্রোহী, ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ওপর যখন আল্লাহর গযব নেমে আসবে তখন কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। আলোচ্য সূরার এ বর্ণনাটি আমাদের এ শিক্ষাই দিচ্ছে। সুস্পষ্টভাবে এ সূরা জানাচ্ছে যে, মানুষের জীবন যখন এ ধরনের অহংকারী বিদ্রোহী শাসকের নিষ্পেষণে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, তখনই সত্যাশ্রয়ীদের জন্যে গায়বী মদদ এবং বিদ্রোহীদের জন্যে চূড়ান্ত ও অলংঘনীয় শাস্তি নেমে আসে।

এ কাহিনী থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যখন কোনো এলাকায় অবিচার, দুর্নীতি ও পাপাচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ন্যায়নীতি কোণঠাসা হয়ে যায়, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ থাকে না এবং হকপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়ে, তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, সমাজের বুকে সর্বদিক থেকে অশান্তি বিশৃংখলা নেমে আসে এবং গোটা জাতির ওপর অর্থ সংকট ও দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কুদরতী হাত প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সকল উদ্ধত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। তখন কোনো সৃষ্টি জীবের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রকাশ্য সাহায্য মানুষের সামনে ভেসে ওঠে। অসত্যকে দমন করার জন্যে এবং সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহর গায়বী মদদ এ জন্যে নেমে আসে যে, তিনি সকল অন্যায় অবিচার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সকল প্রকার যুলুম নির্যাতন ও অশান্তি সীমালংঘন করা থামিয়ে দেন।(১)

ফেরাউন ও কারূন এই দুই ব্যক্তির কাহিনীর মধ্যে মোশরেকদের সাথে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তাতে সত্যের পক্ষে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ হাযির করা হয়েছে। এ প্রমাণপত্র এতোই

(১) সূরা 'তা-হা'-র মধ্যে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। এমন এক সময় ছিলো যখন গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে যালেম ফেরাউনের হাতে তাদের হীনতা-দীনতার চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সে বনী ইসরাঈল কওমের ছেলেদের এই অপরাধের কারণে হত্যা করছিলো যে, কোনো এক জ্যোতির্বিদ বলেছিলো, বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। ফেরাউন তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকছিলো এ জন্য যে, তাদের কেউ ক্ষমতার অন্তরায় হবে না, কিন্তু কুদরতের হাত কে রুখতে পারে? যার মাধ্যমে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন এবং শাস্তি দেবেন, তাকে তিনি ঠিকই বাঁচিয়ে রাখলেন। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করার অপরাধে তাদের এই জরিমানা দিতে হচ্ছিলো। তাদের হীনতা-দীনতা ও চরম অপমানের যিন্দেগী কাটাতে হচ্ছিলো, সদা-সর্বদা এই ভয়-ভীতি তাদের লেগে থাকতো যে, আবার কোনো নতুন শাস্তি তাদের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায় কিনা! এই দুঃসময়ে যারা মূসা (আ.)–এর সাথে থেকে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো এবং তাদের অন্তর ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো– (এই অপরাধের কারণে?) যারা শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো, তারা সে অবস্থায়ও দমে যায়নি; বরং মাথা উঁচু করে তারা ফেরাউনের মুখের ওপর ঈমানের কথা উচ্চারণ করেছিলো। তখন তারা একটুও থতমত খায়নি, প্রকম্পিত হয়নি, কোনো দুশ্চিন্তাও করেনি, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কোনো নমনীয় ভাবও প্রদর্শন করেনি। আসলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা এ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্তর-প্রাণের মধ্যে তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাণী প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে অবস্থাটাই এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটাই যথার্থ। এ সূরার প্রাসংগিক আলোচনাও এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। সূরা ত্বা-হা-তেও কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ এই একই কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির হাত যে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের সাহস যোগাচ্ছিলো, কিন্তু এ চরম অত্যাচারী অহংকারী যালেম বাদশাহর মুখের ওপর ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা এবং হক কথা উচ্চারণ করার পরই আল্লাহর সর্বশেষ সাহায্য নেমে এলো।

উজ্জ্বল যে, কোনো ব্যক্তি বুঝতে চাইলে তারা যদি প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দৃশ্যের দিকে একবার তাকায় তাহলে অবশ্যই সত্যকে তারা বুঝতে পারবে। যদি একবার অতীতের জাতিসমূহের কর্মকান্ড ও তাদের পরিণতির দিকে তাকায়, আর একবার যদি কেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করে এবং নিজেদের মানস চোখে কেয়ামতের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে, তাহলে তারা দেখতে পাবে কাহিনী দুটোর মধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলী তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে এবং প্রত্যেক ঘটনাই তাদের জন্যে উপকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সে দুই ব্যক্তির সাথে সংঘটিত ঘটনা তাদের আস্তে আস্তে সত্য পথের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, তাদের সামনে আল্লাহর অমোঘ নিয়মসমূহ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে।

কি যুক্তিহীনভাবে মোশরেকেরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলছে, '(আপনার আনীত) হেদায়াতের পথ গ্রহণ করলে আমাদেরকে আমাদের যমীন থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।' এসব কথা বলে আসলে তারা সত্য থেকে দূরে থাকতে চাইতো। সত্য গ্রহণ না করার জন্যে তারা নানা প্রকার খোঁড়া ওযর পেশ করতো। বলতো যে, দেশ থেকে উৎখাৎ হয়ে যাওয়ার ভয়েই তারা সত্য গ্রহণ করছে না। কারণ বাপ-দাদার আমল থেকে তারা যেসব পূজা পার্বণ করে আসছিলো, এখন সমাজপতি সমাজ নেতাদের কথা অমান্য করে সেগুলো বাদ দিলে এসব সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দ তাদের দেশ থেকে বের করে দেবে, অথচ তারা মর্যাদাপূর্ণ কাবা ঘরকে সম্মান করতো এবং যারা এ ঘরের সাথে সম্পর্কিত থাকতো তাদের ধন্যবাদ দিতো।

এ জন্যে এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনাটি পেশ করেছেন, তাদের দেখিয়েছেন, নিরাপত্তা এবং ভয় কোত্থেকে আসে। তিনি উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে এ কথা জানাচ্ছেন যে, যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর কাছে থেকেই নিরাপত্তা লাভ করা যেতে পারে। যখন মানুষ দেখে কোনোভাবেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না এবং নিরাপত্তা লাভ করার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, তখনই আল্লাহনির্ভর ব্যক্তিদের জন্যে অভাবনীয়ভাবে তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেমে আসে। নিরাপত্তা বলতে যা কিছু মানুষ বুঝে তা যখন এসে যায় তখন ভয়ভীতি অনেকাংশে কমে যায় এবং তখন মানুষ মনের মধ্যে এক বেহেশতী নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। একথা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কারুনের ঘটনাটা তুলে ধরেছেন।

তাদের সম্পর্কে এসব তথ্য পরিবেশন করার পর বলা হচ্ছে, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি তাদের জন্যে এই নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ শহরটি প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল সর্বদিক থেকে সংগৃহীত হয়ে আসবে এবং আমার পক্ষ থেকে যাবতীয় জীবন ধারণ সামগ্রীর সমাবেশ ঘটানো হবে, কিন্তু (তবুও তাদের) অধিকাংশ মানুষ জানে না। এখানে তাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে মহান সত্ত্বা তাদের যাবতীয় ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনিই এই শহরটিকে মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ বানিয়েছেন, তিনিই তাদের জন্যে এই নিরাপত্তা[illegible] চিরস্থায়ী করবেন, অথবা (তাদের নাফরমানীর কারণে) তিনি নিজেই তাদের এই নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করবেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা অহংকার ও নাশোকরীর পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আরো কতো কতো এলাকাবাসী তাদের জীবন ধারণ সামগ্রীর ব্যাপারে অহংকার করেছে, কিন্তু সে সকল এলাকায় পরে আর কেউই বসবাস করেনি— অতি নগণ্য কিছুসংখ্যক মানুষ ছাড়া। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা, আমিই সবকিছুর উত্তরাধিকারী।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল আচরণের পরিণতি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক করছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের

নিয়ম অতীত হয়ে গেছে, সতর্ককারী কোনো নবী আসার পর যখন তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে তখন সেসব প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার রব কোনো এলাকাকে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তার অধিবাসীদের কাছে কোনো রসূল পাঠানো হয়, যে তাদের কাছে আমার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনায়। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো এলাকাকে ধ্বংস করি না যতোক্ষণ পর্যন্ত তার অধিবাসীরা যালেম না হয়ে যায়।'

এরপর তাদের কাছে কেয়ামতের দিনের দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে, স্মরণ করানো হচ্ছে, যখন সবার সামনে একেবারে প্রকাশ্যভাবে তাদের সে শরীকরা সব দূরে সরে যাবে এবং সেসব শেরেকের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করবে। অতপর দুনিয়ার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার পর তাদের আখেরাতের আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, এর আগে তাদের জানানো হয়েছে, কখন কোন কারণে ভয়ভীতি আসবে, আর কখনই বা তাদের নিরাপত্তা দান করা হবে।

এরপর সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে রসূলে করীম (স.)-এর সাথে আল্লাহর ওয়াদার কথা উল্লেখ করে। যখন মক্কাবাসী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রসূল (স.) দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি আবার তাকে তার দেশে ফিরিয়ে আনবেন, তখন তিনি তাকে শেরেকের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে এবং তাঁর দেশবাসীর ওপর বিজয় লাভ করার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবেন। অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে রেসালাতের এ মহান দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যদিও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তিনি কোনো অনুমানই করতে পারেননি। মক্কাবাসীরা তাঁর দেশত্যাগ সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে যখন তাঁর ও তাঁর সাথীদের ওপর অত্যাচার চরমভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সে সময়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই তাঁকে সাহায্য করবেন বলে আশ্বস্ত করছেন এবং তাঁকে ওয়াদা দিচ্ছেন, শীঘ্রই তাকে তাঁর জন্মভূমিতে আবার ফিরিয়ে আনা হবে, যেখান থেকে তিনি বিতাড়িত হচ্ছেন, শীঘ্রই সেখানে তিনি পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এবং সফলতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত অবস্থায় আবার ফিরে আসবেন। আলোচ্য সূরার মধ্যে বর্ণিত কেসসাগুলোতে এ কথাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে এর আভাস দেয়া হয়েছে। যেহেতু মূসা (আ.)ও এভাবে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে দেশ ত্যাগ করার পর সেই দেশে আবার এক নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিরে এসেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বনী ইসরাঈল জাতিকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের যুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছিলেন, ফেরাউন ও তার লোকলশকর মূসা এবং তার নাজাতপ্রাপ্ত জাতির সামনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। জানানো হচ্ছে যে, এ ওয়াদা পূর্ণ হতে চলেছে, এবার শেষ ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে (সর্বময় ক্ষমতার মালিক) হিসেবে তোমরা ডেকো না। নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া। হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনি, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরাটির বাহ্যিক চেহারার দিকে তাকালে এবং এর আলোচ্য বিষয়গুলো সামনে রাখলে বুঝা যাবে, ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোই হচ্ছে সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ সূরটির ওপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা রাখতে গিয়ে আমরা চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। মূসা (আ.)-এর কেসসা, পরবর্তীতে কি হলো সে বিষয়ে অনুসন্ধান, কারুনের কেসসা এবং মূল জায়গায় ফিরিয়ে নেয়ার এই শেষ প্রতিশ্রুতি ....।

তাফসীর

আয়াত ১-৪৩

সূরাটি শুরু হচ্ছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন হরফ (অক্ষর) দ্বারা।

'ত্বা-সীম-মীম'। এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী কেতাবের আয়াত।'

এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো দিয়ে সূরাটি শুরু হচ্ছে এ কথা জানানোর জন্যে, যে এগুলোর মতোই কিছু জিনিস এমন আছে যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী এ কেতাবের আয়াতগুলোর সাথে সংযুক্ত। এগুলো বেশ কিছু জটিল অর্থ ও বহু দূরের তথ্য সরবরাহকারী, এগুলো মানুষের ধারণা শক্তিকে বহু দূরের বস্তু বা বিষয়ের দিকে এগিয়ে দেয়, বিচ্ছিন্ন এ অক্ষরগুলো থেকে যেসব চিন্তা শক্তির উদ্রেক করে, মানুষের অস্থায়ী ভাষার গন্ডীর মধ্যে তার স্থান সংকুলান হয় না। এই কথাটির দিকেই ইংগিত দিয়েছে নীচের আয়াতটি,

'এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী আয়াত।'

এ কথা দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী এ কেতাব কোনো মানুষের তৈরী বস্তু নয়। আর এটা এমনই এক কেতাব যে, তারা কেউ এমন একখানা গ্রন্থ তৈরী করতে পারবে না; অবশ্যই এটা হচ্ছে সেই ওহী যা আল্লাহ তায়ালা বা ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বান্দার কাছে নিজে পড়ে শোনান। ফেরেশতা জিবরাঈল যেহেতু অবিকল তাই পৌঁছিয়েছেন রসূল (স.)-এর কাছে, যা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে শুনেছেন। তাতে কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকার পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার নেই। এ বিষয়টি বুঝার জন্যে যদি আমরা টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে ব্যবহার যোগ্য ক্যাসেটের দিকে তাকাই তাহলে কিছুটা বুঝতে সুবিধা হবে। এই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কীর্তির চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হয়েছে, যেমন করে এই মহা সৃষ্টির বড় ছোট সকল প্রকার জিনিস থেকে আল্লাহর নির্মিত এমন সব বিষয় প্রকাশ পায় যা তৈরী করা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি মহান আল্লাহ, তোমার কাছে ফেরাউন ও মূসার সংবাদ যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি সেই জাতির জন্যে, যারা ঈমান রাখে।'

এ আয়াতে বুঝা গেলো, এ কেতাব মোমেন জাতির উদ্দেশ্যে ও তাদেরকে গড়ে তোলার জন্যে নাযিল হয়েছে। এ কেতাব দ্বারা তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তাদের সঠিক মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাদের কাছে পার্থিব যিন্দেগীর জন্যে বিস্তারিত কর্মসূচী পেশ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই জীবন সমস্যার সকল সমাধান বের হয়ে আসে। আলোচ্য সূরাটির মধ্যে এই যে কেসসাগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে তার লক্ষ্য, মোমেনরা যেন এ মহাগ্রন্থ থেকে যথার্থভাবে ফায়দা হাসিল করতে পারে।

আল কোরআনের এই যে তেলাওয়াত আমরা করি, এটা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকেই প্রাপ্ত। তাঁরই অনুগ্রহে এবং তাঁরই সরাসরি তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত যত্ন সহকারে মোমেনদের এই তেলাওয়াত শেখানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এ পবিত্র কালামের মর্যাদার চেতনা দান করা হয়েছে, যারা গভীরভাবে এর মূল্য বুঝে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কেমন করে তারা এই গভীর উপলব্ধি পেতে পারে? জওয়াব হচ্ছে, মহান আল্লাহ মোমেনদের জন্যে তাদেরই প্রয়োজনে এ কেতাব তাঁর রসূলের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে যথাযথভাবে শিখিয়েছেন, তাদের যাবতীয় কল্যাণ সাধনার্থে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের এই মেহেরবানী দান করেছেন।

'সেই জাতির জন্যে যারা ঈমান রাখে।'

হযরত মূসা (আ.)-এর বিচিত্র শৈশব

এতোটুকু ভূমিকা পেশ করার পর আল্লাহ্ অতীতের কাহিনী পেশ করার মাধ্যমে বক্তব্য বর্ণনা শুরু করছেন। সর্বপ্রথমে মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী। সে মহান নবীর ঘটনা বলতে গিয়ে একেবারে তার জীবনের প্রারম্ভ থেকেই শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ একেবারে তার জন্মলগ্ন থেকেই তার জীবনের কাহিনীর কথা এসেছে এবং এ সূরাটিতে তার জীবনের ঘটনাগুলো এমন চমৎকার ও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, যা অন্য কোনো সূরাতে আসেনি। মূসা (আ.)-এর জীবনের প্রথম অধ্যায়টি কিভাবে শুরু হচ্ছে, কি কঠিন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন এবং কিভাবে শুরু হচ্ছে তার জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলো, কতো অসহায় অবস্থায় তার শিশু জীবনের সূচনা হচ্ছে– সবই এখানে লক্ষণীয়।

এক দুর্বল ও শক্তিহীন কওমের মাঝে এক দীনহীন ঘরে তাঁর জন্ম। আলোচ্য সূরার মধ্যে এ কঠিন ও প্রতিকূল অবস্থাকে এক মৌলিক বিষয় হিসেবে তুলে ধরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। মানুষকে এ কথা বুঝার সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াবী দৃষ্টিতে যেসব জিনিস শক্তি সামর্থ ও সাহায্য বলে বিবেচিত হয়, সেসব কিছু থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থাকাবস্থায় কিভাবে তার কোনো বান্দাকে তিনি মর্যাদাবান বানিয়েছেন এবং কিভাবে তিনি তাকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তৎকালীন পৃথিবীতে যে অহংকারী শাসক নিজেকে সর্বশক্তিমান বানিয়ে রেখেছিলো, সেই নরপতিকে তারই ঘরে লালিত পালিত ছেলের দ্বারা কিভাবে পর্যুদস্ত করেছেন, কিভাবে, মানুষের সকল প্রকার সাহায্য বিবর্জিত অবস্থায় তার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা খেদমত নিয়েছেন এমন এক জাতি গড়ার, যারা গোটা পৃথিবীতে দীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে শাসন কার্য পরিচালনা করেছে, তাদেরই নেতৃত্বে তিনি তৎকালীন পৃথিবী থেকে যুলুম অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছেন। দুর্বল, অসহায় ও নির্দয়-নিষ্ঠুর যালেম ফেরাউনের হাতে দীর্ঘকাল ধরে নিষ্পেষিত সে জাতিকে কিভাবে তিনি রেহাই দিয়েছেন; যাদের পেছনে কোনো সহায় সম্বল, শক্তি-সামর্থ কিছুই ছিলো না, যারা সকল দিক থেকেই অসহায় অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছিলো। কে তাদের পরিণত করলো শাসকের জাতিতে, শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শোষিতদের ক্ষমতার মসনদে বসালো কে? এই ঘটনাটাই মোমেনদের সামনে তুলে ধরে তাদের সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন মক্কা থেকে বিতাড়িত, নিগৃহীত ও অসহায় মোমেনদের সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আপন কুদরত বলে পৃথিবীর ক্ষমতার মসনদে বসাবেন, তাদের দ্বারা দুনিয়ার নেতৃত্বের এবং বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার খেদমত নেবেন। অসহায়ত্ব ও প্রতিপক্ষ বিবেচনায় বনী ইসরাঈল জাতি ও মক্কী যিন্দেগীতে অবস্থানরত মক্কার মুসলমানদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই ছিলো না। এ জন্যেই মূসা (আ.)-এর ঘটনা মুসলমানদের জন্যে ছিলো যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি তাদের হতাশ প্রাণে এ সূরাটির বর্ণনা আশার জোয়ার প্রবাহিত করেছিলো।

অন্যান্য সূরার মধ্যে মূসা (আ.)-এর যে তথ্য বিবরণী এসেছে তাতে দেখা যায়, সেসব স্থলে প্রধানত তাঁর রেসালাতের ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে বেশী, তাঁর জন্ম ও তৎসংলগ্ন ঘটনা সেখানে তেমন বেশী প্রাধান্য পায়নি। আসলে জন্মলগ্নের ঘটনা ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহের মাধ্যমে বিদ্রোহী, অহংকারী, শক্তিদর্পী বাদশাহর ওপর ঈমানী শক্তির বিজয় চমৎকারভবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারপর দেখানো হয়েছে ঈমানী শক্তির অধিকারীদের জন্যে গায়বী মদদের দৃশ্য। অবশেষে যালেম ও বিদ্রোহীদের জন্যে তাদের করুণ পরিণতির শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে নিছক একটি কাহিনী বর্ণনা করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। মূলত এ কথাটাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, যখন কোনো দেশে অন্যায় অবিচার, যুলুম-নির্যাতন ও মন্দের প্রসার ঘটে, তখন সে সমাজের ধ্বংস হওয়াটা অবধারিত হয়ে যায়। যখন আল্লাহর রাজ্যে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন তা দমন করার জন্যে মানুষের কোনো শক্তি প্রয়োজন হয় না বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার কুদরতী হাত বাড়িয়ে দেন, যারা হীনতা দীনতার অক্টোপাসে আবদ্ধ হয়ে দুর্বল হয়ে রয়েছে, তারাই তখন সে হাত ধারণ করে, তারা আল্লাহর শক্তি দিয়েই যালেমদের শায়েস্তা করে, ওদের অত্যাচার থেকে মানুষকে রেহাই দেয়। কল্যাণের পথ ও তার উপাদানসমূহ তাদের মধ্যে বিস্তার করতে থাকে, নতুনভাবে সে জাতিকে তারা ঢেলে সাজায়। তাদের জনপদের নেতা এবং পূর্ববর্তী যালেমদের সহায় সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়।

এ সূরাটির আলোচনা ধারা থেকে এই উদ্দেশ্যই ফুটে ওঠেছে, আর এই জন্যেই দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য ভাষণে এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। আল কোরআনে যতো কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোই এই ধরনের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বর্ণিত হয়েছে। আসলে কোনো জাতিকে গড়ে তোলার জন্যে এবং তাদের মানসিক অবস্থা কোনো উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করার জন্যে এই ধরনের উপাদানের সাহায্য নিতে হয়, তাহলে যে কোনো বক্তব্যকে ফলপ্রসূ বানানো যায়, কোনো বিষয় প্রস্ফুটিত করে তোলা যায় এবং এইভাবে অন্তরসমূহকে সত্য সচেতন করে তোলা সম্ভব হয়।

এখানে কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে যেসব ভাষণ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে মূসা (আ.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ও সে জন্মলগ্নকে ঘিরে যেসব কঠিন অবস্থা সামনে এসেছে তা অবশ্যই দেখার বিষয়। এ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে মূসা (আ.)-এর নবুওত লাভ পর্যন্ত পৌঁছানোর ঘটনাবলী সামনে রাখলে সহজেই বুঝা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহর পরিচালনা এবং মেহেরবানীতেই এ ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে। এরপর আসছে পর্যায়ক্রমে তার কৈশোর, যৌবন ও নবুওতকালীন অবস্থা।

বর্ণনায় এক কিবতির নিহত হওয়ার ঘটনাও আসছে এবং তাকে ধরার জন্যে ফেরাউন ও তার আমীর ওমরাদের ষড়যন্ত্র এবং তাঁর মিসর থেকে পালিয়ে মাদইয়ানের দিকে চলে যাওয়া, সেখানে তাঁর বিয়ে, বেশ কয়েক বছর চাকরি করা, তাঁকে আল্লাহর ডাক দেয়া এবং রেসালাতের দায়িত্ব প্রদান, তারপর ফেরাউন ও তার সভাসদদের সাথে মোকাবেলা এবং মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে তাদের প্রত্যাখ্যান করা, পরিশেষে ওদের সবার ডুবে মরা– এসব ঘটনা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটে গেছে।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনা দুটির আলোচনা বেশ দীর্ঘ বিস্তারিত আকারে এসেছে। এ দুটি ঘটনা যেহেতু এ সূরার মধ্যে নতুন এক আংগিকে পেশ করা হয়েছে, তাই এ দুটি ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশ ঘটেছে এবং ফেরাউনের অহংকার ও বড়ত্বের মিথ্যা দাবী ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, তার অক্ষমতা এবং সে যে আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী ফয়সালার অধীন, তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, ফেরাউন, হামান ও তাদের লোকলশকরদের এ দুটি ঘটনা থেকে সেই সত্যটি দেখিয়ে দিতে চাই, যার আশংকা তারা করছিলো।'

এরপর আল কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী পুরো ঘটনা কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং একটি দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা যায়, তা একজন পাঠকের কল্পনাশক্তি সহজেই পূরণ করে নিতে পারে, ফলে পাঠকের মন একটি ঘটনা থেকে অপর

ঘটনার মধ্যে কোনো ব্যবধান রয়েছে বলে অনুভব করে না। এভাবে যে কোনো জাগ্রত চেতনাশক্তিই আল কোরআনের বর্ণনাভংগির লালিত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

প্রথম ঘটনাটি পাঁচটি দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে, দ্বিতীয় ঘটনার বর্ণনা এসেছে নয়টি দৃশ্যের মাধ্যমে এবং তৃতীয় ঘটনাটি চারটি দৃশ্যে বিবৃত হয়েছে। এক ঘটনা থেকে অপর ঘটনার দূরত্ব কখনো বেশী এবং কখনো কম। পড়ার সময় তা এমনি টের পাওয়া যায়।

কিবতীদের ওপর ফেরাউনের নির্মম অত্যাচার

কাহিনীটির পূর্ণাংগ বর্ণনা শুরু করার পূর্বে সেই পরিবেশের একটা ছবিও তুলে ধরা হয়েছে যার মধ্যে এ ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিলো। এক্ষেত্রে সে সময়টার কথাও বলা প্রয়োজন যখন সেসব ঘটনাগুলো ঘটেছিলো এবং বর্ণনার পূর্বে ঘটনাগুলো কেন ঘটানো হয়েছিলো তাও পেশ করা হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি বিষয়ের পুংখানুপুংখ বর্ণনাদান আল কোরআনের কাহিনী বর্ণনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা এর বিষয় ও লক্ষ্যকে সুস্পষ্ট প্রস্ফুটিত করে তোলে। এরশাদ হচ্ছে,

'ফেরাউন পৃথিবীর বুকে তার বড়ত্ব প্রদর্শন করলো, সে উদ্ধত হয়ে তার দেশবাসীকে ভাগ ভাগ করে রাখলো..............তাদের সৈন্য সামন্তকে সেই জিনিস দেখাতে চেয়েছিলাম যার আশংকা তারা করছিলো।' (আয়াত ৫-৬)

এভাবে সেই দৃশ্যটি ছবির মতো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যাতে তাদের সামনে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের অপ্রতিরোধ্য শক্তি খুলে গিয়েছিলো এবং সেই উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিলো, যা তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার এই প্রকাশ এবং পর্দার অন্তরাল থেকে তাঁর অকল্পনীয় ক্ষমতার নযির তুলে ধরাই আলোচ্য সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যার বর্ণনা সূরাটির শুরু থেকে নিয়ে ছত্রে ছত্রে এবং সকল বর্ণনাধারার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠেছে। এভাবে সূরাটির মধ্যে বর্ণিত কাহিনীটি শুরু হচ্ছে, এ মহা আশ্চর্য কেতাবের এ বর্ণনাধারা এতোই চমৎকার এবং এতো বেশী চিত্তাকর্ষক যে, এর সাথে মানুষের তৈরী কোনো পুস্তকের কোনো তুলনাই হয় না।

এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যে ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে, সে যে কোন ফেরাউন তা মোটেই সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.)-এর যমানা থেকে সে কতো দিন পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলো, কতোদিন রাজত্ব করেছিলো, তার আগে কে ছিলো, কি ভাবে সে ক্ষমতায় এলো এবং কেমন করেই বা সে এতো ক্ষমতার মালিক হয়ে বসলো, কেনই বা তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি বা অভ্যুত্থান হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্য কিছুই আল কোরআন তুলে ধরেনি। কারণ এসব কেসসা কাহিনী বা অতীত ঘটনাবলী রসিয়ে-কষিয়ে বলা এবং তার দ্বারা কোনো মজা হাসিল করা এ পাক কেতাবের উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখিত ঘটনাপুঞ্জী মধ্যে এতোটুকু তথ্য দিয়েই আল কোরআন ক্ষান্ত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ.)-এর যমানার পর এ শাসকের আবির্ভাব হয়েছিলো। ইউসুফ (আ.)-এর ভায়েরা মিসরে আসার পর সেখানেই থেকে যায়। তাঁর পিতা ছিলেন ইয়াকুব (আ.), যিনি পরবর্তীতে ইসরাঈল নামে পরিচিত হন এবং তার সন্তানেরা বনি ইসরাঈল নামে খ্যাত। মিসরেই তাদের বংশ বিস্তার হয় এবং সেখানে তারা এক বিরাট বংশ হিসেবে বসবাস করতে থাকে।

যখন এ অহংকারী স্বৈরাচারী ফেরাউন (মিসরের বাদশাহদের সে যমানায় ফেরাউন বলা হতো) ক্ষমতাসীন হলো, তখন সে তার কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা গোটা জনপদকে এমনভাবে দুর্বল করে রাখলো যে, কেউ তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার সাহস পেতো না। যদিও মানুষ নিষ্পেষিত

হচ্ছিলো, তার অত্যাচারে জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ ছিলো, এমনকি তার বংশের লোকেরা যে সবাই তার ওপর খুশী ছিলো তাও নয়, তবুও তারা তার অত্যাচার থেকে বাঁচার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলো না। তার কূটনীতির প্রধান কাজ ছিলো গোটা মিসরবাসীকে অতি কৌশলে নানা দলে বিভক্ত করে রাখা। তার পলিসি ছিলো, 'ডিভাইড এন্ড রুল, জাতিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করো এবং তাদের শাসন করো', যা তার উত্তরসূরীরাও গ্রহণ করেছে। আজও মিসর সহ অন্যান্য দেশের কর্ণধাররা এই একই পলিসি অবলম্বন করে নিজ নিজ দেশে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে।

ফেরাউনের বংশীয় লোক ও তার সৈন্য সামন্তরা সংখ্যায় যাই থাকুক না কেন, তারা ছিলো ক্ষমতাসীন ব্যক্তির কৃপাধন্য। তাদেরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখে তাদের দলীয় নেতাদের পদ, পদবী ও অর্থ দিয়ে এমনভাবে বশীভূত করে রাখা হয়েছিলো যে, সামন্ত কায়দায় তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দলকে ঠিক রাখতো। বনী ইসরাঈল জাতি তার কূট-কৌশলের কারণে ঐক্যবদ্ধ কোনো জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। যদিও এ জাতির সবাই জানতো যে, তারা আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, তারা জানতো ইবরাহীম (আ.) তৎকালীন স্বেচ্ছাচারী শাসক নমরুদের ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে মানুষের মুক্তি এনেছিলেন। তারা এও জানতো যে, তাদের মত ও পথ একটিই এবং তাদের জীবন যাপন পদ্ধতিও সুনির্দিষ্ট রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সুবিধা দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী লোকদের ফেরাউন এমনভাবে হাত করে রেখেছিলো যে, তাদের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার হাতিয়ার ফেরাউনের জন্যে হয়েছিলো প্রধান সহায়ক শক্তি।

ছলে-বলে কলে-কৌশলে ফেরাউন নিজের বড়ত্ব কায়েম রেখেছিলো, সে জনগণকে মজবুর করে রেখেছিলো। নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে মিসরবাসীকে নানা বিবদমান দলে বিভক্ত করে রেখেছিলো, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ কোনো শক্তিতে পরিণত হতে না পারে এবং একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারে। তার অহংকার, যুলুম ও দমন নীতির প্রধান শিকার ছিলো বনী ইসরাঈল। কারণ তাদের আকীদা বিশ্বাস ও জীবন যাপনের নিয়ম নীতি ছিলো তার ও তার কওমের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তারা তাদের দাদা ইবরাহীম (আ.) ও পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর প্রবর্তিত নিয়ম বিধান মেনে চলতো। দিনে দিনে তাদেরও জীবন যাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে থাকলো। এতদসত্তেও বিশ্বজগতের মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা– এই মূল বিশ্বাসটা তখনও তাদের মধ্যে জীবন্ত ছিলো। শত নিষ্পেষণেও তারা ফেরাউনের 'সর্বময় ক্ষমতার মালিক' হওয়ার দাবী স্বীকার করতো না, তারা সবাই তার শেরেক ও পৌত্তলিকতার মনোভাবকে অস্বীকার করতো।

এভাবে চরম অহংকারী শাসক ফেরাউন অনুভব করতে লাগলো যে, এই ভিন্ন মতাবলম্বী জাতির আকীদা বিশ্বাশ ও মিসরে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব তার ক্ষমতা ও তার রাজত্বের জন্যে এক মারাত্মক হুমকি হয়ে রয়েছে, কিন্তু সংখ্যায় তারা এতো বেশী যে, সামগ্রিকভাবে তাদের মিসর থেকে বহিষ্কার করাও কঠিন। আদম শুমারিতে দেখা গেছে তাদের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ এবং এটাও তার সন্দেহ ছিলো যে, তারা বিরুদ্ধবাদী শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোর সহযোগিতা নিয়ে তাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এ জন্যে সে এই অনমনীয় ও অবাধ্য জাতিকে দমন করার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার জঘন্য ও নিপীড়নমূলক উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেলো। বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা আবিষ্কার করলো, তাদের দেশের কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলো থেকে দূরে সরিয়ে

রাখলো, তাদের জীবনকে সকল দিক দিয়ে দুর্বিষহ করে তুললো, তাদের জীবনে নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা ও অশান্তি এনে দিল এবং সর্বশেষে তাদের সংখ্যা কমানোর হীন উদ্দেশ্যে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতে শুরু করলো। প্রশাসনের প্রতি হুকুম জারি করে দিলো যখনই বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে কোনো পুত্র সন্তানের জন্ম হবে তখনই যেন তাকে হত্যা করা হয়, তবে কন্যা সন্তান হলে যেন তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়। সে ভাবলো, নানা প্রকার শাস্তি ও যুলুমের সাথে এই পুত্র নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকলে ক্রমান্বয়ে তাদের বংশহ্রাস হতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে যখন এ যালেম শাসক দমন নিপীড়ন চালাতো শুরু করলো, তখন সে একটুও হিসাব করতে পারলো না যে, সে নিজে কতো দিন বাঁচতে পারবে। তার মতো আরও তো কতো মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর তাদের এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

এ বর্ণনাও এসেছে যে, যালেম ফেরাউন দেশব্যাপী বনী ইসরাঈলদের গর্ভবতী মহিলাদের খোঁজ খবর রাখার জন্যে ধাত্রীদের নিয়োজিত করে রেখেছিলো। যাতে করে ওদের প্রতিটি পুত্র সন্তান পয়দা হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করা হয় এবং সেসব নিরপরাধ শিশুদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো দয়া-সহানুভূতি বা অনুকম্পা প্রদর্শন করা না হয়।

এই ছিলো সেই মারাত্মক পরিবেশ পরিস্থিতি, যার মধ্যে মূসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিলো। তাঁর জন্মলগ্ন থেকে ফেরাউন ও তার জাতির সলিল সমাধির কাহিনীর বিবরণ পেশ করে আল্লাহ তায়ালা অপরিণামদর্শী ও অহংকারীদের তাঁর শক্তি ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছেন। কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে তিনি বাঁচাতে চাইলে সারা দুনিয়ার সকল মানুষ ও শক্তি মিলে চেষ্টা করলেও তাকে মারা যায় না, আর কাউকে তিনি ধ্বংস করতে চাইলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না, একথাটাই তিনি তাদের জানাতে চেয়েছেন। মূর্খ নাদানের দল একটুও চিন্তা করে না যে, বস্তুশক্তিগুলোর মালিক কে? তাদের শরীরের অংগপ্রতংগগুলোও কি তাদের কথামতো চলে? কার বিধান মতো সব কিছু আবর্তিত হচ্ছে?

বিশেষ করে কোরায়শ জাতি তাদেরই আল-আমীনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে যখন লিপ্ত হয়েছে, তখন একটুও ভেবে দেখলো না যে, ইবরাহীম (আ.)-কে সে প্রলয়ংকরী অগ্নিকুন্ড থেকে কে বাঁচাল এবং তাঁর দাওয়াতটাই কি ছিলো। আর মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াতই বা কি। সারা জগতের মালিক আল্লাহর হুকুম পালন করার এবং তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করার আহ্বান জানানোই যদি মোহাম্মদ (স.)-এর অপরাধ হবে, তাহলে ইবরাহীম (আ.)ও তো এই একই অপরাধ (?) করেছিলেন। তাকে যদি অভাবনীয়ভাবে আল্লাহ তায়ালা বাঁচাতে পারেন তাহলে আজ মোহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা বাঁচাতে পারবেন না কেন? তাছাড়া যেসব হাতিয়ারের জোরে এই বিদ্রোহীরা বড়াই করে, তার মূল উপাদান তো আগুনই। সেই আগুনের মালিক যদি আল্লাহ তায়ালা হন, তিনি যদি চান যে সে আগুন তার অনুগতদের স্পর্শ করবে না, তাহলে অন্য কার কথামত সে আগুন কাজ করবে? তাই এরশাদ হচ্ছে,

‘আর ফেরাউন পৃথিবীতে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন করলো এবং দেশের অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেললো .... অবশ্যই সে ছিলো ভয়ানক অশান্তি সৃষ্টিকারী।’

অতপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার ইচ্ছা নস্যাৎ করে অন্য কিছু করতে চাইলেন, তিনি তার তাগূতী শক্তির সকল ইচ্ছা ও চক্রান্ত নাকচ করে দিয়ে নিজের ইচ্ছা কার্যকর করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, কিন্তু আফসোস, বিদ্রোহী অহংকারী শক্তিদর্পীদের সাময়িকভাবে আল্লাহ তায়ালা কিছু শক্তি ক্ষমতা

দিলে তারা ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা ভাবতে শুরু করে যে, শক্তি বা ক্ষমতার বুঝি কোনো শেষ নেই, নেই কোনো লয়। উপায়-উপকরণ ও অর্থ সম্পদ তাদের এতোদূর মুগ্ধ করে ফেলে যে, তারা ভুলে যায়, এগুলোর আসল মালিক কিন্তু তারা কেউ নয়। আসল মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করতে চাইলে মূল মালিকের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তারা মনে করতে শুরু করে যে, যেভাবে তারা এগুলো ব্যবহার করতে চাইবে, ব্যবহার করতে পারবে এবং তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ইচ্ছা করলেই তা প্রয়োগ করতে পারবে, কিন্তু বিধি যদি বাম হয় তাহলে তাদের এসব শক্তি সরঞ্জাম যে তাদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াতে পারে এসব কথা তারা মনে করতে পারে না।

তাই আল্লাহ তায়ালা এখানে তাঁর ইচ্ছার কথা ঘোষণা করছেন এবং তাঁর শক্তি ক্ষমতার কথা জানাতে গিয়ে ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামন্তদের কথা উল্লেখ করছেন যে, তাদের সকল প্রকার যোগাড়যন্ত্র, সাবধানতা ও সতর্কতা তাদের কোনোই কাজে লাগলো না। এরশাদ হচ্ছে,

'যাদের দেশের মধ্যে সকল দিক দিয়ে দুর্বল করে রাখা হয়েছে তাদের প্রতি আমি এহসান করতে চাই........ যার আশংকা ওদের কাছ থেকে তারা করতো।'

অতপর সে যালেম বাদশাহ দুর্বল করে রাখা যেসব মানুষকে নিজের অত্যাচারের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের সাথে যেভাবে খুশী নৃশংস আচরণ করে চলেছিলো, তাদের ছেলেদের হত্যা করছিলো এবং তাদের কন্যা সন্তানদের যিন্দা ছেড়ে দিচ্ছিলো এবং নিকৃষ্টভাবে সে তাদের কষ্ট দিচ্ছিলো এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার দমন নীতি তাদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছিলো এতদসত্ত্বেও তাদের ফেরাউন ভয় করছিলো এবং তার নিজের ও দেশের জন্যে এক প্রচন্ড হুমকি হিসেবে তাদের সে গণ্য করছিলো। এ জন্যে সব সময়েই তাদের প্রতি সে নযর রাখছিলো এবং তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিভাগকে সদা সর্বদা সতর্ক করে রেখেছিলো। পুত্র সন্তানের জন্ম হয়ে যাতে তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই সে করে রেখেছিলো। সে এমনভাবে গোয়েন্দাদের জাল বিস্তার করে রেখেছিলো যে, বনী ইসরাঈল কওমের মধ্যে কোনো পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তাকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করে দিতে হতো এবং সংগে সংগে সে কসাই এসে তাকে যবাই করে ফেলতো।

কল্পনার চোখে সে পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে একবার লক্ষ্য করুন। কতো অসহায় হয়ে পড়েছিলো তখনকার মানুষ! সেই কঠিন অবস্থা থেকে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন অধোপাতিত ও নিগৃহীত সে জাতিকে টেনে তুলতে চাইলেন, চাইলেন তাদের দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করতে ও তাদের দুঃসহ দুঃখ জ্বালা নিবারণ করতে। অতপর চাইলেন যেন তারা এতোদিনকার দাসত্বের দুঃখ-গ্লানি ঝেড়ে মুছে ফেলে এক স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়। সর্বশেষে তিনি এও চাইলেন, সারা দুনিয়া তাদের কর্তৃত্বাধীনে এসে যাক। হাঁ, তাদের অবশ্যই এ মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো এবং দেয়া হয়েছিলো তখন, যখন তারা ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলো। তাই দেখা যায়, পরবর্তীতে তাদের তিনি দুনিয়ার শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন এবং তারা নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হৃদয়ে মান মর্যাদা ও ক্ষমতার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হলো তাদের সম্মানজনক অবস্থা বাস্তবায়িত হলো। ফেরাউন, হামান ও তাদের বেগবান সৈন্য সামন্তের দল যার ভয় করছিলো, তাদের অজান্তেই তাদের সকল সতর্কতা ব্যর্থ হয়ে গেলো।

এভাবে এ কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার আগেই প্রসংগক্রমে বনী ইসরাঈল জাতির কাছে সেই খবরের ঘোষণা দিয়ে দেয়া হলো যা অনাগত ভবিষ্যতে ঘটবে। উদ্দেশ্য, এর

ফলে সে শক্তিদ্বয়কে পরস্পর মুখোমুখী দাঁড় করানো যাবে। একদিকে ফুলে ফেঁপে ওঠা বলদর্পী ফেরাউনের বিশাল বাহিনী সর্বপ্রকার সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রবল প্রতাপ নিয়ে অগ্রসরমান, দেখে মনে হচ্ছিলো তাদের রুখবার মতো কেউই নেই এবং প্রতিপক্ষের সকল শক্তিকে তারা চুরমার করে দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। অপরদিকে আল্লাহর শক্তি সমৃদ্ধ কতিপয় মানুষ, যারা মানুষের চোখ ধাঁধানো সকল শক্তি ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে দিতে পারে, এ কথা তাদের ভাবনা চিন্তায়ও উদিত হয়নি!

এভাবে ঘটনাটির পূর্ণ বৃত্তান্ত পেশ করার পূর্বেই সে বিস্ময়কর কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আঁকা হচ্ছে, যাতে করে ঘটনাটি পরিপূর্ণভাবে জানার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে যায়। কিভাবে সংঘটিত হলো এই মহাবিস্ময়কর ঘটনাটি। এতো বড় ক্ষমতাধর ও অনমনীয় বলদর্পী বাদশাহর সকল দর্প কিভাবে চূর্ণ হয়ে গেলো এবং কিভাবে তাদের সমূলে নিধনযজ্ঞ সম্পন্ন হলো, তা বুঝার জন্যে যে কোনো ব্যক্তির মন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার জন্যে এখানে পূর্বেই একটু আভাস দিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর সেই ঘটনার ছবি আঁকা হচ্ছে। এ ছবির দৃশ্য মানস-পটে এমনভাবে আঁকা হচ্ছে, যা দেখে মনে হচ্ছে এই প্রথম বুঝি তারা ঘটনাটি জানলো, অথচ ইতিপূর্বে আল কোরআনের পৃথক পৃথক স্থানে ঘটনাটির অনেক বিবরণ এসেছে, মানবেতিহাসে অন্য কোথাও এতো পুরাতন ঘটনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এভাবে মানুষের কাছে বর্ণনাকে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্যে আল কোরআনের এ এক বিশেষ বর্ণনাভংগি, যার সাথে অন্য কোনো গ্রন্থের বর্ণনাভংগির তুলনা করা যায় না।

আল্লাহর কুদরতে দুশমনের হাতেই মূসা (আ.)-এর লালন পালন

এবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক কাহিনীটির পূর্ণাংগ বর্ণনা কিভাবে শুরু করা হচ্ছে, কিভাবে ফেরাউনের বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে এবং এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতের কারিশমা ফুটে ওঠছে এবং পর্দার অন্তরাল থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার চাবুক কিভাবে বেরিয়ে আসছে।

মূসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছে যে কঠিন পরিস্থিতিতে তা সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্দিকে যখন শুধু বিপদ আর বিপদের ঘনঘটা, মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি যখন বাজছে দিকে দিকে, দুহাত বাড়িয়ে যখন বিভীষিকাময় মৃত্যুর ভয়াল হাত এগিয়ে আসছে, সেই কঠিন মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হচ্ছেন ভবিষ্যতের নবী মূসা (আ.)।

হাঁ, হয়রান পেরেশান মায়ের মন, প্রচন্ড আতংকে দারুণ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত তার হৃদয় দুরু দুরু করছে, ভীষণ ভয়ের দোলায় দুলছে সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চার আশু অকল্যাণ চিন্তায়, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি জল্লাদ খবর পেয়ে গেলো। এই বুঝি তার মায়ের বুক থেকে তার কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলবে। প্রত্যেক মা যেন দেখতে পাচ্ছেন তার আদরের দুলালের কণ্ঠে শন শন করে জল্লাদের ক্ষুরধার ছুরি চলছে। কচি শিশুর মায়ের এই প্রচন্ড ভয়, যে মা বাচ্চার নিরাপত্তা বিধানের কোনো ক্ষমতা রাখেন না, বাচ্চাকে কোনো স্থানে লুকিয়ে রাখারও তার কোনো উপায় নেই। সদ্যপ্রসূত বাচ্চার জীবনের লক্ষণ তার কান্নার আওয়ায বেড়েই চলেছে এবং যে আওয়ায কোনোভাবেই গোপন করা যাচ্ছে না, কোনোভাবেই বাচ্চার কান্না প্রশমিত করা যাচ্ছে না। হায়, দুর্বল ক্ষীণদেহী অভাবী মা কিভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তার নয়নমণিকে বাঁচাবেন। এ সব নানাবিধ দুশ্চিন্তায় মায়ের মন যখন থর থর করে কাঁপছে, তার বাকশক্তি যখন রহিতপ্রায়, সে সময়েই কুদরতের হাত হস্তক্ষেপ করছে। এই সুশীতল শান্তি ও

সান্ত্বনাদায়ক হাতটি চিন্তাক্লিষ্ট, ভীত-সন্ত্রস্ত, পেরেশান মায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাতটি কী মধুর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে বেদনা-ক্লিষ্ট এই মায়ের দেহে, কী মায়াময় বাণী তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। যার বিবরণ আসছে নীচের আয়াতে,

'আমি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ, মূসার মাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম, নিশ্চিন্তে তোমার বাচ্চাকে তুমি দুধ পান করাও। যখন খুব বেশী ভয় লাগবে তখন বাচ্চাকে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দাও। খবরদার তুমি ভয় পেয়ো না এবং দুঃখও নিয়ো না।'

ইয়া আল্লাহ, হে সকল ক্ষমতার মালিক! কি মধুময় তোমার বাণী। হে মূসার মা, তোমার বাচ্চাকে দুধ পান করাও। বাচ্চাকে তোমার দু'বাহু দ্বারা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখো, তুমি অস্থির হয়ে যাচ্ছো কেন? তিনি নিজেই তো তোমার সহায় হয়ে রয়েছেন। দেখো, তোমার বাচ্চা কতো নিশ্চিন্তে এবং কেমন করে শান্তভাবে তোমার বুকের দুধ খাচ্ছে, তবুও তুমি ভয় পাচ্ছো? তুমি তাকিয়ে রয়েছো তার দিকে, কিসের বিপদ তোমার? তাকে ধরার মতো কেউ নেই, তবুও তুমি ভয় পাচ্ছো? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ভয় যদি কিছুতেই দমন করতে না পারো তাহলে 'খোলা সাগরের বুকে তাকে ভাসিয়ে দাও।'

'আর মোটেই তুমি ভয় পেয়ো না, ভেংগে পড়ো না দুঃখে।' সে তো এখানেই আছে, সাগরের বুকেই আছে, আছে সেই মহান পরওয়ারদেগারের তত্ত্বাবধানে, যার নিরাপত্তা ছাড়া সত্যিকারের নিরাপত্তা অন্য কারও কাছে নেই, নেই অন্য কোথাও। এমন শক্তিশালী মালিকের হাত যার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, তার কোনো ভয় নেই।

এমন মযবুত সে হাত, যার ধারে কাছেও কোনো ভয়-ভীতি আসে না। সে হাতের স্পর্শে কঠিন থেকে কঠিন আগুন ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সেখানে পরিপূর্ণ শান্তি নেমে আসে। সে হাতের ছোঁয়ায় উন্মত্ত সাগর বক্ষ আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত হয়। সে হাত যাকে নিরাপত্তা দেয় তার একটি চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারে না- করার সাহস রাখে না মহাবিদ্রোহী ফেরাউন বা পৃথিবীর কোনো অহংকারী বলদর্পী শাসক, তারা সবাই মিলেও যদি চায় সেই নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে কারও ক্ষতি করতে, তাও পারবে না। তাঁর ঘোষণা,

'অবশ্যই আমি, মহান আল্লাহ, তোমার কাছে তাকে ফেরত এনে দেবো' ..... সুতরাং তার জীবন সম্পর্কে তোমার ভয় করার প্রয়োজন নেই বা সে চোখের আড়াল হয়ে গেছে বলে তোমার কোনো চিন্তাও করা লাগবে না .... (তুমি জেনে নাও), আমি তাকে রসূল বানাবো।'

এটাই ছিলো সে নিরাপত্তাদানের আশ্বাসের সাথে অতিরিক্ত সুসংবাদ। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওয়াদা অবশ্যই অন্য সবার কথা থেকে বেশী সত্য।

উক্ত কাহিনীর এই হচ্ছে প্রথম দৃশ্য, পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রস্ত মায়ের সে ছবি, মৃত্যুর ভয়ে যে মুখচ্ছবি থেকে জীবনের সকল লক্ষণ বিলীন হয়ে গেছে, তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন এ মহান আশ্বাস বাণী এসে যাচ্ছে, তখন সেখানে নব জীবনের স্পন্দন ভেসে ওঠছে, সব কিছু তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, তার কম্পিত হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে ওঠছে। এ তৃপ্তির রেখা তার প্রশান্ত বদনে ফুটে ওঠছে। এরপর সেই বেদনাহত মা কতো শান্ত মনে এবং কতো নিশ্চিন্ততার সাথে, ধীরস্থিরভাবে বাচ্চাটাকে নিশ্ছিদ্র একটি বাক্সে করে সাগর বক্ষে ভাসিয়ে দিচ্ছে, এর পূর্ণ বিবরণ আর দান করা হয়নি। এ দৃশ্যের ওপর পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে পাঠক এ পর্দা নিজেরাই সরাতে পারে। তারপর আমরা মুখোমুখি হচ্ছি দ্বিতীয় দৃশ্যের,

'তারপর এ বাক্স ফেরাউনের পরিবার তুলে নিলো।'

এটাই কি সেই নিরাপত্তা? এটাই কি সেই ওয়াদার সত্যতা? এটাই কি সেই সুসংবাদ, ইতিপূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে? কার আশ্বাসবাণী দ্বারা মূসা (আ.)-এর মায়ের হৃদয়কে আশ্বস্ত করা হয়েছে?

ফেরাউনের পরিবার ছাড়া অন্য কাউকে কি এই সর্বহারা অসহায় মা ভয় করছিলো? ফেরাউনের পরিবার ছাড়া এ গোপনীয়তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ হওয়ার ভয় করছিলো কি এই দিশেহারা মা? ফেরাউনের পরিবার ছাড়া অন্য কারও হাতে পড়ে যাবে তার আদরের দুলাল এই ভয়ই কি এ স্নেহময়ী মায়ের উত্তপ্ত হৃদয়ে জেগে ওঠেছিলো?

হাঁ, অবশ্যই মূসা (আ.)-এর মায়ের হৃদয়ে যে কথাগুলো ইতিপূর্বেই জাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তাতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, বাচ্চাটাকে নিয়ে তাদের কি করতে হবে, কোথায় সে যাবে, কার হাতে পড়বে, কোথায় সে লালিত পালিত হবে এবং অবশেষে মহান বিশ্বপালক তার দ্বারা কি খেদমত নেবেন, সব কিছুই বিস্তারিত তার মাকে জানিয়ে দিয়ে তার হৃদয়কে নিরুদ্বিগ্ন করে দেয়া হয়েছিলো। সকল ক্ষমতার মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে, ফেরাউন, হামান ও তাদের লোকলশকর বনী ইসরাঈলদের ছেলেদেরকে এই আশংকায় হত্যা করছিলো যে, ওরা তাদের এক সময়ে দেশ থেকে বের করে দেবে, শাসন ক্ষমতা দখল করে নেবে এবং তাদের খতম করে দেবে। এ কারণেই তারা সদা সর্বদা তাক লাগিয়ে ছিলো যেন হত্যা করা থেকে বনী ইসরাঈলের একজন শিশুও বাদ না পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাইলেন, যে বাচ্চার নেতৃত্বে তাদের ধ্বংসের আশংকা তাদের মনে পয়দা হয়েছিলো, তার লালন পালন ওদের মধ্যেই সম্পন্ন হবে এবং এমন ব্যবস্থা তিনি করবেন যে, সে বাচ্চাটাকে কেউ আর খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না। কে এই বাচ্চা? হাঁ, এই বাচ্চার হাতেই তাদের সবার মৃত্যু আসবে! হাঁ, এই সে ভাগ্যবান শিশু, যে চরম অসহায় অবস্থায় তাদের হাতে পড়েছে এবং এমন অসহায় অবস্থায় তাদের দ্বারাই লালিত পালিত হচ্ছে, যার নিজেকে বাঁচানোর মতো কোনো শক্তি সামর্থ নেই, নেই তার কোনো আশ্রয়স্থল, নিজের শক্তি ফিরে পাওয়ারও যার কোনো উপায় নেই। হাঁ, এই বিপজ্জনক বাচ্চাই সকল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ফেরাউনের কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, পৌঁছে যাবে সে বলদর্পী অত্যাচারী রক্তপিপাসু শাসকের দরবারে, অথচ কিছুতেই ফেরাউনের লোক লোক-লশকর এই বাচ্চার সন্ধান পাবে না। বনী ইসরাঈল জাতির কোন ঘরে, কোন মায়ের কোলে দুধ খাওয়া অবস্থায় এই শিশু বড় হচ্ছিলো তারা কেউই তার খোঁজ পাবে না।

এই বাচ্চাই একদিন খোলা ময়দানে সবার সামনে সুস্পষ্টভাবে তাদের তার উদ্দেশ্যের কথা জানাবে,

'যাতে করে তাদের জন্যে সে শত্রুরূপে বিবেচিত হয় এবং তাদের সীমাহীন দুশ্চিন্তারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

অর্থাৎ, সে সমান সমান শক্তির দাবীদার হওয়ার মাধ্যমে বা ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার দাবী করে তার মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অথচ অহংকারী যালেম বাদশাহ তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

কিবতী হত্যার ঘটনা

মূসা (আ.) ছিলেন একজন সাহসী ও স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজ জাতির ওপর এই যুলুম নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করা ছিলো তার পক্ষে অসম্ভব। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করছিলেন যে, দীর্ঘদিন থেকে এই অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে করতে তার জাতির আত্মসম্মান,

অনুভূতি ও বোধশক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছে। এ কারণেই তিনি এক বনী ইসরাঈলীর ওপর যুলুম করতে দেখে এক কিবতীকে কষে এক চড় বসিয়ে দেন এবং চড় খেয়ে লোকটি অনাকাংখিতভাবে মরে গেলে তিনি লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর পরদিন আবারও যখন তিনি এক ইসরাঈলীকে মারতে দেখেন, তখন তিনি তাকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে আসেন। তিনি কিবতীকে হত্যা করতে নয় বরং ইসরাঈলীকে তার যুলুম থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন, তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন, তার ডাকে সাড়া দেন। কারণ মানুষের অন্তরে কী আছে তা তো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তিনিই ভালো জানেন মানুষের ধৈর্য সহ্যের সীমা কতোটুকু।

এদিকে ইসরাঈলীদের প্রতি ফেরাউনের যুলুম এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে জাতিকে মুক্ত করার সম্ভাবনার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘদিন থেকে যুলুম করতে করতে তারা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো যে, সামষ্টিক একটি গণ জাগরণ বা বিপ্লব না হলে মূসা (আ.) ব্যক্তিগতভাবে যা করেছেন এমন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু করে সত্যিকার অর্থে কোনো কাজ হবে না।

পরে তিনি সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যা করেছেন তাতে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হতে পারে। দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে যখন তিনি ভাবলেন, তখন বুঝলেন, যা তিনি করেছেন তা নিজের কর্মপন্থা তথা নিজের উপরই অবিচার। সামান্য দেরীতে হলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই গোলামীর শেকল থেকে, এই যুলুম অত্যাচার থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ও দুরদর্শি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। এর পরবর্তী বিস্তৃত ঘটনায় আমরা দেখতে পাই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাঁর নবী মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন সেই জাতির জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে নির্বাচিত নবী। আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি তার কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করেছেন।

মক্কাতেও প্রথম দিকে মুসলমানদের একই অবস্থা ছিলো, তাই প্রথমদিকে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ধৈর্য ধরতে, কাউকে পাল্টা জবাব না দিয়ে হাত সংযত রাখতে।

যাই হোক আমরা আবার মূল ঘটনায় ফিরে যাই। দ্বিতীয় দিন যখন মূসা (আ.) অন্য এক কিবতীকে দেখলেন, সেই ইসরাঈলীর ওপর যুলুম করতে তখন তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, কিবতি মূসা (আ.)-কে এগিয়ে আসতে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলো। সে জানতো যে গতকাল মূসা (আ.) এক চড়ে এক লোককে মেরে ফেলেছে। তাই সে বললো,

'তুমি গতকাল যেমন একজনকে হত্যা করেছো তেমনি কি আমাকেও আজ হত্যা করতে চাও।'

সে আরো বললো,

'তুমি তো দেখছি সেচ্ছাচারী হতে চলছো, তুমি তো শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।'

কিবতী লোকটি মূসা (আ.) সম্পর্কে এমন একটি কথা বললো যা তার চরিত্রের সাথে মোটেই সামঞ্জস্য নয়। জীবনভর তিনি মানুষের উপকার করেছেন, মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন, অনেকের মাঝে বিদ্যমান ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করেছেন। তিনি কখনোই সেচ্ছাচারীতা কিংবা অন্যায়ভাবে কারো সাথে কখনো বাড়াবাড়ি করেননি। অথচ কিবতী লোকটি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দিলো যে, সে নাকি সেচ্ছাচারীতা করে, ফাসাদ সৃষ্টি করে, মানুষের মাঝে মীমাংসা না করে সে মানুষ হত্যা করে ইত্যাদি ....।

কোনো কোনো মোফাসসেররা অবশ্য বলেছেন যে, এই কথাগুলো কিবতীর নয়; বরং ইসরাঈলীই মূসা (আ.)-কে বলেছিলো। কেননা যখন মূসা (আ.) তাকে বললেন, 'তুমি তো দেখছি ভারি গোমরাহ ব্যক্তি' এবং রাগান্বিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন ইসরাঈলী মনে করেছিলো মূসা (আ.) তার উপরেই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাই পরিস্থিতি তার অনুকূলে আনার জন্যে হঠাৎ সে ভোল পাল্টে উল্টা মূসা (আ.)-কে কথা দিয়ে একহাত নিয়ে নিলো এবং গতকাল ঘটে যাওয়া সেই অনাকাংখিত ঘটনাটি সে জনসমক্ষে ফাঁস করে দিলো। যে সব মোফাসসের এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা মনে করেন, পূর্বের দিনের ঘটনাটি শুধু এই ইসরাঈলীই জানতো, অন্য কেউ জানতো না। আমি আমার বই 'আত তাসবীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' নামক বইয়ে ইতিপূর্বে এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে কথাটি ইসরাঈলী নয়, বরং কিবতীই বলেছিলো এবং মূসা (আ.) কর্তৃক কিবতীকে হত্যা করার ঘটনা আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। এর পরবর্তী ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, কিবতী গতকালের ঘটনার উল্লেখ করার পর মূসা (আ.) আর আগে বাড়েন নি। তাদের সাথে এ নিয়ে আর কোনো বাদানুবাদ করেননি।

ফেরাউনের হুলিয়া জারি ও মূসা (আ.)-এর দেশত্যাগ

এরপর এখান থেকে শুরু হয়েছে ঘটনার নতুন অধ্যায়। এখানে আমরা দেখতে পাই মূসা (আ.)-এর কল্যাণকামী এক ব্যক্তি শহরের অপর প্রান্ত থেকে ছুটে এসে তাকে ভয়াবহ এক দুঃসংবাদ দিলো। সে জানালো যে, ফেরাউনের লোকেরা মূসা (আ.)-কে গ্রেফতার করার জন্যে ছুটে আসছে। সে এসে বললো,

'ফেরাউনের দরবারীরা আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, আপনি এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যান (সংবাদটি আপনাকে এজন্যেই দিলাম যে,) আমি সত্যিই আপনার একজন শুভাকাংশী।'

এটাই হলো আল্লাহর মদদ। বান্দার জন্যে তার সাহায্য সময়মতো ঠিকই এসে উপস্থিত হয়ে যায়। বান্দা যদি সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করে, সবর করে তাহলে তার জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত। যে যেমন ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবেনই তাতে শত্রুসেনার দল, ষড়যন্ত্রকারীরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতো ক্ষমতাশালীই হোক না কেন। এদিকে ফেরাউন, তার সভাসদ, প্রশাসন, কর্মচারী ও ছোটখাটো নেতারা পর্যন্ত বুঝে ফেললো যে, এই হত্যাকান্ড মূসা (আ.)-এর কাজ, শুধু তা-ই নয়, তারা আরো বুঝতে পারলো যে, এই ঘটনা তো বিদ্রোহের পূর্বাভাস। যদি তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত করে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, যদি ঘটনার হোতাদের এক্ষুণই দমন না করা হয়, তাহলে বড়ো ধরনের কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তারা এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিবেচনা করলো, এটাকে ফেরাউন তার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে হুমকি মনে করলো, এ কারণে তারা বিষয়টি নিয়ে জরুরী মিটিংয়ে মিলিত হয়েছে। তারা যদি এটাকে সাধারণ হত্যাকান্ডের মতো বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা মনে করতো তাহলে তারা প্রশাসনিকভাবে এমন জরুরী মিটিং ডাকতো না। ফেরাউন তার লোকজন নিয়ে মিটিং করে আর আল্লাহ তায়ালা কি তার প্রিয় বান্দাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন? কিছুতেই না। প্রশাসনিকভাবে ফেরাউনের গৃহিত সিদ্ধান্ত বানচাল করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকেই একজন লোককে বাছাই করে নিলেন। সে গিয়ে ফেরাউনের বাহিনী পৌছানোর আগেই মূসা (আ.)-কে সবকিছু জানিয়ে দিলো। এই হলেন সেই ব্যক্তি যার কথা সূরা মোমেনের ২৮ নং

আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'ফেরাউনের দলেরই একজন ঈমানদার ব্যক্তি .... যে তার ঈমান গ্রহণের কথা গোপন করে রেখেছিলো'।

'অতপর সে ভীত ও আতংকিত অবস্থায় শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো .....। (আয়াত ২১)

আয়াতে মূসা (আ.)-এর মিশর থেকে বের হওয়ার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে মানুষ হিসেবে কোনো ঘটনা থেকে প্রভাবিত হওয়ার মানবীয় চরিত্র, ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এদিক সেদিক তাকানো, তাড়াহুড়া করা এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কারণে শংকিত হওয়ার মানবীয় প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাথে সাথে বিপদে আপদে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়া, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা দেখছেন– এটা মনে করে তাঁর কাছেই বিপদ থেকে মুক্তি দানের জন্যে দোয়া করার মতো ঈমানী বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনও আমরা তার মাঝে স্পষ্ট দেখতে পাই।

একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে, কোনো রকম সহায় সম্বল ছাড়া সৈরাচারী শাসকের দেয়া হুলিয়া মাথায় নিয়ে সম্পূর্ণ আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে তিনি শহর ছেড়ে মাদইয়ানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

'যখন সে (মিশর ছেড়ে) মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো ....।' (আয়াত ২২)

মূসা (আ.) এগিয়ে চলছেন মাদইয়ান অভিমুখে। সংগী সাথীহীন একাকী মরুভুমীর পথ ধরে তিনি চলছেন। ফেরাউনী ষড়যন্ত্রের স্বীকার মূসা (আ.) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় মিশর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। অচেনা অজানা পথ, কোনো পথ প্রদর্শক নেই। কোনো নির্দৃষ্ট গন্তব্য নেই, দুনিয়াবী কোনো সহায় নেই, সম্বল নেই। একমাত্র আল্লাহর রহমতের ছাঁয়ায়, তাঁকেই সহায় করে, তাঁর ওপরই ভরসা করে তিনি এগিয়ে চলছেন। একমাত্র আল্লাহর দিকেই তিনি চেয়ে আছেন যে, তিনিই তাকে হেফাযত করবেন, পথ দেখাবেন।

'যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে .... তখন সে বললো, আশাকরি আমার মালিক আমাকে শিঘ্রই সঠিক পথ দেখাবেন।' (আয়াত ২৩)

এখানে আমরা মূসা (আ.)-এর মাঝে দৃঢ়চেতা, অনড় অবিচল এক প্রত্যয়ী চরিত্র খুঁজে পাই। ফেরাউনের জাতি, তার আর্মি-পুলিশ, রাজ কর্মচারীরা ওঁৎ পেতে আছে তাকে শায়েস্তা করার জন্যে। ব্যক্তিগত শত্রুতা, বিদ্বেষ সব ভুলে মূসাকে দমন করার ব্যাপারে আপ জাতা সবাই একযোগে মাঠে নেমেছে। কারণ শৈশব থেকে মূসা (আ.)-এর অনেক ব্যাপারেই তাদের আপত্তি ছিলো। তবে উপযুক্ত সুযোগ না পাওয়ায় তারা কিছু করতে পারেনি। আজ তারা সূবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েছে, তারা এতোদিনের শোধ আদায়ের সুযোগ পেয়েছে। অপরাধী ও হত্যাকারী হিসেবে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার এই সুযোগে তাদের মনের সকল ক্ষোভ আজ মেটাতে চায়। কিন্তু সারা পৃথিবীর ষড়যন্ত্রকারীরা একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র পাকালেই বা কি হবে! তার ওপর তো রয়েছে আল্লাহর কুদরতী হাত! আর এই কুদরতী হাত কিছুতেই তাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত নয়। এই কুদরতী হাত তাকে সকল ষড়যন্ত্র, সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে নিরাপদে মাদইয়ান উপকুলে এনে হাজির করে।

মাদইয়ান এসে আশ্রয় পেলেন মূসা (আ.)

অবশেষে যখন সে মাদইয়ান (উপকুলে) একটি পানির কুপের কাছে পৌছলো তখন সেখানে সে অনেক মানুষ দেখতে পেলো, যারা তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে .... তাদের অদূরে সে দু'জন রমণীকে দেখতে পেলো .... সে তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে দিলো .... হে আমার মালিক! যে নেয়ামত ....। (আয়াত ২৩-২৪)

এক সুদীর্ঘ সফর শেষে মূসা (আ.) মাদইয়ান এসে পৌঁছেছেন। তিনি এখন ক্লান্ত শ্রান্ত, তার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, একটু আরামের দরকার। কিন্তু তিনি এখানে এসে এমন এক অনাকাংখিত দৃশ্য দেখলেন, যা দেখে কোনো ভদ্র সভ্য বিবেকবান মানুষ চুপ থাকতে পারে না। বিশেষ করে লোকটি যদি হন মূসা (আ.)-এর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, আল্লাহর নবী– তাহলে সেই দৃশ্য দেখে তিনি কিভাবে চুপ করে থাকবেন!

তিনি দেখলেন রাখালেরা তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ভীড়ের কারণে পশুদের পানি পান করাতে না পেরে দু'জন রমনী অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সেদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। ভদ্র, সভ্য, শালীন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হলে তো উচিৎ ছিলো প্রথমে নারীদেরকে তাদের কাজ সেরে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া। কিন্তু সুবিধাবাদী চিন্তাধারা থাকলে মানুষের মধ্য থেকে এরকমই মনুষ্যত্ববোধ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে মূসা (আ.) চাচ্ছিলেন গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নিতে। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। এই ধরনের অসভ্য, অমানবিক দৃশ্য তার জাগ্রত বিবেক কিছুতেই মেনে নিলো না। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার'? অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পশুদেরকে পানি পান না করিয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

তারা বললো,

'যতোক্ষণ এই রাখালরা এদের পশুদের সরিয়ে না নেবে, ততোক্ষণ আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারবো না, আমাদের পিতা তো বৃদ্ধ মানুষ, তাই (তিনি আসতে পারেন না বলে) আমরাই এসেছি।'

এখন মূসা (আ.) ঘটনার আসল রহস্য বুঝতে পারলেন, তিনি বুঝতে পারলেন শালীনতা, লজ্জাশীলতা ও রমণীসুলভ দুর্বলতাই এদের দূরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ। তাদের আসতে হয়েছে এ কারণেই যে, তাদের বাবা খুবই বৃদ্ধ মানুষ, যার পক্ষে রাখাল বা সবল পুরুষদের মতো খাটাখাটনি করা সম্ভব নয়। তাই মূসা (আ.) এগিয়ে এলেন, মানবিকতা ও সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দৃশ্যটি যেমন হওয়া উচিৎ ছিলো, তিনি দৃশ্যটিকে সেই রূপে রূপান্তরিত করতে এগিয়ে এলেন।

মূসা (আ.)-এর অবস্থাটা একটু চিন্তা করে দেখুন। এই এলাকায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন, পরিচিতজন বলতে এখানে তার কেউই নেই, সুবিধা অসুবিধায় একটু সাহায্য সহযোগিতা করার মতোও তার কোনো বন্ধু নেই, কোনো ধরনের সফর সামগ্রী ছাড়া সম্পূর্ণ পায়ে হেটে তিনি এসেছেন, শত্রুরা তাকে পেছন থেকে ধাওয়া করছিলো, এমনকি তাকে তারা ধরতে পারলে হত্যা করে ফেলতো .... এতো কঠিন পরিস্থিতি, প্রতিকুল অবস্থাও তাকে তার মানবতাবোধ ও দায়িত্ববোধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি নারীত্বের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে দিলেন।

ঘটনাটি মূসা (আ.)-এর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি সত্ত্বেও তার অভিব্যক্তিতে, তার চলনে বলনে, আচার আচরণে এমন এক ধারালো ব্যক্তিত্বের ছাঁপ ছিলো যে, তিনি যখন ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন, তখন তাকে বাধা দেয়া মতো, তার সামনে দাঁড়ানোর মতো দুঃসাহস কারো হয়নি। শারিরীক, চারিত্রিক এবং আত্মিক শক্তির সমন্বয়ে এমন এক অভিব্যক্তি তার মাঝে ফুটে উঠেছে যে, রাখালরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তবে শারীরিক দিকটির চেয়ে চারিত্রিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে অর্জিত আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তির দিকটিই এখানে প্রধান, কারণ মানুষ এটিকেই বেশী ভয় পায়, এতেই বেশী প্রভাবিত হয়, এই ধরনের ব্যক্তিত্বকেই বেশী সমীহ করে।

'তারপর সরে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো।'

এতে বোঝা যায় তখন গ্রীষ্মকাল ছিলো। কিন্তু প্রচন্ড রোদ, মরুভূমি অঞ্চলের বালুকাময় পথে এতো দীর্ঘ সফরেও যে মূসা (আ.) এতোটুকু ক্লান্ত হননি– এটা তার পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু চরিত্রও তুলে ধরে। তিনি গাছের ছায়ায় বসে দোয়া করলেন,

হে আমার মালিক, (মানুষের কল্যাণকামি চরিত্ররূপী) যে নেয়ামত তুমি আমাকে দিয়েছো, আমি নিজেই এখন সেই ধরনের কল্যাণ (কামী একজন মানুষ)-এর প্রয়োজন বোধ করছি।'

গাছের ছায়ায় বসে তিনি আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় চাচ্ছিলেন। এ দোয়া ছিলো তার হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা দোয়া, 'হে আমার মালিক! তুমি তো দেখছো আমি মোহাজের অবস্থায় আছি, আমি একা, আমি দুর্বল, আমি তোমার দয়া, রহমত করুনার খুবই মুখাপেক্ষী। মূসা (আ.)-এর দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে কবুল হয়ে গেলো। তিনি তাকে একটি আশ্রয় ...., একটি ঠিকানা দান করলেন,

'সেই দু'জন রমণীর একজন লজ্জাবনত অবস্থায় তার কাছে এসে বললো, আপনি যে আমাদের পশুদের পানি পান করিয়ে দিয়েছেন আমার পিতা আপনাকে তার পারিশ্রমিক দিতে ডাকছেন।'

ইয়া আল্লাহ! কী শান তোমার! তুমি তোমার বান্দাকে কতো মমতাময় রহমতের কোলে লালন করো। বৃদ্ধার ডাকের মধ্য দিয়ে আরশে আযীমের মালিকের দরবারে দোয়া কবুল হওয়ার বাস্তব প্রমাণ এসে হাযির হলো। যথেষ্ঠ ইযযত সম্মানের সাথে মূসা (আ.) একটি ঠিকানা পেলেন। শুধু তা-ই নয়, সাথে আরো পেলেন বিবাহের পয়গাম, যালেমদের হাত থেকে নিষ্কৃতি। কেননা এই অঞ্চল ফেরাউনের সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

যে রমণী তার বাবার প্রস্তাব নিয়ে মূসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন, এখানে তার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চাল চলনও একটু আলোচনার দাবী রাখে। তিনি তার চাল চলনে, কথাবার্তায় এবং বাবার প্রস্তাব পেশ করার সময় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীর মতোই যথেষ্ট শালীনতা বজায় রেখেছেন। তার আচরণে ছিলো রমণীসুলভ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বহিঃপ্রকাশ। তার মধ্যে কোনো রকম কপটতা কিংবা অশালীনতার ছোঁয়াও ছিলো না। যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে স্পষ্ট ভাষায় তিনি শুধু তার বাবার দেয়া প্রস্তাবটা মূসা (আ.)-এর কাছে পৌছে দিলেন। প্রয়োজনে নারী পুরুষের কথা বলার ক্ষেত্রে শরীয়া নির্ধারিত পন্থায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি শুধু তার বাবার প্রস্তাবটুকু পেশ করেই ক্ষান্ত থাকলেন। তার সেই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি উপস্থাপন করতে গিয়ে কোরআন বলছে,

'আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন ....।'

আমরা তার উচ্চারীত সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর মধ্যেই লজ্জাশীলতা, বিনয় ও কপটতাহীন স্পষ্টভাষীতার প্রমাণ পাই। তার কথার মাঝে কোনো রকম অতিরঞ্জন নেই, অপ্রয়োজনীয় শব্দ নেই। এটিই একজন শালীন, সভ্য রুচিশীলা ও বুদ্ধিমতি নারীর পরিচয় বহন করে। তার কথায় যেমন অতিরঞ্জন বা অপ্রয়োজনীয় কথা নেই তেমনি জড়তা বা অস্পষ্টতাও নেই। তিনি সবচেয়ে কম কথা বলে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তার বাবার প্রস্তাবটি পেশ করেছেন।

ঘটনার এই অংশটি কোরআন এখানেই সমাপ্তি করেছে। মূসা (আ.) এই প্রস্তাব পেয়েই বুঝে ফেলেছেন যে, এটা আসমান থেকে তার দোয়া কবুলের বাস্তব প্রমাণ। এরপর কোরআন আমাদেরকে নিয়ে যায় মূসা (আ.) ও সেই রমণীর বৃদ্ধ বাবার কথপোকথনের দৃশ্যে, তবে এখানে সেই বৃদ্ধার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

'মূসা যখন তাঁর কাছে এলো ও তাকে সমস্ত ঘটনা জানালো, তখন বৃদ্ধ তাকে বললো, তোমার ভয় নেই, তুমি অত্যাচারী জাতির কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে।'

কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন সুপরিচিত নবী হযরত শোয়ায়বের ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াছরুন।(১)

হযরত মূসা (আ.)-এর এ সময় খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন যেমন ছিলো, তেমনি নিরাপদ আশ্রয়েরও প্রয়োজন ছিলো। তবে দেহের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন যতোটা ছিলো, তার মনের জন্যে নিরাপত্তার আশ্বাসের প্রয়োজন ছিলো তার চেয়েও অনেক বেশী। এজন্যেই আয়াতে সাক্ষাতের দৃশ্যে শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধের এই উক্তিটাই সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমার ভয় নেই।' হযরত মূসা (আ.)-এর বৃত্তান্ত শোনার পর বৃদ্ধ যে মন্তব্য করেছেন, এটা তার প্রথম বাক্য। তিনি সবার আগে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে হযরত মূসাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন। এরপর এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তুমি অত্যাচারী জাতির কবল থেকে রেহাই পেয়েছো। কেননা মাদইয়ানের ওপর তাদের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই এবং মাদইয়ানে অবস্থানকারীদের কোনো ক্ষতি সাধন বা কষ্ট দেয়ার সাধ্য তাদের নেই।

বিয়ে করলেন হযরত মূসা (আ.)

এরপর আমরা এক সরলমতি ও সদাচারী নারীকণ্ঠ শুনতে পাই 'সে দুই মহিলার একজন বললো, হে পিতা, ওকে তুমি মজুর হিসাবে নিয়োগ করো। এরূপ বিশ্বাসী ও শক্তিমান ব্যক্তিকে নিয়োগ করা তোমার জন্যে উত্তম।'

এ মহিলা ও তার বোন অনেক কষ্ট করে মেষ পালন করতো। এ জন্যে তাদের উভয়কে পুরুষদের ভীড় ঠেলে পুকুরে মেষকে পানি খাওয়াতে যেতে হতো। যেসব মহিলা পুরুষদের কাজ করে, তাদের এ ধরনের কষ্টকর পরিশ্রম করতেই হয়। সে ও তার বোন এসব কাজের জন্যে খুবই বিব্রতবোধ করতো এবং পর্দানশীন সতী সাধ্বী নারী হিসেবে গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করার ব্যবস্থা হোক– এটা মনে প্রাণে কামনা করতো। যাতে মেষ পালকে পুকুরে পানি খাওয়াতে ও মাঠে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে বেগানা পুরুষদের মুখোমুখি হতে না হয়। সতী সাধ্বী, সরলমতি ও পরিচ্ছন্নমনা মহিলারা পুরুষদের ভীড়ের ভেতরে চলাফেলা করায় কখনো স্বস্তি অনুভব করে না এবং এই চলাফেরার ফলে ঘটিত মর্যাদাহানির জন্যে অস্থিরতা বোধ করে।

একদিন মাদইয়ানে এক নবাগত বিতাড়িত প্রবাসী যুবককে দেখা গেলো। যুবকটি সুঠামদেহী, শক্তিমান ও বিশ্বাসী। সে এতোটা শক্তিমান যে, অন্যান্য রাখালরা তাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলো, তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিলো ও তাদের দু'বোনের মেষদের পানি খেতে দিচ্ছিলো। যুবক বহিরাগত

(১) ইতিপূর্বে এই তাফসীরের এক জায়গায় আমি বলেছি যে, এই ব্যক্তি হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালাম। আবার অন্যত্র বলেছি যে, তিনি নবী শোয়ায়ব হতে পারেন, কিংবা অন্য কেউও হতে পারেন, কিন্তু এখন আমার মনে হয়, খুব সম্ভব তিনি হযরত শোয়ায়ব নন; বরং মাদইয়ানের অন্য কোনো প্রধান ব্যক্তি। আমার এ অভিমত পোষণের কারণ এই যে, হযরত শোয়ায়বের জাতি তো তার চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁকে অস্বীকার করার কারণে। এই ধ্বংসযজ্ঞের পর তাঁর জাতির মধ্য থেকে যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো ও আযাব থেকে বেঁচে গিয়েছিলো, তারা ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে থাকার কথা নয়। এখন এই প্রবীণ ব্যক্তি যদি নবী শোয়ায়ব হয়ে থাকেন এবং তাঁর জাতির মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে ও আযাব থেকে রেহাই পেয়েছে তাদে মধ্যে বসবাস করেন, তাহলে এই মোমেনদের চরিত্র কখনো এমন হতে পারে না যে, তাদের নবীর মেয়েদের আগে তারা নিজেদের পশুকে পানি খাওয়াবে। তাছাড়া এই প্রবীণ ব্যক্তি তাঁর জামাতা হযরত মূসাকে কোনো সদুপদেশ দিয়েছেন বলে কোরআনে উল্লেখ নেই। অথচ তিনি তার কাছে দশ বছর অবস্থান করেছেন। তিনি নবী শোয়ায়ব হয়ে থাকলে আমরা এ দীর্ঘ সময়ে তার কাছ থেকে নবীসুলভ অনেক কথাবার্তাই শুনতে পেতাম।

হলেও তাকে বেশ শক্তিশালী দেখাচ্ছিলো। অথচ বহিরাগত মানুষ শক্তিশালী হলেও দুর্বল ও প্রভাবহীন হয়ে থাকে। মহিলার দৃষ্টিতে সে অত্যন্ত বিশ্বাসী মনে হয়েছিলো। কারণ সে যখন তার কাছে তার পিতার দাওয়াত পৌছাতে গিয়েছিলো, তখন তার আনত দৃষ্টি ও সংযত ভাষা সে লক্ষ্য করেছিলো। তাই সে তার পিতাকে পরামর্শ দিলো যুবককে বেতনভুক মজুর হিসেবে নিয়োগ করতে। যাতে তার ও তার বোনের বাইরে গিয়ে পুরুষদের ভীড়ে ঠেলাঠেলি করে অসর্তকজনকভাবে কাজকর্ম করতে না হয়। কেননা যুবকটি কাজকর্মের ক্ষেত্রে যেমন সুস্থ সবল ও সুযোগ্য, পণ্যসামগ্রীর ব্যাপারে তেমনি সৎ ও বিশ্বাসী প্রতীয়মান হয়েছিলো। কারণ বেগানা মহিলাদের সম্ভ্রমের প্রতি যে ব্যক্তি এতো শ্রদ্ধাশীল, সে অন্যান্য সামগ্রীর ব্যাপারেও সৎ ও বিশ্বাসী না হয়ে পারে না। পিতাকে এই পরামর্শ দেয়ার সময় এই মহিলা কোনো রকম দ্বিধা সংকোচও বোধ করেনি, কোনো খারাপ ধারণা বা কোনো অপবাদের শিকার হবার আশংকাও করেনি। তার মন ছিলো কলুষমুক্ত এবং অনুভূতি ছিলো পরিচ্ছন্ন। তাই পিতাকে পরামর্শ দেয়ার সময় তার কোনো ভয় বা দ্বিধাসংকোচ ছিলো না, সে কোনো রকম জড়তা বা ইতস্তত বোধ করেনি।

এ প্রসংগে হযরত মূসা (আ.)-এর শক্তির প্রমাণ হিসাবে তফসীরকাররা যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, কুয়াটা যে পাথর দিয়ে ঢাকা থাকতো, তা বিশ চল্লিশ বা আরো বেশী সংখ্যক লোক মিলিত হয়েও তুলতে পারতো না। সেই পাথর হযরত মূসা (আ.) একাই তুলে ফেলেছিলেন। আসলে কুয়া মোটেই ঢাকা ছিলো না, কেবল রাখালরা পশুদেরকে পানি খাওয়াচ্ছিলো। হযরত মূসা (আ.) তাদের সরিয়ে দিয়ে মহিলা, দ্বয়ের পশুদের পানি খাইয়েছিলেন, কিংবা রাখালদের সাথে থেকেই নিজে পানি খাইয়েছিলেন। অনুরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর সততার প্রমাণ হিসেবে যেসব বর্ণনা তাফসীরকাররা উদ্ধৃত করেছেন, তাও নিষ্প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ কেউ বলেছেন যে, মহিলাটার ওপর হযরত মূসার চোখ পড়ে যায় কিনা, এই আশংকায় তিনি তাকে তার পেছনে পেছনে চলতে ও পথ দেখাতে অনুরোধ করেন। কারো কারো মতে, প্রথমে মহিলা হযরত মূসা (আ.)-এর আগে আগে চলতে থাকে, বাতাসের ঝাপটায় মহিলার হয়তো পায়ের গোছার ওপর থেকে কাপড় সরে যায়। তখন হযরত মূসা তাকে তার পিছু পিছু হাঁটতে বলেন। এ সবই নিষ্প্রয়োজন কৃত্রিমতা এবং আদৌ অস্তিত্ব নেই এমন কাল্পনিক খটকা নিরসনের বৃথা চেষ্টা। হযরত মূসা (আ.) যেমন সংযত দৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার অধিকারী ছিলেন, মহিলাও ছিলো তেমনি। এ ধরনের একজন পুরুষ ও মহিলার সাক্ষাতের সময় সততা ও সতীত্ব প্রমাণ করার জন্যে এতো সব কৃত্রিমতার কোনোই প্রয়োজন হয় না। সততা ও সতীত্ব কোনো রকম কৃত্রিমতা ছাড়াই সাধারণ কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।

বৃদ্ধ তার মেয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সম্ভবত তিনি টের পেয়েছিলেন যে, তার কথা ও হযরত মূসা (আ.)-এর মনে পারস্পরিক আস্থা এবং পবিত্র ও স্বাভাবিক আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে, যা একটা পরিবার গড়ার জন্যে উপযুক্ত। কোনো পুরুষের ভেতরে যখন শক্তি সামর্থ ও সততা এই দুটো গুণেরই সমাবেশ ঘটে, তখন তার প্রতি একজন সতী সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা যুবতীর আকৃষ্ট হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই এই বৃদ্ধ যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তার দুই কন্যার একজনকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং এর বিনিময়ে তার ওপর তার সেবা ও তার গৃহপালিত পশুগুলোকে আট বছর যাবত লালন পালনের দায়িত্ব আরোপ করলেন, তখন তিনি আসলে দুটো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সমন্বয় ঘটালেন। এই সাথে বৃদ্ধ এ কথাও বললেন যে, মূসা ইচ্ছা করলে আরো দু'বছর এ কাজ অব্যাহত রাখতে পারেন, কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নয়। এটা তার ইচ্ছাধীন।

বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী সমাজের দৃষ্টিভংগি

'বৃদ্ধ বললো, আমি তোমার সাথে আমার এই দুই কন্যার একজনকে বিয়ে দিতে চাই .....' (আয়াত-২৭)

এভাবে সেই প্রবীণ ব্যক্তি তার দুই কন্যার একজনকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কোন কন্যাকে, সেটা অনির্দিষ্ট থাকলেও তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে, কন্যা নির্দিষ্টই আছে। যুবকের মনের সাথে যে কন্যার মনের মিল ও আস্থা জন্মে গিয়েছিলো সেই কন্যাই ছিলো পাত্রী। তিনি নির্দ্বিধায় ও নিসংকোচেই প্রস্তাবটা দিলেন। কেননা বিয়ের প্রস্তাব দেয়াতে লজ্জা-সংকোচের কিছু নেই। বিয়ে হচ্ছে একটা পরিবার গড়ার ব্যবস্থা। তাতে লজ্জা-শরম, দ্বিধা-সংকোচ, দূর থেকে ইশারা ইংগিত ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে সমাজে এগুলো পরিলক্ষিত হয় তা সরল স্বাভাবিক রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত ও বিকৃত সমাজ। সে সমাজে এমন সব কৃত্রিম, অন্যায় ও অশোভন রীতিপ্রথা মেনে চলা হয়, যা পিতা বা অভিভাবককে উদ্যোগী হয়ে নিজের বোন, মেয়ে বা আত্মীয়ার জন্যে নিজের পছন্দসই ধার্মিক চরিত্রবান পাত্রের কাছে প্রস্তাব দিতে দেয় না। শুধু পাত্র, তার অভিভাবক বা প্রতিনিধিকেই প্রস্তাব দিতে হয় এবং পাত্রীর পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। এহেন বিকৃত সমাজ ব্যবস্থারই কুফল এই যে, কোনো বিয়ের প্রস্তাব বা উদ্দেশ্য ছাড়াই যুবক যুবতীরা স্বাধীনভাবে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে, কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে এবং পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়। অথচ যে-ই বিয়ের প্রস্তাব আসে বা বিয়ের কথা উল্লেখ করা হয়, অমনি কৃত্রিম লজ্জার ঢল নামে এবং কৃত্রিম বাধা এসে স্বচ্ছতা, সরলতা ও স্পষ্টতার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

রসূল (স.)-এর আমলে পিতারাই কন্যাদের পছন্দসই পাত্রদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন। এমনকি মহিলারাও স্বয়ং রসূল (স.)-এর কাছে বা তাদের আগ্রহী পাত্রের কাছে নিজেদের বিয়ের প্রস্তাব দিতেন। এ কাজটা সম্পন্ন হতো স্পষ্টবাদিতা ও ভদ্রতার সাথে এবং পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মতভাবে। এতে কোনো পক্ষের সম্মানও ক্ষুণ্ন হতো না। কেউ লজ্জাও বোধ করতো না। হযরত ওমর (রা.) স্বীয় কন্যা হাফসাকে প্রথমে হযরত আবু বকরের সাথে বিয়ে দিতে চাইলে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন এবং পরে হযরত ওসমানকে প্রস্তাব দিলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে যখন রসূল (স.)-কে ব্যাপারটা জানালেন, তখন তিনি তাকে এই বলে উল্লসিত করলেন যে, হয়তো আল্লাহ তায়ালা হাফসার ভাগ্যে সে দু'জনের চেয়েও উত্তম মানুষ জোটাবেন। অতপর রসূল (স.) নিজেই হাফসাকে বিয়ে করলেন। অপর এক মহিলা নিজেকে রসূল (স.)-এর কাছে সোপর্দ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। তখন সেই মহিলা রসূল (স.)-কে নিজের অভিভাবক নিয়োগ করলেন এবং তিনি যাকে পছন্দ করেন তার সাথেই তাকে বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করলেন। রসূল (স.) তাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলেন যে কোরআনের মাত্র দুটো সূরা শিখেছিলো। সে এ দুটো সূরা মহিলাকে শেখালো। এটাই ছিলো তার বিয়ের দেনমোহর।

এহেন সরল, দিল খোলা স্বচ্ছ পরিবেশেই ইসলামী সমাজের যাত্রা শুরু হয় এবং তার পরিবার গঠন ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা কৃত্রিমতার স্থান সেখানে ছিলো না।

মাদইয়ানের প্রবীণ ব্যক্তি এভাবেই হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আচরণ করলেন। মূসার নিকট নিজ কন্যাকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন এই শর্তে যে, তিনি আট বছর তার গৃহভৃত্য

হিসেবে কাজ করবেন। তবে তাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তাকে বেশী কঠিন কাজের দায়িত্ব দেবেন না এবং তার কষ্ট বাড়াবেন না। তিনি আশান্বিত ছিলেন যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় মূসা (আ.)-এর সাথে ব্যবহারে ও প্রতিশ্রুতি পালনে অত্যন্ত আন্তরিক ও সৎ প্রমাণিত হবেন। নিজের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি চমৎকার বিনয় এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতার পরিচয় দিলেন। তিনি নিজেকে ভুলক্রটির উর্ধ্বে গণ্য করেননি এবং নিজের সততা নিয়ে গালভরা বুলি আওড়াননি। তবে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ভরসা করে আশা প্রকাশ করেন যে, তিনি সৎ প্রমাণিত হবেন।

মূসা তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিয়ের আক্দ সম্পাদন করলেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী মানলেন,

'মূসা বললো, ঠিক আছে, এটা আপনার ও আমার মাঝে স্থির থাকলো। দুই মেয়াদের যেটাই আমি সমাপ্ত করি, আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি হবে না। আর আমরা যা বলছি সে সম্পর্কে আল্লাহ সাক্ষী আছেন।'

মনে রাখা দরকার যে, চুক্তি ও চুক্তির শর্তাবলীর ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা, জড়তা বা লাজলজ্জার অবকাশ নেই। এ জন্যেই হযরত মূসা (আ.) প্রবীণ ব্যক্তির উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ও চুক্তি সম্পাদন করলেন। তারপর এর ব্যাখ্যা দেন এভাবে, 'দুই মেয়াদের যেটাই আমি সমাপ্ত করি, আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি হবে না।' অর্থাৎ আমি আট বছরের মেয়াদ সমাপ্ত করি অথবা দশ বছর পূর্ণ করি, আমার ওপর দায়িত্ব চাপানোর ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়িও হবে না এবং দশ বছর পূর্ণ করতেও বাধ্য করা হবে না। কেননা আট বছরের চেয়ে বেশী কাজ করা আমার ইচ্ছাধীন। 'আর আমরা যা-ই বলি, আল্লাহ সে সম্পর্কে সাক্ষী আছেন।' অর্থাৎ আল্লাহর নামে চুক্তিতে আবদ্ধ দুই পক্ষের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থায় আল্লাহ তায়ালাই চূড়ান্ত কর্তৃত্বশীল ও সাক্ষী।

হযরত মূসা (আ.) নিজের স্বভাবসুলভ সরলতা ন্যায়নিষ্ঠা এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এ কথা বলেন। মূলত তাঁর নিয়ত ছিলো, দুই মেয়াদের মধ্যে যেটা ভালো সেটা, পূর্ণ করবেন। বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূল (স.) বলেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) বৃহত্তর মেয়াদই পূর্ণ করেছিলেন। এভাবে হযরত মূসা (আ.) স্বীয় শ্বশুরালয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করলেন। ইতিপূর্বে ফেরাউনের ষড়যন্ত্র থেকেও তিনি রক্ষা পেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, কোন মহৎ উদ্দেশ্য এসবের পেছনে নিহিত ছিলো। কাহিনীর এই অংশ আমরা এখানেই শেষ করছি। কারণ এর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে কোরআন নীরবতা পালন করেছে।

মূসা (আ.)-এর প্রত্যাবর্তন

এরপর হযরত মূসা (আ.) দশ বছর মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এই দশ বছরের কোনো বিবরণ কোরআনে নেই। এরপর কাহিনীর তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। হযরত মূসা (আ.) মেয়াদ পূর্ণ করার পর নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে মাদইয়ান থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে যাত্রা শুরু করলেন। বিগত দশ বছর ধরে যে পথে তিনি একা একাই চলাফেরা করেছেন, সেই পথে আজ তিনি সপরিবারে রওনা হয়েছেন।

তবে এই প্রত্যাবর্তন সফরের পরিবেশ প্রথম সফরের পরিবেশ থেকে ভিন্নতর। ফেরার পথে তিনি এমন এক ঘটনার সম্মুখীন হলেন, যা কল্পনাও করতে পারেননি। এই ঘটনার ফলস্বরূপ স্বয়ং মহান আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বললেন, তাকে সম্বোধন করলেন এবং তাকে সেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন, যার জন্যে তিনি তাকে এতোদিন সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং প্রশিক্ষণ

দিয়েছেন। এটা ছিলো হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে প্রেরণের ঘটনা। তাকে এই বার্তা সহকারে পাঠানো হয় যে, সে যেন তার সাথে বনী ইসরাইল গোত্রকে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক না করে এক আল্লাহর এবাদাতের সুযোগ পাবে, দেশের শাসন ক্ষমতা তাদের হস্তগত হবে,।

হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবলের শত্রুতে পরিণত হবেন, ও দুশ্চিন্তার কারণ হবেন, শেষ পর্যন্ত তার হাতে তাদের ধ্বংস সংঘটিত হবে।

'অতপর যখন মূসা মেয়াদ পূর্ণ করলো এবং স্বীয় পরিবারসহ যাত্রা করলো ....' (আয়াত-২৯-৩৫)

আলোচ্য পর্বের এই দুটো দৃশ্য পর্যালোচনার আগে আমাদের একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন, এই দশ বছরে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যে কিভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনের পথ সুগম করলেন এবং এই সফরেই বা কিভাবে তাঁর যাত্রা সহজ করলেন।

মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর শিশুকাল থেকে আলোচ্য ঘটনা পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালে তার প্রতিটা পদক্ষেপ স্বহস্তে বিন্যস্ত করেছেন, এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। প্রথমে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন যাতে ফেরাউনের পরিবারই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। খোদ ফেরাউনের স্ত্রীর মনে তাঁর প্রতি স্নেহ মমতার সৃষ্টি করে দেন যাতে তিনি তারই শত্রুর কোলে লালিত পালিত হন। শহরে এমন সময় তাকে প্রবেশ করান, যখন সবাই অসতর্ক ছিলো, যাতে তিনি সেই শহরের অধিবাসীদের একজনকে হত্যা করে বসেন। আর তার কাছে ফেরাউন পরিবারের সেই লোকটিকে পাঠান তাঁকে সতর্ক করা ও শহর থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেয়ার জন্যে। তারপর মিসর থেকে মাদইয়ান পর্যন্ত দীর্ঘ মরু পথ ধরে সম্পূর্ণ একাকী ও বিনা সম্বলে যাত্রা করার সময় মূসার সহযাত্রী হন। মাদইয়ানে তাকে সেই প্রবীণ ব্যক্তির সাথে মিলিত করেন, যাতে এই দশটা বছর তার কাছে কাটাতে পারেন এবং সর্বশেষে সেখান থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করান, যাতে এই সুমহান দায়িত্বভার লাভ করেন।

মহান আল্লাহর সম্বোধন ও তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব লাভের আগে প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, তদারকী ও অভিজ্ঞতা অর্জনের এ এক সুদীর্ঘ সময়। এ সময়ে তিনি একদিকে যেমন মহান আল্লাহর অলক্ষ্য তদারকী, স্নেহ ভালোবাসা ও পথনির্দেশনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তেমনি চাপা ক্ষোভ ও আবেগের প্রভাবে আত্মসংবরণ করতে না পারা এবং সেজন্যে অনুতাপ, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন, অর্জন করেছেন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন, একাকিত্ব, প্রবাস, ক্ষুধা এবং রাজপ্রাসাদে রাজপুত্রসুলভ জীবন যাপনের পর মাদইয়ানের মেষ রাখালগিরি ও গৃহভৃত্যগিরির অভিজ্ঞতাও। তা ছাড়া এসব বড় বড় অভিজ্ঞতার মাঝখানে বহু ছোটখাট অভিজ্ঞতা, পরস্পর বিরোধী আবেগ, অনুভূতি, মনের আকস্মিক ঝোঁক ও তাড়না, জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করেন। এ সবই ছিলো পরিণত বয়সে পৌঁছার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন তার অতিরিক্ত।

রেসালাত একটা বিরাট কষ্টকর, বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী দায়িত্ব। যিনি এ দায়িত্ব লাভ করেন তার প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা, বাস্তব জীবন যাপনোপযোগী রুচিবোধ এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান বিবেক ও মনের পথ-নির্দেশিকা।

বিশেষত হযরত মূসা (আ.)-এর রেসালাত সম্ভবত হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের পর কোনো মানুষের ওপর অর্জিত সবচেয়ে গুরুতর দায়িত্ব। কেননা সেকালের সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সিংহাসন ও সবচেয়ে স্থিতিশীল সাম্রাজ্য, সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, বিশ্ববাসীর ওপর জেঁকে বসা সবচেয়ে অহংকারী, সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও সবচেয়ে দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্রাটের কাছে তাকে পাঠানো হয়েছিলো। তার আবির্ভাব ঘটেছিলো চরম লাঞ্ছনাময় ও অবমাননাকর গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ একটা জাতিকে উদ্ধার করার জন্যে। গোলামী মানুষের স্বভাব প্রকৃতি তথা তার জন্মগত সৎ গুণাবলী, উচ্চাকাংখা ও মহত্ত্ব ধ্বংস করে দেয়, নষ্ট করে দেয় অন্যায় এবং পাপাচারের প্রতি তার জন্মগত ঘৃণা ও অরুচিকে। বস্তুত এ ধরনের কোনো জাতিকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ।

যে জাতির কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের একটা প্রাচীন আদর্শ ছিলো, কিন্তু তা থেকে তারা বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং সেই আদর্শ সম্পর্কে তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাদের মন এতোটা সরল, সহজ, নিষ্কলংক ও সুস্থ ছিলো না যে, নতুন আদর্শ সহজেই গ্রহণ করে নেবে। আবার তারা তাদের পুরনো আদর্শেও বহাল ছিলো না। এ ধরনের লোকদের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। আর চিকিৎসার কাজে যদি কোনো ব্যর্থতা, বক্রতা ও ভ্রষ্টতা আসে তবে তাতে তা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে একটা জাতিকে সম্পূর্ণ গোড়া থেকে গড়ে তোলার জন্যেই হযরত মূসাকে পাঠানো হয়েছিলো। তাঁর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল সর্বপ্রথম একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। যার স্বতন্ত্র জীবন পদ্ধতি ছিলো এবং যা নবীদের দ্বারা শাসিত হতো। এভাবে কোনো জাতিকে ভিত্তিমূল থেকে নতুন করে গড়া খুবই কঠিন ও দুরূহ কাজ। সম্ভবত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোরআন এই কাহিনীটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে। একটা আদর্শের ভিত্তিতে একটা জাতিকে কিভাবে গঠন করতে হয়, এই গঠন করার কাজে কী কী আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয়, কী কী ধরনের বিচ্যুতি, বাধাবিপত্তি ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, এ কাহিনী তার পরিপূর্ণ নমুনা বহন করে।

ওদিকে মাদইয়ানের দশ বছরের অভিজ্ঞতা হযরত মূসাকে তার রাজপ্রাসাদে লালিত জীবন এবং ইসলাম প্রচার ও তার কঠিন দায়িত্ববহ জীবনের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়।

প্রাসাদ জীবনের একটা বিশেষ পরিবেশ ও বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। মানুষের মনের ওপর তার একটা বিশেষ প্রভাব ও ছাপ পড়ে– চাই সে যতোই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান হোক না কেন। পক্ষান্তরে নবী রসূল হিসাবে দায়িত্ব পালনের অর্থই হলো সর্বশ্রেণীর জনগণের সাথে মেলামেশা করা ও তাদের আচরণ বরদাশত করা। জনগণের মধ্যে হরেক রকমের মানুষ রয়েছে, যথা ধনী-দরিদ্র, ভাগ্যবান-ভাগ্যাহত, পরিচ্ছন্ন-অপরিচ্ছন্ন, ভদ্র-অভদ্র, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, সবল-দুর্বল, ধৈর্যশীল ধৈর্যহারা ইত্যাদি। পানাহারের বেশভূষায় ও চলাফেরায় দরিদ্র লোকদের বিশেষ আদত অভ্যাস ও রীতিপ্রথা থাকে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের বিচার বিবেচনা ও উপলব্ধি, জীবন সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা করার পদ্ধতি, তাদের কথা বলা ও কাজ করার ধরন এবং তাদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের ভংগি– এসবই স্বতন্ত্র। এসব আদত অভ্যাস– রীতিনীতি বিত্তশালী ও প্রাসাদে লালিত লোকদের কাছে খুবই অসহনীয়। দরিদ্র লোকদের এসব চালচলন ও রীতিনীতির সাথে খাপ খাওয়ানো তো দূরের কথা, চোখ দিয়ে দেখাও তাদের পক্ষে দুসাধ্য। দরিদ্র

লোকদের মন যতই সরল ও সত্যনিষ্ঠ হোক না কেন, সেটা প্রাসাদবাসীর বিবেচনায় আসে না। কেননা দরিদ্রদের বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলনই প্রাসাদবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

নবুওত ও রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে অনেক কষ্ট করতে হয় এবং কখনো অনেক ত্যাগ ও বঞ্চনা স্বীকার করতে হয়। প্রাসাদবাসীরা যতোই তাদের বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাক না কেন, বাস্তব জীবনে যখন প্রকৃত কষ্ট, শ্রম ও বঞ্চনা সহ্য করার প্রশ্ন আসে, তখন তারা সেটা দীর্ঘ সময় সহ্য করতে পারে না।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মূসা যে মানের জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তা থেকে তাকে নীচে নামিয়ে আনতে হবে, তাকে মেষ পালকদের কাতারে শামিল করতে হবে এবং তাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলতে হবে, যাতে সে প্রচন্ড ভয়ভীতি, দুঃখ কষ্ট ও ক্ষুধার যাতনা ভোগ করার পর মেষপালক হয়েও খাদ্য এবং আশ্রয় পাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুভূতি থেকে দারিদ্র ও দারিদ্রক্লিষ্ট লোকদের প্রতি উন্নাসিকতাবোধ, তাদের রীতিনীতি, চাল-চলন, সরলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতি বিরক্তিবোধ, তাদের দারিদ্র, মূর্খতা, জরাজীর্ণ দশা, তাদের সমগ্র আচরণ ঐতিহ্য ও রীতিপ্রথার প্রতি আদর্শবোধ দূর করবেন বলে স্থির করলেন। শিশুকালে যেমন তাকে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন, তেমনি পরিণত বয়সে তাকে জীবনের কর্মময় সাগরে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করলেন, যাতে তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব লাভের আগেই এই দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

এভাবে যখন হযরত মূসা স্বীয় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পালা বিদেশের মাটিতে বসে সমাপ্ত করলেন, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে আবার ফিরিয়ে আনলেন তার স্বদেশের মাটিতে। যেখানে তাকে কাজ করতে হবে এবং রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যে পথ ধরে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পালিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরেই তিনি ফিরে এলেন। একই পথ ধরে এই আশা ও যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? এর প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন।

এমনকি পথের চড়াই উৎরাই সম্পর্কেও তার অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ লাভ করা প্রয়োজন ছিলো। কেননা আল্লাহর নির্দেশে এক সময় তাকে এই পথ ধরেই নিজের জাতিকে নিয়ে যেতে হবে। তাই পথপ্রদর্শকসুলভ গুণাবলী ও অভিজ্ঞতা অর্জন করাও তার জন্যে জরুরী ছিলো। যাতে অন্য কোনো পথপ্রদর্শকের ওপর নির্ভর করতে না হয়। কেননা তার জাতি বনী ইসরাঈলের এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিলো যিনি ফেরাউনের দাসত্বের কারণে চিন্তাশক্তি ও প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেলা জাতিকে ছোট বড় সকল সমস্যার সমাধানে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসাকে নিজ চোখের সামনে গড়ে তুলেছিলেন এবং কিভাবে তাকে তার দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য বানিয়েছিলেন। তাই আসুন, এবার আমরা দেখি কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার এই দায়িত্ব পালনে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন।

'মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করলো এবং সপরিবারে রওনা করলো তখন তূরের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলো'....(আয়াত-২৯)

এখানে লক্ষ্য করেছেন কি, কোন চালিকা শক্তি মূসাকে মেয়াদ শেষে মিসরে ফিরিয়ে আনলো? অথচ সেখান থেকেই তিনি প্রাণ ভয়ে পালিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একজন মানুষকে হত্যাও করেছিলেন। এ জন্যে তার সেখানে ঝুঁকি রয়েছে এবং ফেরাউন যে তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়ে সদলবলে অপেক্ষমাণ রয়েছে, তা কোন কারণে তিনি ভুলে গেলেন?

যিনি এ যাবত তাকে প্রতিটা ধাপ অতিক্রম করে এগিয়ে এনেছেন, একমাত্র সেই মহামহিম আল্লাহ তায়ালাই তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। হয়তো এবার তিনি হযরত মূসাকে পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও জন্মভূমির প্রতি সহজাত আকর্ষণের জন্যেই স্বদেশ ভূমিতে ফিরিয়ে এনেছেন এবং যে ভয়ে তিনি পালিয়েছিলেন, সে ভয়ের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তিনি নিজের সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার জন্যে তাকে প্রথম থেকেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

আল্লাহর সাথে কথপোকথন ও মূসার ওহীপ্রাপ্তি

যে কারণেই হোক, তিনি সপরিবারে স্বদেশের পথে ফিরে যাচ্ছেন। গভীর রাত, ঘোরতর অন্ধকার। তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আর রাতটা যে শীতের রাত, তা আগুনের প্রতি তার আগ্রহ দেখে বুঝা যায়, যাতে ওখান থেকে কিছু আগুন এনে তপ্ত হতে পারেন। এটা হচ্ছে এ পর্বের প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যটা হলো বৃহত্তম অপ্রত্যাশিত ঘটনা,

'মূসা আগুনের কাছে আসামাত্রই তাকে সম্বোধন করা হলো..হে মূসা, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা ......' (আয়াত-৩০)

আসলে তিনি যে আগুন দেখেছিলেন, সেটা এই উদ্দেশ্যেই দেখানো হয়েছিলো। এটাই সেই আহ্বান যা তূর পর্বতের ডান দিকের উপত্যকার পার্শ্ব থেকে ভেসে এসেছিলো। 'পবিত্র স্থানটি' এই মুহূর্ত থেকেই পবিত্র ও কল্যাণময়। এরপর সমগ্র বিশ্বজগত মূসার কাছে আগত আহ্বানের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। 'বৃক্ষ থেকে'– সম্ভবত এই স্থানে এটাই ছিলো একমাত্র বৃক্ষ। 'হে মূসা, আমিই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালা।'

সেই নিঝুম উপত্যকায়, নিস্তব্ধ রাতে হযরত মূসা প্রত্যক্ষ সম্বোধন শুনতে পেলেন। তার পার্শ্বে অবস্থিত গোটা প্রকৃতি তা দ্বারা প্রতিধ্বনিত হলো। গোটা আকাশ ও পৃথিবী মুখরিত হলো। আমরা জানি না, তিনি কিভাবে, কোন অংগ দিয়ে এবং কোনো দিক থেকে তা শুনতে পেলেন। তবে এ ধ্বনিতে যে গোটা প্রকৃতির রাজ্য প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো তা জানি। এও জানি যে, তাকে এ আওয়ায শ্রবণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। কেননা তাকে আল্লাহর চোখের সামনেই এমনভাবে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করা হয়েছিলো যে, তিনি এই মুহূর্তটার জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন।

বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে এ আওয়ায সংরক্ষিত করা হলো। মহান আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় স্থানটি পবিত্র ও কল্যাণময় হয়ে রইলো। এই জ্যোতি দ্বারা সম্মানিত উপত্যকা চিরদিনের জন্যে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে রইলো। আর হযরত মূসা সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরবর্তী যে নির্দেশ দিলেন তা হলো,

'তোমার লাঠিটা নিক্ষেপ করো।'

মূসা আপন প্রভুর এই নির্দেশ মান্য করে লাঠিটা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কী ঘটলো? নিক্ষেপ করার পর তা আর তার সেই লাঠি বলে মনে হলো না, যা তার সাথে দীর্ঘদিন যাবত রয়েছে এবং যাকে তিনি নিশ্চিতভাবেই চিনেন। বরং দেখলেন, তা দ্রুতগামী এক সাপে পরিণত হয়েছে, যা আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও ছোট সাপের মতো দ্রুত গতিশীল,

'যখন তাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখলো, অমনি ছুটে পালালো এবং পেছনে ফিরেও তাকালো না।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। স্বভাবগত আবেগপ্রবণতার কারণে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি ছুটে পালালেন এবং পেছনে ফিরে তাকালেন না। অর্থাৎ তিনি ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্যে এবং এই বিরাট বিস্ময়ের মর্ম উদ্ধারের জন্যে ওদিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেও দেখলেন না। আবেগপ্রবণ লোকদের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাযুক মুহূর্তেই এটা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর পর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশ শুনলেন,

'হে মূসা, সামনে এগিয়ে যাও, ভয় পেয়ো না, তুমি নিরাপদ।'

মানুষের মনে ভয় ও নিরাপত্তাবোধ একটার পর একটা পালাক্রমে আসতে থাকে এবং জীবনের প্রত্যেকটা স্তর এই দুটো জিনিস দ্বারা সর্বক্ষণ ঘেরাও হয়ে থাকে। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র এই পরিস্থিতি বিরাজ করে। মানুষের মনে এরূপ সার্বক্ষণিক উদ্বেগ লেগে থাকুক এটাই মহান স্রষ্টার ইচ্ছা। দুনিয়ার জীবনে এটা তারই নির্ধারিত ভাগ্যলিপি। কেননা বনী ইসরাঈলের সুদীর্ঘ দুর্বিষহ জীবনের অবসান ঘটিয়ে উন্নতি ও সমৃদ্ধির উদ্বোধন ঘটানোর জন্যে ভীতির পর নির্ভীকতা ও নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিলো। এটা ছিলো মহান স্রষ্টারই কৌশল এবং তাঁরই নির্ধারিত ব্যবস্থা। এজন্যেই বনী ইসরাঈলের এই ত্রাণকর্তা রসূলকে আল্লাহ তায়ালা এই বলে আশ্বস্ত করলেন,

'এগিয়ে যাও, ভয় পেয়ো না, তুমি নিরাপদ।'

বস্তুত যে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ স্বয়ং নিরাপদ বলে পরিগণিত করছেন এবং স্বয়ং যাকে তত্ত্বাবধান করছেন, তার আবার কিসের ভয়?

'তুমি তোমার জামার ভেতরে হাত ঢুকাও, (দেখবে) সেই হাত সাদা হয়ে বের হবে। অথচ তাতে কোনো ক্ষতির আশংকা থাকবে না।'

হযরত মূসা আদেশ পালন করলেন। নিজের হাত তার বুকের কাছে পোশাকের ভেতরে ঢুকালেন, তারপর তা বের করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো আবেগ হতবুদ্ধিকর ঘটনা। হাতটা উজ্জ্বল হয়ে ঝিকমিক করতে লাগলো। অথচ ইতিপূর্বে তার রং ছিলো স্বাভাবিক, কিছুটা শ্যামলা ধাঁচের। আসলে ইংগিত করা হয়েছে যে, হযরত মূসার কাছে এ রকমই উজ্জ্বল সত্য, স্পষ্ট নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণ এসেছে।

হযরত মূসা (আ.) নিজের স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। ক্রমাগত অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটতে থাকায় যে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, তাতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তাই পুনরায় মহান আল্লাহর স্বীয় স্নেহময় তদারকী দ্বারা তাকে শান্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশ দিলেন, তোমার হাতটা তোমার হৃৎপিন্ডের ওপর চেপে ধর, তাহলে তোমার মনের অশান্ত অবস্থা প্রশমিত হবে।

'তোমার ডানা তোমার ওপর চেপে ধরো ভীতির কারণে..' এখানে ডানা দ্বারা হাত বুঝানো হয়েছে। পাখি যেমন শান্ত হয়ে বসলে ডানা গুটিয়ে নেয়, তেমনি ডানা গুটিয়ে অর্থাৎ বুকের সাথে হাত চেপে ধরে রাখতে বলা হয়েছে। ডানা নাড়াতে থাকার দৃশ্য হৃৎপিন্ডের কম্পন ও অস্থিরতা...। আর ডানা চেপে রাখা শান্ত থাকার সাথে তুলনীয়। এই বর্ণনাভংগি দ্বারা এই দৃশ্য ব্যক্ত করা কোরআনের একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি বিশেষ।

এবার মূসার যা নির্দেশ পাওয়া দরকার ছিলো তা পেয়ে গেলেন। যা দেখার দরকার ছিলো তা দেখে নিলেন। দুটো অলৌকিক নিদর্শন দেখানো এবং দেখে যে আতংকে ভুগছিলেন তাও প্রশমিত

হলো। এখন তিনি এই ঘটনার আড়ালের রহস্য উপলব্ধি করলেন এবং যে দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে শিশুকাল থেকে তৈরী করা হচ্ছিলো, সেই দায়িত্ব লাভ করলেন।

'এ দুটো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে আগত প্রমাণ। তারা একটা পাপিষ্ঠ জনগোষ্ঠী।'

এ থেকে বুঝা গেলো, হযরত মূসা (আ.)-কে অগ্নিকুন্ডের পাশ থেকে আল্লাহ তায়ালা যে কথাবার্তা বলছেন এবং যে দুটো অলৌকিক ঘটনা ঘটলো, এসব তাকে ফেরাউনের কাছে নবী হিসাবে পাঠানোর প্রতীক ও নিদর্শন। আর মূসা দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকাকালে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তায়ালা তার মাকে যে ওয়াদা করেছিলেন, এটা সেই ওয়াদারই বাস্তব রূপ। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছিলেন, 'আমি এই শিশুকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং রসূল বানাবো।' এটা ছিলো অকাট্য ওয়াদা এবং বহু বছর কেটে যাওয়ার পর তা এখন বাস্তব রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা কখনো খেলাপ করেন না। তিনি সবচেয়ে বড় সত্যভাষী।

এ সময়ে হযরত মূসা (আ.)-এর মনে পড়ে গেলো, তিনি ফেরাউনের দলের একজনকে হত্যা করেছেন এবং তারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে জানতে পেরে তিনি মিসর থেকে পালিয়েছেন। যেহেতু হযরত মূসা মহান আল্লাহর চোখে চোখেই রয়েছেন, তিনি তাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাকে প্রত্যক্ষ কথোপকথন ও অলৌকিক নিদর্শনবলী দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাই তিনি ভাবলেন, তাকে ফেরাউন হত্যা করে ফেললে তো তার নবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের অবসান ঘটবে। কাজেই প্রচারের কাজে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষতি কী?

'মূসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি। তাই আমার ভয় হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'

হয়ত মূসা (আ.) এ কথা দ্বারা তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন না, বরং সতর্কতা অবলম্বন করতে চাইছেন এবং তিনি নিজের ব্যাপারে যে আশংকা করছিলেন তা ঘটলেও যাতে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ বন্ধ না হয়ে অব্যাহত থাকে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছেন। একনিষ্ঠ দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হযরত মূসার এরূপ মনোভাব নিতান্তই স্বাভাবিক,

'আমার ভাই হারুন আমার চেয়েও ভালোভাবে কথা বলতে পারে, কাজেই তাকে আমার সাথে পাঠাও.....।' (আয়াত-৩৪)

অর্থাৎ হারুন যখন উৎকৃষ্টতর ভাষায় কথা বলতে সক্ষম, তখন দাওয়াতের কাজে তিনি অধিকতর পারঙ্গম। তিনি তার সহযোগী হতে পারেন, অধিকতর শক্তি যোগাতে পারেন এবং মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হলে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। এ পর্যায়ে মূসা (আ.) মহান আল্লাহর সম্মতি ও আশ্বাস লাভ করেন।

'তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বলেন, আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার শক্তি বৃদ্ধি করবো এবং তোমাদের উভয়কে এতটা ক্ষমতাশালী করবো যে, তারা তোমাদের দু'জনের নাগালই পাবে না। তোমরা উভয়ে এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনাবলীর জোরেই বিজয়ী হবে।' (আয়াত ৩৫)

হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদন তার প্রতিপালক গ্রহণ করলেন, তাঁর ভাইকে সাথে পাঠিয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করলেন, উপরন্তু এই আশ্বাস ও সুসংবাদ দিলেন, তোমাদের এতোটা ক্ষমতাশালী

করবো যে, ওরা তোমাদের নাগালই পাবে না। অর্থাৎ মূসা ও হারুন (আ.)-কে স্বৈরাচারী ফেরাউনের কাছে অসহায় অবস্থায় যেতে হবে না বরঞ্চ এমন দোর্দন্ড শক্তি তাদের সাথে যাবে, যার সামনে পৃথিবীর কোনো শক্তি টিকতে পারে না এবং যা সাথে থাকলে পৃথিবীর কোনো স্বৈরাচারী যুলুমবাজ তাদের স্পর্শও করতে পারে না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার অজেয় শক্তি তাদের চারপার্শ্বে প্রহরারত এবং তারা উভয়ে আল্লাহর সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রিত।

হযরত মূসা ও হারুনকে শুধু এতোটুকুই সুসংবাদ দেয়া হয়নি; বরং তারা বিজয়ী হবেন বলেও আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তবে এই বিজয় তাদের দু'জনার নয়; বরং যে সত্যের তারা পতাকাবাহী সেই সত্যের এবং আল্লাহর যে নিদর্শনাবলীর সাহায্যে তারা স্বৈরাচারীদের মোকাবেলা করে চলেছেন সেই নিদর্শনাবলীর বিজয়। কেননা এই নিদর্শনাবলীই একমাত্র অস্ত্র, একমাত্র শক্তি এবং বিজয়ের একমাত্র সাজসরঞ্জাম ও উপায় উপকরণ।

'আমার নিদর্শনাবলীর জোরেই তোমরা উভয়ে ও তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে।'

এই পর্যায়ে মহান আল্লাহর অজেয় শক্তি ঘটনাবলীর নাট্যমঞ্চে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং কোনো রাখঢাক না করে খোলাখুলিভাবেই নিজের ভূমিকা পালন করে, যাতে মানব সমাজ বিজয় অর্জনের যেসব উপায় উপকরণের সাথে পরিচিত, সেগুলো ছাড়াই বিজয় অর্জিত হয় এবং যাতে জনগণের মনে শক্তি ও মূল্যবোধের নতুন মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মানদন্ড হলো ঈমান ও আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরশীলতা। এরপর সব কিছু আল্লাহর হাতে সমর্পণ।

মূসা (আ.)-এর দাওয়াতের প্রতি ফেরাউন ও তার জাতির অস্বীকৃতি

এরপর এই দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটে। স্থান ও কালের আবর্তন উহ্য রাখা হয় এবং মূসা ও হারুন (আ.)-কে মহান আল্লাহর সুষ্ঠু নিদর্শনাবলীর সাহায্যে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলারত দেখানো হয়, হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে বিতর্ক চলে এবং সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে দুনিয়ার জীবনে সাগরে ডুবিয়ে মারা ও আখেরাতে অভিশাপের বর্ণনা দেয়া হয়। (আয়াত নং ৩৬ থেকে ৪২ পর্যন্ত দেখুন)

ফেরাউনের ধ্বংস হওয়া, যাদুকরদের ঈমান আনয়নের ঘটনা অন্যান্য সূরায় বিস্তারিতভাবে পেশ করা হলেও আলোচ্য আয়াতগুলোতে দ্রুত ও সংক্ষিপ্তভাবে পেশ, যাতে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান থেকে সরাসরি ধ্বংসের আলোচনায় পৌঁছা যায়। এরপর পার্থিব শাস্তির বর্ণনায় কোনো বিরতি না দিয়ে আখেরাতের অভিযাত্রা বর্ণনা করা হয়। এই পর্বে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণই কাম্য এবং কাহিনীর উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। মহান আল্লাহ যে সময়ে সময়ে কোনো রাখঢাক না রেখেই সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন, সে কথা বলাই এ কাহিনীর উদ্দেশ্য। এখানে দেখানো হয়েছে যে, হযরত মূসা যেই ফেরাউনের সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হলেন, অমনি আল্লাহ তায়ালা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে শাস্তি দিলেন এবং চূড়ান্ত আঘাত হানলেন। এ ক্ষেত্রে আর কোনো বিশদ বিবরণ দেয়া হলো না।

'অতপর যখন মূসা (আ.) আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এলো, তখন তারা বললো, এটা তো অলীক যাদু ছাড়া আর কিছু না। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কখনো এরূপ হয়েছে বলে শুনিনি।' (আয়াত-৩৬)

মক্কার মোশরেকরাও হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে অবিকল এ রকম কথাই বলতো। 'এটা তো অলীক যাদু ছাড়া আর কিছু নয়....' এ কথা দ্বারা আসলে সত্যকে প্রতিহত করা যায় না, তা নিয়ে

বিতর্ক তোলার অপপ্রয়াস মাত্র। যেখানেই হক বাতিলের মুখোমুখি হয়েছে এবং বাতিল জবাব দিতে অক্ষম হয়েছে, সেখানেই এ ধরনের বিতর্ক তোলার অপপ্রয়াস চলেছে এবং বার বার চলেছে। বাতিলপন্থীরা সত্যকে যাদু বলে দাবী করে, কিন্তু এ দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারে না। তবে এতোটা খোঁড়া যুক্তি এই দিয়ে থাকে যে, এটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। পূর্বপুরুষদের থেকে কখনো তারা এ কথা শোনেনি।

বাতিলপন্থীরা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে কথা বলে না। তারা এমন অস্পষ্ট কথা বলে, যা কোনো সত্য প্রতিষ্ঠিত করে না, বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করে না এবং কোনো দাবী প্রতিহত করে না। পক্ষান্তরে মূসা (আ.) তার ও ফেরাউনের মধ্যকার বিরোধটাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন, কেননা তারা কোনো যুক্তি দেয়নি যে, তিনি তা খন্ডন করবেন এবং তারা কোনো প্রমাণ চায়নি যে, তিনি তা তাদের দেবেন। সকল জায়গায় ও সকল স্থানে বাতিলপন্থীরা যেমন ঝগড়া বাধায়, তেমনি তারাও ঝগড়া বাধায় ও বিতর্ক তোলে। তাই তাদের এড়িয়ে চলাই সম্মানজনক, সংক্ষেপে কথা বলাই উত্তম এবং তার ও মোশরেকদের মধ্যকার বিরোধ আল্লাহর হাতে সোপর্দ করাই তিনি শ্রেয় মনে করেছেন,

'মূসা বললো, কে হেদায়াতের বাণী নিয়ে এসেছে এবং কে আখেরাতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবে সেটা আমার প্রভুই ভালো জানেন। নিশ্চয়ই অত্যাচারীরা সাফল্য লাভ করে না।' (আয়াত-৩৭)

এটা একটা মার্জিত ও সৌজন্যপূর্ণ জবাব। এতে খোলাখুলি কিছু বলা হয়নি। যা বলা হয়েছে আভাস ইংগিতে। তবে কথাটা স্পষ্ট বটে। এ জবাব হক ও বাতিলের মোকাবেলার শেষ পরিণতির কী, সে সম্পর্কে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তিতে ভারপুর। যে আল্লাহর হাতে তিনি বিরোধের মীমাংসার ভার অর্জন করছেন, সেই আল্লাহ তায়ালাই তার সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অন্য সবার চেয়ে বেশী জানেন। আখেরাতের সুফল হেদায়াতপ্রাপ্তদের জন্যেই নির্ধারিত। আর অপরাধীরা পরিণামে সফলকাম হয় না। এটাই আল্লাহর অমোঘ ও অলংঘনীয় নীতি, যদিও বাহ্যত কোনো কোনো ব্যাপার এর বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়। এই অলংঘনীয় নীতির ভিত্তিতেই হযরত মূসা তার স্বজাতির মোকাবেলা করেন এবং অন্যান্য নবীরাও নিজ নিজ জাতির মোকাবেলা করেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর এই মার্জিত ও ভদ্রজনোচিত বক্তব্যের জবাবে ফেরাউন যে জবাব দেয় তা ছিলো একাধারে ধৃষ্টতাপূর্ণ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিদ্রূপাত্মক,

'ফেরাউন বললো, হে সভাসদবৃন্দ, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ আছে বলে তো আমার জানা নেই।' .... (আয়াত-৩৮)

সভাসদদের সম্বোধন করে ফেরাউন্ যে কথাটা বললো, তা একটা কাফেরসুলভ ও পাপীসুলভ কথা। অথচ সভাসদরা তা নির্বিবাদে মেনে নেয়। এ কথাটা বলার সময় ফেরাউন নির্ভর করেছে তৎকালে মিসরে প্রচলিত এই কীংবদন্তীর ওপর যে, সম্রাটরা দেবতাদের বংশধর। তাছাড়া সে তার একনায়কসুলভ শক্তি এবং প্রতাপের ওপরও নির্ভর করেছে, যা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলো। মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে, সম্রাটরা সাধারণ মানুষের মতোই জন্ম গ্রহণ করে ও মৃত্যুবরণ করে। তথাপি তাদের সামনে ফেরাউন নিজেকে দেবতাদের বংশধর বলে দাবী করে, কিন্তু এ দাবী তারা কোনো প্রতিবাদ ও মন্তব্য ছাড়াই শোনে।

ফেরাউন শুধু এই দাবী করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এরপর সে আন্তরিকতা সহকারে সত্য জানা এবং মূসার মাবুদকে অনুসন্ধান করার চেষ্টার ভান করেছে। এই ভানটাও ছিলো তার বিদ্রূপ ও উপহাসমাত্র। হামানকে সে বলেছে, আমার জন্যে ইট তৈরী করো, অতপর আমার জন্যে একটা উঁচু প্রাসাদ বানাও, হয়তো আমি মূসা (আ.)-এর মাবুদকে দেখতে পাবো। অর্থাৎ তার ধারণা যে, সে আকাশে আল্লাহকে দেখতে পাবে। সত্যবাদিতায় সে সন্দিগ্ধ, তথাপি অনুসন্ধান চালাতে চায়, যাতে প্রকৃত সত্য জানতে পারে।

'আমি তাকে মিথ্যুক মনে করি।'

এখানে যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার ঘটনাটা ঘটে, কিন্তু কাহিনীর শেষ পর্যায়টা দ্রুত এগিয়ে আনার লক্ষ্যে এই ঘটনা উহ্য রাখা হয়।

'ফেরাউন ও তার দলবল দেশে বিনা অধিকারে অহংকার করেছিলো এবং ভেবেছিলো যে, তাদের আমার কাছে আর ফিরে আসতে হবে না।' (আয়াত-৩৯)

তারা যখন ভাবলো, আল্লাহর কাছে আর ফিরে যেতে হবে না, তখনই অংহকারে লিপ্ত হলো। অথচ অহংকারের কোনো আধিকার তাদের ছিলো না। অহংকারবশেই তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও সতর্কবাণীগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো (এ পর্বের শুরুতে সংক্ষেপে ও অন্যান্য সূরায় সবিস্তারে এসব নিদর্শনের বিবরণ এসেছে)।

'তাই আমি তাকে ও তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। .....' (আয়াত-৪০)

এভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে পাকড়াও করা ও সমুদ্রে নিক্ষেপের ঘটনা। পাথর ও পাথরের টুকরো যেভাবে নিক্ষেপ করা হয় ঠিক সেভাবে তাদের নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। যে সমুদ্রে দুধের শিশু মূসা (আ.)-কে নিক্ষেপ করা হলে তা নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হলো, সেই সমুদ্রেই ফেরাউন ও তার দলবলের কবর রচিত হলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শান্তি ও নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওপরই নির্ভরশীল। আর অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই ঘটে থাকে।

'সুতরাং যালেমদের পরিণতি কেমন হয় দেখে নাও।'

যে পরিণতি ফেরাউনের হয়েছিলো তা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পরিষ্কার। এতে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে শিক্ষা এবং অস্বীকারকারীদের জন্যে সতর্ক বাণী রয়েছে। মহান আল্লাহর শক্তি কিভাবে স্বৈরাচারীদের এক নিমীষে ধ্বংস করে দিতে পারে, আধা লাইনেরও কম জায়গায় তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এরপর আবার এক মুহূর্তে দুনিয়ার জীবন অতিক্রম করে ফেরাউন ও তার দলবলকে এক অদ্ভুত ভংগিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'আমি তাদের জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা বানিয়েছি।'

কী ভয়ংকর নেতৃত্ব ও এবং কী জঘন্য তার আহ্বান!

'আর কেয়ামতের দিন তাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।'

অর্থাৎ তাদের পরাজয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায়। এটা তাদের দাম্ভিকতা ও বিদ্রোহের শাস্তি। শুধু পরাজয় নয়; বরং পৃথিবীতে অভিশাপ এবং আখেরাতে লাঞ্ছনাও।

'তাদের এই পৃথিবীতে অভিশাপ দিয়েছি। আর আখেরাতে তারা লাঞ্ছিত হবে।'

'মাকবুহীন' শব্দটা মূলত অপমান, অবমাননা ও লাঞ্ছনার দৃশ্য চিহ্নিত করে। আর এটা পার্থিব জীবনে তারা যে অহংকার করতো এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর যে দম্ভ প্রকাশ করতো, তার উপযুক্ত শাস্তি।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মিসর থেকে বনী ইসরাঈলের হিজরত এবং এই হিজরতকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করা হয়েছে, যাতে ফেরাউনের ভয়াবহ পরিণাম দেখানোর পর হযরত মূসা (আ.)-এর সাফল্য দেখানো হয়।

পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি মূসা (আ.)-কে কেতাব দিয়েছিলাম মানব জাতির জন্যে শিক্ষা, হেদায়াত ও রহমত হিসাবে, যাতে তারা স্মরণ করে।'

এই হলো হযরত মূসার ভাগ্য। এটা নিসন্দেহে বিরাট সৌভাগ্য। এটা মূসা (আ.)-এর সম্মানজনক পরিণতি। তিনি আল্লাহর কেতাব পেলেন, যা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। 'যাতে স্মরণ করে' অর্থাৎ কিভাবে মহান আল্লাহ স্বৈরাচারী ও দুর্বল মানুষদের মধ্যে মীমাংসার জন্যে হস্তক্ষেপ করেন, স্বৈরাচারীদের ধ্বংস করেন এবং মযলুমদের কল্যাণ ও ক্ষমতা দান করেন, সেটা যাতে তারা স্মরণ করে।

এভাবেই এ সূরায় ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে এই সত্য দীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠেছে যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনই নিরাপত্তা লাভের একমাত্র উপায় এবং আল্লাহর কাছ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়াই নিরাপত্তাহীনতার একমাত্র কারণ। এ সত্যটাও জানা গেছে যে, স্বৈরাচারী শক্তিগুলো যখন এতো প্রতাপশালী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে ওঠে যে, সত্যের পথপ্রদর্শকরা তাদের প্রতিহত করতে অক্ষম হয়ে যায়, তখন মহান আল্লাহ সেখানে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদের পর্যুদস্ত করেন। মক্কার ক্ষুদ্র ও দুর্বল মুসলিম দলটির জন্যে এই আশ্বাসবাণীর প্রয়োজন ছিলো। আর স্পর্ধিত মোশরেক শক্তিরও এ সত্যটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন ছিলো। ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলন যেখানেই চালু হবে এবং যেখানেই স্বৈরাচারী খোদাদ্রোহী শক্তি সেই দাওয়াতের গতিরোধ করে দাঁড়াবে, সেখানেই এ সত্যটা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে।

সত্যের বিরুদ্ধে বাতিল শক্তির আগ্রাসন ও অবরোধ যতোদিন চলতে থাকবে, মহান আল্লাহর অজেয় শক্তির হস্তক্ষেপ ততোদিনই চলতে থাকবে।

এভাবে কোরআনের কেসসা কাহিনীগুলো মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়, বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজিত শাশ্বত সত্য ও নীতিমালা মানুষের মনমগযে বদ্ধমূল করে। 'আশা করা যায়, তারা স্মরণ করবে' কথাটার মর্মার্থ এটাই।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسٰى ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৪. (হে নবী,) মূসাকে যখন আমি (ওবুওতের) বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পাশে (সে বিশেষ স্থানটিতে উপস্থিত) ছিলে না, না তুমি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের দলে শামিল ছিলে, ৪৫. বরং তারপর আমি আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতপর তাদের ওপরও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে (তারাও আজ কেউ অবশিষ্ট নেই), আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে পড়ে শুনিয়েছো, কিন্তু (সে সময়ের খবরাখবর তোমার কাছে) পৌছানোর জন্যে আমিই (সেখানে মজুদ) ছিলাম। ৪৬. মূসাকে যখন আমি (প্রথম বার) আওয়ায দিয়েছিলাম, তখনও তুমি তূর পাহাড়ের (কোনো) দিকেই মজুদ ছিলে না, কিন্তু এটা হচ্ছে (তোমার প্রতি) তোমার মালিকের রহমত (যে, তিনি তোমাকে এ সব অবহিত করেছেন), যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। ৪৭. এমন যেন না হয়, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে এবং (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠালে না কেন? তাহলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুবর্তন করতাম এবং আমরা (সবাই) ঈমানদারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম। ৪৮. অতপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এ (নবী)-কে সে ধরনের কিছু (কেতাব) দেয়া হলো না কেন, যা মূসাকে দেয়া হয়েছিলো, (কিন্তু তুমি বলো,) মূসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তা কি ইতিপূর্বে এরা অস্বীকার করেনি? তারা তো (এও) বলেছে, এ উভয়টিই হচ্ছে যাদু, এর একটি আরেকটির সমর্থক এবং তারা বলেছে, আমরা (এর) কোনোটাই মানি না।

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি (উভয়টাই মিথ্যা হয় এবং) তোমরা (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অন্য কোনো কেতাব নিয়ে এসো, যা এ দু'টোর তুলনায় ভালো হবে, (তাহলে) আমিও তার অনুসরণ করবো। ৫০. যদি এরা তোমার এ কথার কোনো জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এরা (আসলে) নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেই (এসব বলে); তার চাইতে বেশী গোমরাহ ব্যক্তি আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত (পাওয়া) ছাড়াই কেবল নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম জাতিকে পথ দেখান না।

রুকু ৬

৫১. আমি (আমার) বাণী (কোরআনের এ কথাকে) তাদের জন্যে ধীরে ধীরে পাঠিয়েছি, যাতে করে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ৫২. (কোরআন নাযিলের) আগে আমি যাদের আমার কেতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো), তারা এর ওপর ঈমান এনেছে। ৫৩. যখন তাদের সামনে এ কেতাব তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, (কেননা) আমরা জানি, এটাই সত্য, এটা আমাদের মালিকের কাছ থেকেই এসেছে, আমরা আগেও (আল্লাহর কেতাব) মানতাম। ৫৪. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের তাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্যে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (আমল) দ্বারা মন্দ (আমল) দূর করে, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তারা তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। ৫৫. এরা যখন কোনো বাজে কথা শুনে তখন তা পরিহার করে চলে এবং (এদের) বলে, আমাদের কাজের (দায়িত্ব) আমাদের (ওপর), আর তোমাদের (কাজের) দায়িত্ব তোমাদের (ওপর), তোমাদের জন্যে সালাম, তা ছাড়া আমরা জাহেলদের সাথে তর্ক করতে চাই না!

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَ

لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ

الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا

أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

৫৬. যাকে তুমি ভালোবাসো (তবে এ ভালোবাসার কারণেই) তুমি তাকে হেদায়াত দান করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই তিনি হেদায়াত দান করেন, তিনি ভালো করেই জানেন কারা এ হেদায়াতের অনুসারী (হবে)। ৫৭. (হে নবী,) এরা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে মিলে হেদায়াতের পথ ধরি তাহলে (অবিলম্বে) আমাদের এ যমীন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে; (তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো,) আমি কি তাদের (বসবাসের) জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রেযেকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমূল আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (শোকর আদায় করতে) জানে না। ৫৮. আমি এমন অসংখ্য জনপদ নির্মূল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদের তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মদমত্ত করে রেখেছিলো, (অথচ) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়িগুলো (আর এ হচ্ছে তার ধ্বংসাবশেষ), এদের (ধ্বংসের) পর (এসব জায়গায়) সামান্যই কোনো মানুষের বসতি ছিলো; (শেষ পর্যন্ত) আমিই (সব কিছুর) মালিক হয়ে থাকলাম। ৫৯. (হে নবী,) তোমার মালিক কোনো জনপদকেই ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ না সে (জনপদের) কেন্দ্রস্থলে কোনো নবী না পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, আমি জনপদসমূহ কখনো বরবাদ করি না, যতোক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা যালেম (হিসেবে পরিগণিত) হয়ে যায়। ৬০. তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এ (অস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস ও তার শোভা সামগ্রী মাত্র, (মনে রাখবে) যা কিছু আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তা (এর চাইতে) অনেক উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী, তোমরা কি বুঝতে পারো না?

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ

شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا

هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ز مَا كَانُوْٓا

اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ

مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا

يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ

الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ

রুকু ৭

৬১. যাকে আমি (জান্নাতের) উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি এবং যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) তা পেয়েও যাবে, সে ব্যক্তি কি করে তার মতো হবে যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছু ভোগসম্ভার দিয়ে রেখেছি অতপর যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গন্য হবে যাদের কেয়ামতের দিন আমার সম্মুখে তলব করা হবে। ৬২. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, আজ কোথায় আমার (সেসব) শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে! ৬৩. (আযাবের) এ বিধান যাদের ওপর কার্যকর হবে তারা (তখন) বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের আমরা গোমরাহ করেছিলাম, আমরা যেমনি এদের গোমরাহ করেছিলাম, তেমনি আমরা নিজেরাও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলাম, (আজ) আমরা তোমার দরবারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছি, এরা কেবল আমাদেরই গোলামী করতো না (এরা নিজেদের প্রবৃত্তির গোলামীও করতো)। ৬৪. অতপর (মোশরেকদের) বলা হবে, ডাকো আজ তোমাদের শরীকদের, তারপর তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের কোনোই জবাব দিতে পারবে না, (ইতিমধ্যে) মোশরকেরা নিজের চোখেই আযাব দেখতে পাবে, কতো ভালো হতো যদি এরা সঠিক পথের সন্ধান পেতো! ৬৫. সেদিন (আল্লাহ তায়ালা পুনরায়) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, নবীদের তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে? ৬৬. সেদিন তাদের (মনের) ওপর (থেকে) সব বিষয়ই হারিয়ে যাবে, তারা একে অপরের কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাবে না। ৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে (তার কথা আলাদা), আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে শামিল হবে! ৬৮. (হে নবী, তুমি তাদের বলো,) তোমার মালিক যা চান তাই তিনি পয়দা করেন এবং (তাদের জন্যে) যে বিধান তিনি পছন্দ করেন তাই তিনি জারি করেন, (এ ব্যাপারে) তাদের কারোই

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا

يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫

وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ

سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۖ اَفَلَا

تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ

الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۖ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ

تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ

কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়ালা মহান, ওদের শেরেক থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। ৬৯. তোমার মালিক আরো জানেন, যা কিছু এদের অন্তর গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ করে। ৭০. আর তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি) ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; সমস্ত তারীফ তাঁর জন্যে দুনিয়াতে (যেমন) এবং আখেরাতেও (তেমনি), আইন ও বিধান তাঁরই, তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ৭১. (হে নবী,) এদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের একটুখানি আলো এনে দিতে পারবে; (তারপরও) তোমরা কর্ণপাত করবে না? ৭২. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কখনো একথা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকেও (রোয) কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী করে) তোমাদের ওপর বসিয়ে দেন, তাহলে (বলো) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের (জন্যে) রাত এনে দিতে পারবে, যেখানে তোমরা এতোটুকু বিশ্রাম নেবে, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামত) দেখতে পাও না? ৭৩. এটা তো তাঁরই রহমত যে, তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন। যাতে করে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পারো এবং (দিনের বেলায়) তাঁর (জীবিকার) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পারো! ৭৪. সেদিন (আবার) আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, কোথায় (আজ) আমার সেসব শরীক যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে! ৭৫. সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝ থেকে এক একজন সাক্ষী বের করে আনবো, অতপর (তাদের) বলবো, তোমরা (সবাই তোমাদের পক্ষে) দলীল প্রমাণ হাযির করো, (সেদিন) ওরা সবাই বুঝতে পারবে, (যাবতীয় সত্য)

ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত, তারা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব কথা উদ্ভাবন করতো তা নিমিষেই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

তাফসীর

আয়াত ৪৪-৭৫

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী শেষ হয়েছে। কাহিনীটার শিক্ষাও সেখানে আলোচিত হয়েছে। আর বর্তমান অধ্যায়ে শুরু হচ্ছে সেই কাহিনীর ওপর পর্যালোচনা। এরপর সূরার বাকী অংশ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় নিয়েই এগিয়ে গেছে। শান্তি ও নিরাপত্তা কোথায় পাওয়া যায় এবং অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতাই বা কোথায় থাকে, সে কথা এ প্রসংগে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী, এর বিরুদ্ধে নানারকম ছলছুতো ও আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে প্রতিরোধকারী মোশরেকদের সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে, তাদের দৃষ্টির সামনে প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য, কেয়ামতের দৃশ্য ও তাদের কার্যকলাপের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। রসূল (স.) তাদের কাছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তার সত্যতার প্রমাণাদিও পেশ করা হয়েছে। মোশরেকরা এ দাওয়াত অস্বীকার করলে আহলে কেতাবের কিছু লোক যে তার ওপর ঈমান এনেছে, সে কথা জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যে রসূল (স.)-কে তারা প্রত্যাখ্যান করছে, তিনি যে তাদের জন্যে কত বড় করুণা এবং তাঁর কারণেই যে তারা আযাব থেকে রক্ষা পাচ্ছে, সে কথা তারা উপলব্ধি করলে খুবই ভালো করতো।

কোরআনের যুক্তি ও কাফেরদের গোয়ার্তুমী

এ কাহিনীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণে এ কাহিনীর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। রসূল (স.) তাদের কাছে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যেমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী তুলে ধরে। অথচ তিনি সেসব ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহীই তিনি পড়ে শুনান। এর উদ্দেশ্য তাঁর জাতির প্রতি করুণা প্রদর্শন, যেন শেরেকের কারণে তাদের ওপর আযাব না এসে পড়ে। আর আযাব এলে তা তারা বলতে পারে, 'হে আমাদের প্রভু, (আযাব দেয়ার আগে) আমাদের কাছে এজন্যে রসূল পাঠালে না কেন, তাহলে তো আমরা তোমার আয়াতগুলো অনুসরণ করতাম এবং মোমেন হয়ে যেতাম।'

'মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। ....*(আয়াত ৪৪-৫১)*

'পশ্চিম প্রান্ত' দ্বারা এখানে তূর পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার জন্যে নির্ধারিত চল্লিশ রাতের মেয়াদের সময় এখানেই তাঁর মিকাত বা অবস্থানস্থল স্থির করেন। এই মেয়াদ ছিলো প্রথমে ত্রিশ দিন, পরে তা বাড়িয়ে চল্লিশ দিন করা হয়। (সূরা আরাফ দ্রষ্টব্য) এই মিকাতেই হযরত মূসার জন্যে পটে লেখা বিধান দেয়া হয়, যাতে তা বনী ইসরাঈলের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়। রসূল (স.) এই মিকাতে উপস্থিত ছিলেন না যে, তার এত বিশদ তথ্য জানবেন যেমনটি কোরআনে রয়েছে। তাছাড়া রসূল (স.) ও সেই ঘটনার মাঝে মানব জাতির বহু প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছে, 'কিন্তু আমি বহুসংখ্যক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।

ফলে তাদের বয়স দীর্ঘ হয়ে গেছে।' সুতরাং এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিনি তাঁকে এসব তথ্য জানিয়েছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নন, যিনি তাঁর কাছে ওহীযোগে কোরআন নাযিল করেছেন।

কোরআন মাদইয়ান সংক্রান্ত তথ্যও জানিয়েছে। জানিয়েছে সেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যও। কোরআনের এই তথ্যই রসূল (স.) পড়ে শুনিয়েছেন। অথচ তিনি মাদইয়ানের অধিবাসী ছিলেন না যে, তাদের কাছ থেকে এতো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন; যেমনটি কোরআন ও এর মধ্যে বর্ণিত অতীতের তথ্যাবলী আমিই ওহীযোগে নাযিল করেছি।

অনুরূপভাবে কোরআন খুবই স্পষ্টভাবে ও নির্ভুলভাবে তূর পর্বতের দিক থেকে শ্রুত মহান আল্লাহর সংলাপ ও সম্বোধন তুলে ধরেছে। কোরআন বলছে, 'আমি যখন সম্বোধন করেছিলাম, তখন তুমি তূর পর্বতের কাছে ছিলে না।' বস্তুত রসূল (স.) আল্লাহর সেই সম্বোধন শোনেননি এবং তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণও করেননি। এটা নিছক তাঁর জাতির ওপর আল্লাহর করুণা যে, তিনি তাদের সেসব খবর জানিয়েছেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল (স.) তাদের যে দাওয়াত দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। যেহেতু তাঁর জাতির কাছে দীর্ঘকাল যাবত এমনকি তাদের পিতা হযরত ইসমাঈলের পর আর কোনো নবী আসেননি, তাই তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তিনি এসেছেন এবং অতীতের এ সব খবর অবহিত করছেন। অথচ তাদের প্রতিবেশী বনী ইসরাঈল জাতির কাছে বহু নবী ও রসূল এসেছেন।

কোরআনের এসব তথ্য ও কাহিনী আরববাসীর জন্যে একদিকে যেমন করুণাস্বরূপ, অপরদিকে তেমনি এ দ্বারা তাদের ওযর-আপত্তির পথও রুদ্ধ হয়ে গেছে। তারা আর একথা বলতে পারবে না যে, আযাবের পূর্বে সতর্ক না করে তাদের হঠাৎ করেই পাকড়াও করা হয়েছে, কিংবা জাহেলিয়াত, শেরেক ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে তারা যে আযাবের যোগ্য হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে তাদের সাবধান না করেই আযাব নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, ঈমান আনার পথে তাদের যেন কোনো বাধা না থাকে এবং তারা কোনো ওযর দেখাতে না পারে। সে জন্যেই অতীতের এসব ঘটনা তাদের অবহিত করেছেন।

'তাদের ওপর যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন কোনো বিপদ আসতো তাহলে তারা বলতো যে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের কাছে রসূল পাঠালে না কেন, তাহলে তো আমরা তোমার আয়াতগুলোর অনুসরণ করতাম এবং মোমেন হয়ে যেতাম।' (আয়াত-৪৭)

অনুরূপভাবে তাদের কাছে কোনো নবী রসূল না এলে এবং এই রসূলের সাথে অকাট্য নিদর্শনাবলী না থাকলে তারা এ কথা ভবিষ্যতেও বলতো, কিন্তু যখনই তাদের কাছে রসূল এলেন এবং তাঁর সাথে সেসব অকাট্য সত্যও এলো যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তখন তারা তাঁর অনুসরণ করলো না। ৪৮ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে, যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য এলো, তারা বললো, মূসা (আ.)-কে যা দেয়া হয়েছিলো তার মতো জিনিস তাকে দেয়া হলো না কেন?.......' অর্থাৎ লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাকার দৃশ্যমান অলৌকিক নিদর্শন, কতকগুলো ফলকে লিখিত সমগ্র তাওরাত এক সাথে নাযিল হওয়া ইত্যাদি। মোটকথা, এভাবে তারা সত্যের প্রতি ঈমান আনলো না, বরং নানারকম খোঁড়া ওযর দিতে লাগলো।

অথচ মোশরেকরা তাদের যুক্তির ব্যাপারে যেমন সত্যবাদী ছিলো না, তেমনি তাদের আপত্তির ব্যাপারেও আন্তরিক ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ইতিপূর্বে মূসাকে যে কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা কি তাকেও অমান্য করেনি।' আরবে ইহুদীরা ছিলো। তাদের কাছে তাওরাতও

ছিলো, কিন্তু আরবরা তার ওপরও ঈমান আনেনি। মোশরেকেরা জেনেছিলো যে, তাওরাতে মোহাম্মদ (স.)-এর বিবরণ লিখিত রয়েছে। তারা কোনো কোনো ইহুদীকে জিজ্ঞেসও করেছিলো এবং তারা বলেছিলো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর বক্তব্য সত্য এবং তাদের কাছে যে কেতাব রয়েছে, তার সাথে তার মিল রয়েছে। অথচ তারা এসব কথায় বিশ্বাস করেনি; বরং বলেছে, তাওরাতও যাদু, কোরআনও যাদু। তাই দুটোতে মিল রয়েছে এবং একটা অপরটার সমর্থক।

'তারা বললো, দুই যাদু স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। তারা বললো, আমরা কোনোটাই মানি না।'

সুতরাং নিছক তর্ক ও গোয়ার্তুমিই বাধা। যুক্তি প্রমাণের অভাব বা দুর্বলতা ঈমান আনার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি।

এতদসত্তেও কোরআন আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে তাদের যুক্তি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সে বলেছে, ঠিক আছে, তোমাদের কাছে কোরআন ও তাওরাত কোনোটাই যদি ভালো না লাগে, তাহলে তোমাদের কাছে এই উভয় কেতাবের চেয়ে সত্যপন্থী অন্য কোনো কেতাব যদি থেকে থাকে, তবে তা নিয়ে এসো। আমি তার অনুসরণ করবো। (আয়াত-৪৯)

এ হচ্ছে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। এ হচ্ছে যুক্তিতর্কের দীর্ঘতম পথ পাড়ি দেয়ার নমুনা। এরপর যে ব্যক্তি সত্যের প্রতি ঈমান আনে না সে আসলে হঠকারী ও গোঁয়ার। সে কোনো যুক্তির ধার ধারে না। (আয়াত-৫০)

কোরআনের সত্য খুবই স্পষ্ট। ইসলামের সপক্ষের যুক্তি অত্যন্ত ধারালো ও অকাট্য। এ যুক্তি একমাত্র সে-ই অগ্রাহ্য করতে পারে যে নিজের আবেগ ও হুজুগের কাছে পরাজিত এবং একমাত্র গোয়ার্তুমিই তাকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখতে পারে। এখানে দু'টো পথই খোলা আছে, তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই। হয় সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে এবং গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা ত্যাগ করতে হবে। আর তা করলে ঈমান আনা ও আল্লাহর দ্বীনের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্যথায় প্রবৃত্তির দাসত্ব ও সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক– এপথ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করার পথ। আকীদা ও আদর্শের ব্যাপারে জড়তা অস্পষ্টতার আর কোনো অবকাশ নেই। 'যদি তারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে জেনে রাখো যে, তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের অনুসারী।.....' এভাবে দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তাঁর কথায় কোনো হেরফের বা রদবদল নেই। যারা আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করে না তারা স্বার্থপর, তাদের কোনো ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তারা প্রবৃত্তির গোলাম এবং সুস্পষ্ট সত্যের বিরোধী।

'যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে গোমরাহ কে আছে?

তারা এক্ষেত্রে বিদ্রোহী ও যালেম,

'আল্লাহ তায়ালা যালেমদের সুপথ দেখান না।'

এই স্পষ্টোক্তির পর কোরআন না বুঝা বা ইসলাম না জানার ওযর দেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলেই হলো, আর কোনো ওযর পেশ করার অবকাশ নেই। কেননা ইসলাম একেবারেই সহজবোধ্য, সুস্পষ্ট। স্বার্থপর, প্রবৃত্তি পূজারী ও পাপাচারী ব্যতীত কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

মক্কার কোরায়শদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে গেছে। এখন আর তাদের কোনো ওযর পেশ করার অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আমি তাদের কাছে কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছি, হয়তো তারা স্মরণ করবে।' (আয়াত-৫১)

কোরআন শুনে খৃষ্টান কাফেলার ঈমান আনা

এ পর্বটা শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো মোশারেকরা বক্র পথ অনুসরণ করতে ও বিতর্ক তুলতে শুরু করেছে। তাই পরবর্তী আলোচনায় তাদের সামনে আহলে কেতাবের একটা গোষ্ঠীর সততা, সত্যনিষ্ঠা ও কোরআনের প্রতি ঈমান আনার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা স্বভাবগতভাবে সৎ সরলমতি ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই তারা কোনো বক্র পথ অনুসরণ না করে সরাসরি ঈমান এনেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যাদের ইতিপূর্বে আমি কেতাব দিয়েছি, তারা এর প্রতি ঈমান আনে।'...... (আয়াত ৫২-৫৫)

হযরত সাঈদ বিন জোবায়র বলেছেন, এ আয়াত কটা সত্তর জন খৃষ্টান ধর্মযাজক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। নাজ্জাশী তাদের রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে এলেন, তখন তিনি তাদের সামনে 'সূরা ইয়াসীন' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনালেন। এটা শুনে তারা সবাই কাঁদতে লাগলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক স্বীয় সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'অতপর রসূল (স.) মক্কায় থাকা অবস্থায় বিশ জন অথবা তার কাছাকাছি সংখ্যক খৃষ্টান তাঁর কাছে এলো। আবিসিনিয়া থেকে তারা রসূল (স.)-এর খবর শুনে এসেছিলো। তারা এসে রসূল (স.)-কে মসজিদে পেলো। তারা রসূলের কাছে বসলো, কথাবার্তা বললো এবং নানা রকম প্রশ্ন করলো। এ সময় কোরায়শ বংশীয় কিছু লোকজন কাবা শরীফের চত্বরে বসে কথাবার্তা বলছিলো। আগন্তুক খৃষ্টানরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো রসূল (স.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার পর তিনি তাদেরে এক আল্লাহর এবাদাতের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন পড়ে শোনালেন। কোরআন শোনার পর তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। তারা দাওয়াত গ্রহণ করলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, রসূলের প্রতিটি কথা তারা সত্য বলে মেনে নিলো এবং খৃষ্টানদের আসমানী কেতাবে তাঁর সম্পর্কে যেসব বিবরণ রয়েছে, তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিলো। এরপর তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হলো, আবু জাহল ইবনে হেশাম তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সে তাদের বললো, তোমাদের মতো কাফেলাকে আল্লাহ ব্যর্থ করে দিক। তোমাদের স্বদেশী মুরব্বীরা তোমাদের পাঠিয়েছিলো এই লোক (মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে, আর তোমরা তার সাথে বৈঠক করেই অস্থির হয়ে পড়লে, শেষ পর্যন্ত নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে বসলে এবং মোহাম্মদের সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করলে? তোমাদের মতো এমন নির্বোধ কাফেলা আর কখনো দেখিনি। তারা বললো, 'তোমাদের ওপর শান্তি হোক। আমরা তোমাদের সাথে ঝগড়া করবো না। আমরা যে পথে আছি সেই পথে আমাদেরকে থাকতে দাও। আর তোমরা যে পথে আছ সেই পথে তোমরা থাকো। আমরা নিজেদের কল্যাণের জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।'

ইবনে ইসহাক আরো বলেন, কারো কারো মতে এই খৃষ্টানরা ছিলো নাজরান থেকে আগত। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, তারা কোথাকার লোক ছিলো। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, এই খৃষ্টান কাফেলা সম্পর্কে 'যাদের আমি ইতিপূর্বে কেতাব দিয়েছিলোম, তারা তার প্রতি ঈমান এনেছে ....' (আয়াত ৫২-৫৫) আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক আরো বলেন, আমি ইমাম যুহরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ আয়াতগুলো কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, আমাদের মনীষীদের কাছ থেকে আমরা বরাবরই শুনে আসছি, এগুলো নাজ্জাশী ও তার সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার

ওপর সন্তুষ্ট হোন। অনুরূপভাবে সূরা মায়েদার ৮২ ও ৮৩ নং আয়াতও তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়।

যাদের সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো নাযিল হয়ে থাক না কেন, কোরআন মোশরেকদের একটা বাস্তব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যা তারা জানে এবং যার সত্যতা তারা অস্বীকার করে না। কোরআন একদল সত্যনিষ্ঠ লোকের নমুনা তাদের সামনে তুলে ধরে এবং দেখায়, কিভাবে তারা এই কোরআনকে গ্রহণ করে, কোরআন কিভাবে তাদের সন্দেহ নিরসন করে, কিভাবে তারা কোরআনে অকাট্য সত্যের সাক্ষাত পায় এবং তাদের নিজেদের কাছে আগে থেকে বিদ্যমান আসমানী কেতাবে তারা কোরআনের সাথে কতো মিল খুঁজে পায়। এ কারণেই কোনো দম্ভ, অহংকার বা প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি তাদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। বরং যে সত্যের ওপর তারা ঈমান এনেছে, শত দুঃখ-কষ্ট ও মূর্খ লোকদের দৌরাত্ম্য সহ্য করেও তার ওপর তারা অবিচল থাকে এবং সকল অত্যাচার অনাচারে ধৈর্য ধারণ করে।

'যাদের আমি ইতিপূর্বে কেতাব দিয়েছি, তার প্রতি তারা ঈমান আনে।' (আয়াত ৫২)

এটা কোরআনের বিশুদ্ধতার একটা অকাট্য প্রমাণ। কেননা সমস্ত আসমানী কেতাবই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। তাই প্রত্যেক কেতাবেই অপর কেতাবের সাথে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও মিল রয়েছে। পূর্ববর্তী কেতাব যে পায়, পরবর্তী কেতাবেও সে একই সত্যের সাক্ষাত পায়। তাই সে সন্দেহমুক্ত হয়ে যায়, পরবর্তী কেতাবের প্রতিও নির্দ্বিধায় ঈমান আনে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস করে, যে আল্লাহ তায়ালা সকল কেতাব নাযিল করেছেন, এ কেতাবও সেই আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে।

'আর যখন তাদের সামনে তা পাঠ করা হয়, তারা বলে যে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এটাও আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই আগত সত্য। আমরা এর পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।' (আয়াত ৫৩)

অর্থাৎ কোরআনের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা এতো স্পষ্ট যে, তা কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট। যারা ইতিপূর্বে সত্যকে চিনেছে, তারা তেলাওয়াত শুনেই বুঝতে পারে যে, এটাও সেই একই উৎস থেকে আগত, যেখান থেকে কখনো মিথ্যা বলা হয় না। 'এটাও আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরা এর পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।' বস্তুত সকল আসমানী কেতাবে বিশ্বাসীদের ধর্মই হলো ইসলাম তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। 'তাদেরকে তাদের পুরস্কার দুবার দেয়া হবে। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো।' অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বেও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং পুনরায় শুধুমাত্র পড়া শুনেই কোরআনের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা দুবার পুরস্কার পাবে। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো।

এই ধৈর্য কয়েক রকমের। যেমন মনের ও দেহের একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের ওপর এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনার ওপর ধৈর্য ধারণ, অর্থাৎ অবিচল থাকা ও শৈথিল্য প্রদর্শন না করা। আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকা ও টিকে থাকা। এই ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদের দু'বার পুরস্কার দেয়া হবে। কেননা এই ধৈর্য হচ্ছে মনের জন্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর প্রবৃত্তির কামনা বাসনা, লালসা বিকৃতি ও বিপথগামিতার ওপর ধৈর্যধারণ, অর্থাৎ তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা হলো সবচেয়ে কঠিন ধৈর্য। খৃষ্টান কাফেলার লোকেরা এসব কিছুর ওপর ধৈর্য ধারণ করেছিলো। শুধু তাই নয়, তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উত্যক্ত করার ওপরও ধৈর্য ধারণ করেছে। এ কথা ইতিপূর্বে বর্ণনায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। আর গোমরাহ ও অজ্ঞ সমাজে সর্বকালে সর্বত্র দ্বীনের ওপর অবিচল লোকেরা এ ধরনের আচরণের শিকার হয়ে থাকে।

'এবং তারা অন্যায় ও অসততাকে সততা ও ন্যায় দ্বারা প্রতিহত করে।' এটাও এক ধরনের ধৈর্য। উপহাস ও উত্ত্যক্ত করার ওপর ধৈর্য ধারণের চেয়েও এটা কষ্টকর। এতে প্রথমত নিজের অহমিকা দমন করতে হয়, ঠাট্টা বিদ্রূপ, নির্যাতন ও উত্ত্যক্তকরণ প্রতিহত করার ইচ্ছা দমন করতে হয়, নির্যাতন নিপীড়নে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং রাগ ও প্রতিশোধের ইচ্ছা দমন করতে হয়। এ সবের পর আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে উদারতা ও মহানুভবতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। খারাপ ব্যবহারের বিনিময়ে ভালো ব্যবহার করতে হয়। মূর্খ ব্যাংগ বিদ্রূপকারীর জবাবে শান্ত থেকে মহত্ত্ব ও দয়া প্রদর্শন করতে হয়। এটা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের এতো উঁচু স্তর, যেখানে একমাত্র পূর্ণাংগ মোমেনরাই পৌঁছুতে পারে। একমাত্র সেই মোমেনরাই পৌঁছুতে পারে, যারা আল্লাহর সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে যে, তিনিও তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট। ফলে তারা মানুষের সব ধরনের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ও শান্ত থাকে।

'এবং আমার দেয়া সম্পদ থেকে দান করে।'

অর্থাৎ খারাপ ব্যবহারের বিনিময়ে ভালো ব্যবহার দ্বারা মহত্ত্ব ও মহানুভবতাই শুধু প্রদর্শন করে না, সেই সাথে অর্থ দান করার মাধ্যমেও মহানুভবতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করে। বস্তুত এই দুই ধরনের মহানুভবতা একই উৎস থেকে, উদ্ভূত হয়ে থাকে। প্রথমটা আসে মনের আবেগ ও কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করা থেকে যা মানুষের সত্ত্বার ভেতরেই বিদ্যমান। আর দ্বিতীয়টা আসে পার্থিব সহায় সম্পদের চেয়ে বৃহত্তর ও মূল্যবান সহায় সম্পদ অর্জন করা থেকে, যা একমাত্র অর্থ সম্পদ দ্বারাই লাভ করা যায়। প্রায়ই এই দুটো জিনিস কোরআনে এক সাথেই উল্লেখ করা হয়। ইসলামের ওপর অবিচল দৃঢ় প্রত্যয়ী মোমেনদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো,

'যখন তারা কুরুচিপূর্ণ কথা শোনে, তখন তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। তোমাদের ওপর সালাম। আমরা অজ্ঞ লোকদের চাই না।'

'লাগউন' শব্দের অর্থ হলো অন্তসারশূন্য, অর্থহীন ও অনুপকারী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা নিছক সময় নষ্ট করার শামিল। এ জাতীয় কথা হৃদয় ও বিবেককে নতুন কিছু উপহার দেয় না কিংবা এ দ্বারা কোনো লাভজনক জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ধরনের কথাবার্তা নিছক আবেগ অনুভূতি ও জিহ্বাকে নষ্ট করে দেয়। চাই তা কোনো উপস্থিত শ্রোতাকে বলা হোক কিংবা কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কেই বলা হোক।

মোমেন ব্যক্তিরা কখনো এ ধরনের অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন বাজে কথা বলেও না, শোনেও না। কেননা তারা ঈমানী দায়িত্ব পালনে সদা ব্যস্ত থাকে। একমাত্র ঈমানসম্মত রুচি তাদের সব সময় মহৎ কাজে ও মহৎ কথায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ঈমানী জ্যোতিতে তারা সব সময় পবিত্র ও আলোকোদ্ভাসিত থাকে।

'যখন তারা কোনো কুরুচিপূর্ণ কথা শোনে, তখন তা এড়িয়ে যায়।'

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয় না এবং কুরুচিপূর্ণ কথা যারা বলে, তাদের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে একই রকম কুরুচিপূর্ণ বা অর্থহীন কথা বলে না এবং তা নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় না। কেননা কুরুচিপূর্ণ ও অর্থহীন কথা যারা বলে, তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও কুরুচিপূর্ণ বাজে কাজ। তারা তাদের সালাম দিয়ে বিদায় নেয়।

'এবং বলে, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। তোমাদের ওপর শান্তি হোক।'

শিষ্টাচারের সাথে, কল্যাণ কামনার সাথে এবং হেদায়াতের আকাংখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তারা এ কথা বলেছিলো, কিন্তু সেই সাথে তারা তাদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অনিচ্ছাও প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে,

'আমরা অজ্ঞ লোকদের সাথে জড়িত হতে চাই না।'

অর্থাৎ আমরা তাদের সাথে আমাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করা, তাদের আজেবাজে কাজে অংশ গ্রহণ করা কিংবা তা নীরবে শুনে যাওয়া- এর কোনোটাই চাই না।

এ হচ্ছে সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মোমেনদের মানসিকতার একটা বিশুদ্ধ রূপ। তারা আজেবাজে কথা, রুচি বিগর্হিত নিরর্থক কার্যকলাপের উর্ধে অবস্থান করেও মানুষের প্রতি উদার ও সহনশীল থাকে। যারা আল্লাহর শেখানো শিষ্টাচারের অনুসারী হয়ে চায়, তাদের তারা শিষ্টাচারের নীতি পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়। সে নীতি হলো, অজ্ঞ ও অভদ্র লোকদের অপকর্মে অংশ গ্রহণও নয়, আবার তাদের সাথে ঝগড়া-লড়াইও নয়, তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কও নয়, আবার তাদের সাথে বিরক্তিপূর্ণ আচরণও নয়; বরং তাদের কর্মকান্ড থেকে দূরে থেকে উদার আচরণ এবং সকলের জন্যে কল্যাণ কামনা, এমনকি অপরাধীর জন্যেও কল্যাণ কামনা করা।

হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে

আহলে কেতাব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে ঈমান আনয়নকারী এই দলটাকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে রসূল (স.) তাদের কোরআন পড়িয়ে শোনানোর চেয়ে বেশী কিছু করেননি। অথচ তার নিজ জাতির অভ্যন্তরে এমন অনেক লোক ছিলো, যাদের ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করুক- এটা সর্বান্তকরণে কামনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো কারো ভাগ্যে ইসলাম রাখেননি। কেন রাখেননি, সেটা তিনিই জানেন। রসূল (স.) যার ইসলাম গ্রহণ পছন্দ করেন তাকে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারবেন, এমন নিশ্চয়তা আল্লাহ তায়ালা দেননি; বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যাকে ইসলাম গ্রহণের যোগ্য মনে করেন এবং ইসলামের জন্যে প্রস্তুত বলে জানেন, তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। এই কথাটাই বলা হয়েছে ৫৬ নং আয়াতে।

'তুমি যাকে ভালোবাসো, তুমি চাইলে তাকে হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত করেন এবং তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের ভাল জানেন।'

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াত রসূল (স.)-এর চাচা আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আবু তালেব রসূল (স.)-কে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখতেন ও সাহায্য করতেন। তিনি যাতে তাঁর দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছাতে পারেন, সে জন্যে তাঁকে কোরায়শদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন এবং এটা করতে গিয়ে তিনি কোরায়শদের পক্ষ থেকে বনু হাশেম গোত্রকে যে বয়কট করা হয়েছিলো, তাও বরদাশত করেছিলেন, কিন্তু তিনি এসব কিছুই করেছিলেন নিছক আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহের বশে এবং গোত্রীয় গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে। যেদিন তাঁর মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়লো, রসূল (স.) তাকে ঈমান আনা ও ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন, কিন্তু আল্লাহ এটা তার ভাগ্যে লেখেননি এবং এর প্রকৃত কারণ একমাত্র তাঁরই জানা আছে।

যুহরী বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব স্বীয় পিতা মুসাইয়াব বিন হুযন আল-মাখযূমীর বরাত দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, আবু তালেবের যখন মুমূর্ষু অবস্থা, তখন রসূল (স.) তার কাছে এসে আবু জাহল ইবনে হেশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে দেখতে পেলেন।

রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, চাচা, আপনি বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই একটা কথা বললেই আমি এর ওসিলায় আল্লাহর কাছে আপনার জন্যে সুপারিশ করতে পারবো। আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া বললো, হে আবু তালেব, আপনি কি আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? রসূল (স.) বার বার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, আর ওরা দুজনও বার বার তাদের কথা বলতে লাগলো। অবশেষে আবু তালেব যে শেষ কথাটা বললেন, তা ছিলো, 'আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের ওপর।' তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনার যে জিনিস আমি ঠেকাতে পারিনি, তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো। এই সময় আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'নবী ও মোমেনদের পক্ষে মোশরেকদের জন্যে ক্ষমা চাওয়া শোভনীয় নয়। এমনকি তারা যদি আত্মীয়স্বজনও হয়।' (সূরা তাওবা)

আর আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল করলেন, 'তুমি যাকে ভালোবাসো তাকেই হেদায়াত করতে পারো না; বরং আল্লাহই যাকে চান হেদায়াত করেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণনা করেন, আবু তালেবের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তার কাছে এসে রসূল (স.) বললেন, ওহে চাচা, আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। আমি আপনার পক্ষে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবো।' আবু তালেব বললেন, 'কোরায়শ যদি এই কথা বলে আমার দুর্নাম না রটাতো যে, আবু তালেব কেবল মৃত্যুকষ্টের ভয়ে এই কালেমা পড়েছে, তাহলে আমি এই কালেমা পড়ে তোমাকে খুশী করতাম এবং কেবল তোমাকে খুশী করার জন্যেই ওটা পড়তাম। অতপর আল্লাহর এই উক্তিটা নাযিল হলো, 'তুমি যাকেই হেদায়াত করতে চাও .... '

হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, মোজাহেদ, শা'বী এবং কাতাদাহও বলেন, এ আয়াত আবু তালেব সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তার শেষ কথাটা ছিলো, 'আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের ওপর।'

এই হাদীসটা পড়ে যে কোন মানুষ বুঝতে পারে আল্লাহর দ্বীন কতো আপোষহীন এবং কতো পক্ষপাতহীন। রসূলুল্লাহর এই চাচা, যিনি রসূলের অভিভাবক ও রক্ষক ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে ঈমান বরাদ্দ করলেন না। অথচ তিনি রসূল (স.)-কে এবং রসূল (স.) তাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। কারণ রসূলের প্রতি আবু তালেবের যে স্নেহ মমতা ও ভালোবাসা, তা ছিলো আত্মীয়তাজনিত ও পিতৃব্যসুলভ। আকীদা ও আদর্শজনিত নয়। আল্লাহ তায়ালা এটা জানতেন। তাই রসূল (স.) যে কারণে তাকে ভালবাসতেন ও যে জিনিস আশা করতেন, সেটা আবু তালেবের ভাগ্যে রাখেননি। এ কারণে হেদায়াতের ব্যাপারটাকে তিনি রসূল (স.)-এর ক্ষমতার আওতার বাইরে এবং নিজের ইচ্ছাধীন রেখেছেন। নবীর ক্ষমতার আওতায় রেখেছেন শুধু প্রচার ও দাওয়াত। দাওয়াতকারীদের জন্যে তিনি শুধু শুভ কামনা ও হিতোপদেশ বরাদ্দ করেছেন। আর মানুষের হৃদয় রয়েছে দয়াময় আল্লাহর হাতের মুঠোর মধ্যে। বান্দাদের মধ্য থেকে যার ভেতরে হেদায়াতের যোগ্যতা রয়েছে বলে তিনি জানেন তাকে হেদায়াত দান করেন। আর যার ভেতরে গোমরাহীর যোগ্যতা রয়েছে বলে জানেন তাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন।

সমাজের ভয়ে হেদায়াতের পথ পরিত্যাগ করা

এবার মোশরেকদের সেই উক্তিটার উল্লেখ করা হচ্ছে, যা দ্বারা তারা রসূল (স.)-এর অনুসরণে তাদের ওযর বা অসুবিধা ব্যাখ্যা করেছিলো। অসুবিধা হলো, তারা ভয় পেতো যে, রসূল (স.)-এর অনুসরণ করলে প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর ওপর তাদের যে আধিপত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি বর্তমান, তা আর থাকবে না। সে গোত্রগুলো পবিত্র কা'বাকে ভক্তি করে, কা'বার সেবক ও রক্ষকদের তাবেদারী করে এবং কা'বায় রক্ষিত মূর্তিগুলোকে সম্মান করে। কোরায়শরা যদি মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর ঈমান আনে ও তার অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে সে গোত্রগুলো তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, অথবা অন্য শত্রুরা তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু এই গোত্রগুলো কোরায়শদের সাহায্য করবে না। এর জবাবে তাদেরকে তাদের অতীত ও বর্তমানের নিরিখে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের ভয়ভীতি কোন্ দিক থেকে আসে আর নিরাপত্তাই বা কোন্ দিক থেকে আসতে পারে। ইতিপূর্বে এ বিষয়টা ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সাথে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংস বৃত্তান্তও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণটা হলো অহংকার, হঠকারিতা, কৃতজ্ঞতার কমতি, রসূলদের অবিশ্বাস এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অবজ্ঞা করা। এরপর আর কিছু আয়াতে মূল্যবোধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কাছে যেসব নেয়ামত রয়েছে, তার তুলনায় দুনিয়ার জীবন ও তার সহায় সম্পদ নিতান্তই মূল্যহীন তুচ্ছ, এ কথাই এ আয়াতগুলোতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'তারা বলেছে, আমরা যদি তোমাদের সাথে সৎপথের অনুসারী হই, তাহলে আমরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হবো .... ' (আয়াত ৫৭-৬১)

বস্তুত নিতান্ত স্থূল ভাসাবাসা, সীমিত ও জড়বাদী দৃষ্টিভংগিই কোরায়শদের প্ররোচনা দিতো এবং সকল মানুষকে প্ররোচনা দেয় যে, আল্লাহর নির্দেশিত সততা ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করা তাদের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ) ক্ষতির আশংকাবহ। এটা তাদের শত্রুদের উস্কে দেবে, সকল সাহায্য সহযোগিতা থেকে তাদের বঞ্চিত করবে এবং তাদের দরিদ্র ও সর্বহারা বানিয়ে ছাড়বে।

তারা বলেছে, 'আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথের অনুসারী হই, তাহলে আমরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হবো ... '

এ উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে, রসূল (স.)-এর দেখানো পথই যে সৎপথ, সে কথা তারা অস্বীকার করে না। তবে তারা ভয় পায় যে, তাহলে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এই ভয় পাওয়ার কারণ, তারা আল্লাহকে ভুলে যায়, তারা এও ভুলে যায় যে, আল্লাহই একমাত্র রক্ষক এবং আল্লাহ তায়ালা যাকে রক্ষা করেন, পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত হয়েও তাকে বিতাড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না, আর আল্লাহ তায়ালা যাকে লাঞ্ছিত করেন, পৃথিবীর সকল শক্তি মিলিত হয়েও তাকে সাহায্য করতে পারে না। যেহেতু ঈমান তাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, সেহেতু তারা এরূপ চিন্তা করে। ঈমান যদি তাদের হৃদয় স্পর্শ করতো, তা হলে পৃথিবীর সকল শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগি পাল্টে যেতো। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে তাদের মূল্যায়ন ও বিবেচনার ধারা বদলে যেতো। তারা বিশ্বাস করতো, শান্তি নিরাপত্তা আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয় এবং আল্লাহর দেখানো সততা ও হেদায়াতের পথ থেকে থাকা ছাড়া ভীতি ও আশংকার আর কোনো কারণ নেই। এই সৎপথ অবলম্বনই প্রকৃত শক্তি ও সম্মান লাভের সুনিশ্চিত পথ পন্থা। এ কথা শুধু কল্পনা নয় এবং মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্যেও তা বলা হয়নি; বরং এ হচ্ছে একটা

অকাট্য সত্য। কেননা আল্লাহর দেখানো সৎপথ অনুসরণের অর্থই হলো মহাবিশ্ব ও তার শক্তিগুলোর নিয়ম কানুনের সাথে একাত্ম হওয়া এবং তার সাহায্য ও আনুগত্য লাভ করা। আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে এমন এক নীতিমালার অধীন সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালিত করছেন, যা তিনি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো সৎ পথ অনুসরণ করে, সে এই মহাবিশ্বে বিরাজমান সকল অসীম শক্তির সাহায্য লাভ করে, পার্থিব জীবনে এক দুর্জয় শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে।

আল্লাহর দেখানো ও শেখানো সৎপথ বিশুদ্ধ ও নিখুঁত নিরাপদ পার্থিব জীবন যাপনের একমাত্র পথ ও পদ্ধতি এবং একমাত্র গ্যারান্টি। এই জীবন পদ্ধতি যখন বাস্তবায়িত হয় তখন তা আখেরাতের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনেও সুখ শান্তি এবং কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহর শেখানো এই জীবন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখেরাত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং আখেরাতের সুখ ও সাফল্য লাভের জন্যে দুনিয়ার জীবন অচল করে দিতে হয় না। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে সে একই রজ্জু দিয়ে বেঁধে ফেলে। সেই রজ্জু হলো, পৃথিবীতে মনের বিশুদ্ধতা, সমাজের বিশুদ্ধতা ও জীবনের বিশুদ্ধতা। এভাবে দুনিয়ার জীবন আখেরাতের পথ হিসেবে গণ্য হয়। এ জন্যেই বলা হয়েছে, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পৃথিবীকে বেহেশতরূপে গড়ে তোলা ও তার কর্তৃত্ব লাভ করা আসলে আখেরাতের বেহেশত লাভ এবং সেখানে চিরস্থায়ী হওয়ার উপায় ও পন্থা মাত্র। এ জন্যে শর্ত কেবল এই যে, পার্থিব জীবনে আল্লাহর হেদায়াত তথা সৎপথ অনুসরণ করতে হবে এবং সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

মানবেতিহাসে যখনই কোনো মানবগোষ্ঠী আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের আলোকে নিজেদের জীবন সঠিকভাবে গড়ে তুলেছে, তখনই চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার ক্ষমতা, ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে তার আগে তাদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গুরুদায়িত্ব অর্থাৎ পৃথিবীর খেলাফত ও পৃথিবীর সামষ্টিক জীবন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহনের জন্যে প্রস্তুত করেছেন।

আল্লাহর শরীয়ত ও জীবন বিধান অনুসারে চলতে অনেকেই ভয় পায়। আল্লাহর দুশমনদের দুশমনী, ষড়যন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাবলীর ভারে জর্জরিত হবার আশংকা বোধ করে। অথচ এগুলো নিছক ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। কোরায়েশরা যখন বলেছিলো, 'তোমার সাথে আমরাও যদি আল্লাহর হেদায়াতের অনুসারী হই, তাহলে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন তারা যেমন কল্পিত শংকায় বিভোর ছিলো, ঠিক তেমনি। অথচ কোরায়শ ও অন্যান্য আরবরা যখন আল্লাহর বিধান মেনে নিলো, মাত্র ২৫ বছরে বা তার চেয়েও কম সময়ে তারা পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নিজেদের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো।

অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাদের এই কল্পিত শংকা, খোঁড়া অজুহাত তাৎক্ষণিকভাবে খন্ডনও করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন যে, কে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছে? কে তাদের জন্যে কা'বা শরীফের ন্যায় নিরাপদ জায়গা তৈরী করে দিয়েছে? কেইবা সারা দুনিয়ার মানুষের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং সারা পৃথিবীর ফল, ফসল ও পণ্য তাদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করেছে? পৃথিবীর সকল এলাকা থেকে যাবতীয় ফলফলারি আরবে পৌছে যায়। অথচ এসব ফল-ফলারি উৎপাদনের এলাকা এবং মৌসুমে কত ব্যবধান বিভিন্নতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি কি তাদের একটা নিরাপদ হারাম শরীফের অধিবাসী বানাইনি, যেখানে আমার পথ থেকে জীবিকা হিসেবে সকল ফলফলাই পৌঁছে যায়?'

তাহলে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলেই তাদের বিতাড়িত করা হবে, এমন আশংকা তারা কেন বোধ করে? অথচ আল্লাহ তায়ালাই তো তাদের তাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকেই সে নিরাপদ হারাম শরীফের অধিবাসী বানিয়েছেন! যে আল্লাহ তায়ালা তাদের তাঁর ঘোর অবাধ্য থাকাকালেও নিরাপত্তা দান করেছেন, সেই আল্লাহ তায়ালা কিনা তাদেরকে তাঁর ফরমাঁবরদার হওয়ার পর স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে দেবেন!'

'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

অর্থাৎ কোথায় ভয় এবং কোথায় নিরাপত্তা, তা মানুষ জানে না। সব কিছুর চূড়ান্ত ক্ষমতা যে আল্লাহর হাতে, তাও জানে না।

তারা যদি সত্যিই বিতাড়ন, ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের কবল থেকে রেহাই পেতে চায়, তাহলে ধ্বংসের কারণগুলো জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেগুলো থেকে তারা যেন দূরে থাকে।

'আমি এমন বহু লোকালয়কে ধ্বংস করে দিয়েছি। যার অধিবাসীরা তাদের সম্পদের গর্ব করতো। .... ' আয়াত ৫৮)

অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও সম্পদের গর্ব করা এবং তার শোকর না করাই জনপদগুলোর ধ্বংসের কারণ। তাদের যে নিরাপদ হারাম শরীফ দেয়া হয়েছে, সেটাও আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত। তাই এই নেয়ামত নিয়েও গর্ব ও না-শোকরী থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। নচেত যে সমস্ত বিধ্বস্ত জনপদকে তারা চেনে এবং প্রতিনিয়ত দেখে থাকে, সেগুলোর মতোই তাদের ওপরও নেমে আসবে ধ্বংসের করালগ্রাস।

'সেগুলোতে খুব সামান্যই বসবাস করা হয়েছে।' অর্থাৎ সেসব বিধ্বস্ত জনপদ ভয়ংকর ও আতংকজনক রূপ নিয়ে কেবল তাদের পূর্ববর্তী অধিবাসীদের ধ্বংসের বৃত্তান্ত এবং তাদের অহংকার ও গর্বের কাহিনী বলার জন্যে কোনোমতে জনশূন্য অবস্থায় টিকে আছে। সেসব জনপদের সকল অধিবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাউকেই জীবিত রাখা হয়নি। কেউ তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বেঁচে থাকেনি; 'বরং আমি তাদের পরে তাদের উত্তরাধিকারী হয়েছি।'

তবে আল্লাহ তায়ালা সে সকল দাম্ভিক জনপদবাসীকে ধ্বংস করার আগে তাদের প্রধান শহরে কোনো না কোনো রসূল অবশ্যই পাঠাতেন। এটা আল্লাহর নীতি। তাঁর বান্দাদের ওপর দয়া পরবশ হয়ে তিনি নিজের ওপর এই নীতি অপরিহার্য হিসেবে ধার্য করেছেন।

'তোমার মালিক সেসব জনপদবাসীকে ততোক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করেননি, যতোক্ষণ ওই জনপদগুলোর কেন্দ্রস্থলে একজন রসূল না পাঠিয়েছেন। .... ' (আয়াত ৫৯)

কেন্দ্রস্থলে, বৃহত্তম জনপদে বা রাজধানীতে রসূল পাঠানোর যৌক্তিকতা এই যে, এতে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্রস্থল এমন সুবিধাজনক জায়গায় হয়, যেখান থেকে ইসলামের দাওয়াত সকল দিকে ও সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে এ ব্যাপারে কারো কোনো ওযর বাহানা করার অবকাশ থাকে না। শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) প্রেরিত হয়েছিলেন পবিত্র মক্কা নগরীতে, যা ছিলো আরব জনপদের কেন্দ্রস্থল। তিনি তাদের পূর্ববর্তী সেসব জনগোষ্ঠীর ভয়াবহ পরিণাম থেকে সতর্ক করেন, যারা তাদের কাছে সতর্ককারী (রসূল) আগমনের পর তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো।

'জনপদবাসী অত্যাচারী না হলে আমি তাদের ধ্বংস করতাম না।' অর্থাৎ জেনে শুনে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস না করলে আমি তাদের ধ্বংস করতাম না।

এ প্রসংগে বলা হচ্ছে, ইহকালীন জীবনের সমুদয় ধন সম্পদ, সমুদয় উপায়-উপকরণকে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত সম্পদের সাথে তুলনা করলে তা একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়। এ কথাটাই বলা হয়েছে ৬০ নং আয়াতে,

'তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা হলো ইহকালীন জীবনের সহায় সম্পদ ও সাজ সজ্জা। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না?'

পৃথিবীতে মানুষ যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা ভোগ করে, শুধু সেগুলো সম্পর্কেই এই চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়নি, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে স্বাধীনতা, ক্ষমতা, অধিকার, ফল ও ফসল দান করেছেন, শুধু সে সম্পর্কেও এই মূল্যায়ন করা হয়নি, এমনকি অতীতের জাতিগুলোকে আল্লাহ যে ঈর্ষণীয় সম্পদ দান করেছিলেন এবং যার জন্যে তারা অহংকারে মেতে ওঠায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ধ্বংস করেছিলেন, শুধু সে সম্পর্কেও এ মূল্যায়ন নয়। বরঞ্চ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করে, তা যদি নিরাপদে নির্বিঘ্নে ভোগও করতে পারে, তা যদি পূর্ণাংগও হয়, তা যদি টেকসই এবং স্থিতিশীলও হয়, ধ্বংসশীল না হয়, তবুও সেসব পার্থিব সহায় সম্পদ সম্পর্কেই এটা আল্লাহর চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এ সবই 'নগণ্যতম ইহকালীন জীবনের সহায় সম্পদ ও সাজসজ্জা। পক্ষান্তরে যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে সেগুলোই উত্তম ও চিরস্থায়ী।' সেগুলো মানের দিক দিয়েও সর্বোত্তম এবং সময়ের বিচারেও চিরস্থায়ী। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব সহায় সম্পদ ও আল্লাহর কাছে যে সহায় সম্পদ রয়েছে– এই দুই প্রকারের সম্পদের তুলনা করা ও বাছ-বিচার করার জন্যে সূক্ষ্ম বিবেক এবং বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন, যা উভয়ের কোন্‌টার মান কেমন, তা বুঝতে সাহায্য করে। তাই এই বাছ-বিচারের মাধ্যমে যাতে উত্তম জিনিসটা নির্ধারণ করা যায়, সে জন্যে এখানে বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাতে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

অতপর এই পর্বের শেষে ভালো ও মন্দের বাছাইয়ের কাজে সহায়তা করার জন্যে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন,

'আচ্ছা, আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে ওই প্রতিশ্রুত জিনিস পাবেও, সে কি সে ব্যক্তির মতো, যাকে আমি পার্থিব জীবনের সহায় সম্পদ দিয়েছি অতপর তাকে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে?' (আয়াত ৬১)

এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যার সাথে ভালো ভালো পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন এবং যে আখেরাতে সেসব ভালো পুরস্কার সুনিশ্চিতভাবেই পাবে তার চিত্র। এর পাশাপাশি এখানে সেই ব্যক্তির চিত্রও রয়েছে, যে সীমিত ও নগণ্য পার্থিব জীবনের সম্পদ লাভ করেছে, তারপর তাকে আখেরাতে হিসাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে। এই 'উপস্থিত করা হবে' কথাটা দ্বারা স্পষ্টতই বুঝানো হয়েছে যে, তাকে উপস্থিত হতে বাধ্য করা হবে এবং সে মনে মনে আক্ষেপ করবে, দুনিয়ার নগণ্য সীমিত সম্পদের হিসাব দেয়ার জন্যে আজ যদি তার উপস্থিত হতে না হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।

তারা যে বলতো, 'রসূলের আনীত হেদায়াতের অনুসরণ করলে আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়ন করা হবে', তার জবাবেরই শেষ পর্যায়ে এ কথাটা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ তারা সেদিন বুঝবে, এমনকি দুনিয়ার জীবনে যদি নিজ ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িতও হতে হতো, তবুও সেটা ঢের ভালো হতো আখেরাতে হাযির হয়ে হিসাব দিতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে।

আর আল্লাহর হেদায়াতের বাণীর অনুসরণে তো পৃথিবীতে নিরাপদ ও স্বাধীন জীবন যাপন এবং আখেরাতে মুক্তি সফলতা লাভের নিশ্চয়তা রয়েছেই। এমতাবস্থায় একমাত্র অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরাই আল্লাহর বিধান মেনে চলে না। তারা মহাবিশ্বে বিরাজমান শক্তিসমূহের প্রকৃত পরিচয় জানে না। তাই কিসে শান্তি এবং কিসে অশান্তি তাও জানে না। একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরাই আল্লাহর হেদায়াত গ্রহণ করে না, তারা সঠিক জিনিস বাছাই করতে জানে না এবং সে কারণে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে আত্মরক্ষাও করতে পারে না।

সার্বভৌমত্ব মিথ্যা দাবীদারদের করুণ পরিণতি

পরবর্তী পর্বে কেয়ামতের একটা দৃশ্য দেখিয়ে মোশরেকদের শেরেক ও গোমরাহীর শোচনীয় পরিণতি তুলে ধরা হচ্ছে, 'যেদিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা যাদের আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? ....' (আয়াত ৬২-৬৬)

এখানে প্রথম প্রশ্নটাতে হুমকি ও ধমকের সুর ফুটে ওঠেছে, 'তোমরা যাদের আমার শরীক মনে করতে, তারা (আজ) কোথায়?'

আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, আজকের এই কেয়ামতের দিন সেসব শরীকের কোনো অস্তিত্বই নেই, তার অনুসারীরা তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তাদের কোনো সন্ধানও তাদের জানা নেই। কেবল তাদের জনসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা এখন কোথায়।

এ জন্যেই যাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা কোন জবাব দিচ্ছে না। এখানে তাদের জবাব পাওয়া উদ্দেশ্যও নয়। তারা শুধু পরবর্তী প্রজন্মকে বিপথগামী করার এবং আল্লাহর হেদায়াতের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার অপরাধের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করছে। কোরায়শ নেতারাও তাদের অনুসারীদের একই পন্থায় বিপথগামী করতো। এসব কাফের ও মোশরেক কেয়ামতের দিন বলবে,

'হে আমাদের মালিক, এই যে সেসব লোক, যাদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম। আমরা নিজেরা যেমন বিপথগামী হয়েছিলাম, তেমনি ওদের বিপথগামী করেছিলাম। আমরা তোমার কাছে নিজেদের নির্দোষিতা জানাচ্ছি, ওরা আমাদের উপাসনা করতো না।'

অর্থাৎ হে আমাদের মালিক, আমরা ওদের জোরপূর্বক বিপথগামী করিনি। কেননা তাদের মনের ওপর আমাদের কোন জোর খাটতো না। তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় বিপথে চালিত হয়েছে, যেমন আমরাও স্বেচ্ছায় বিপথে চালিত হয়েছি। 'আমরা তোমার কাছে নিজেদের নির্দোষিতা ব্যক্ত করছি।........' অর্থাৎ তাদের বিপথগামী করার দায় থেকে আমরা মুক্ত। 'ওরা আমাদের উপাসনা করতো না।' ওরা মূর্তি ও তোমার রকমারি সৃষ্টির উপাসনা করতো। আমরা নিজেদের তাদের মাবুদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিনি এবং তারাও আমাদের উপাসনা করেনি।

এই পর্যায়ে এসে তারা যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদের প্রসংগে বক্তব্য রেখে অপমান করা হয়েছে।

'আর বলা হবে, তোমাদের শরীকদের ডাকো।....' অর্থাৎ তাদের চরিত্র উদঘাটন না করে পালিও না। তাদের ডাকো। তারা তোমাদের উদ্ধার করুক। কেননা আজ তাদেরই দিন এবং তাদের কাছ থেকেই উপকার গ্রহণের দিন।

সেদিন দুর্গত লোকেরা জানবে যে, ওদের ডেকে কোনো লাভ নেই, কিন্তু তারা বাধ্য হয়ে এই আদেশ মান্য করবে এবং ডাকবে,

'অতপর তারা তাদের ডাকবে। কিন্তু তারা সেই ডাকে কোনই সাড়া দেবে না।'

সাড়া যে দেবে না তা জানাই থাকবে। কেবল তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যেই এই আদেশ দেয়া হবে।

'আর তারা আযাব দেখবে ....'

অর্থাৎ এই সংলাপের মধ্যে আযাব দেখতে পাবে। এই সংলাপের পর আযাব ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

এই চরম মুহূর্তে ইতিপূর্বে তারা যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তাদের কাছে তা পেশ করা হবে, কিন্তু তখন সেটা হবে নিতান্তই অনুশোচনার ব্যাপার। তখন তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কোনোই অবকাশ থাকবে না। অথচ দুনিয়ার জীবনে তা গ্রহণ করার অবকাশ ছিলো। তারা আক্ষেপ করবে–

'যদি তারা হেদায়াত গ্রহণ করতো তবে ভালো হতো।' এরপর পুনরায় তাদের সেই আতংকজনক দৃশ্যপটে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে,

'সেদিন আল্লাহ তাদের ডাকবেন এবং বলবেন, তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?'

তারা কী জবাব দিয়েছিলো সেটা আল্লাহর জানাই আছে। তথাপি এ প্রশ্নটা করা হয়েছে ধমক দেয়া ও অপমান করার উদ্দেশ্যে। কাফেররা এ প্রশ্নের জবাবে নীরব থাকবে। কেননা তারা থাকবে বিপন্ন এবং এর জবাব দেয়ার সাধ্যই তাদের থাকবে না।

'সেদিন তাদের কাছ থেকে সকল তথ্য অন্ধে (উধাও) হয়ে যাবে। ফলে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।'

এখানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে গোটা দৃশ্যপট ও তার কর্মকান্ডের ওপর অন্ধত্বের ভাব ফুটে ওঠেছে, যেন তথ্যগুলোই অন্ধ। তাই তাদের কাছে পৌছতে পারে না। আর তারা কোনো কিছুই জানতে পারে না এবং পরস্পরের সাথে প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান করতে পারে না। এ জন্যে তারা দিশেহারা ও নিশ্চুপ।

'তবে যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তারা অচিরেই সফলকাম হবে।'

এ হচ্ছে বিপরীত দৃশ্য। একদিকে মোশরেকদের দুর্দশা যখন চরম, তখন তাওবাকারী, ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীলদের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ পথ অবলম্বনে সকলেরই স্বাধীনতা রয়েছে।

আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা

পরবর্তী কটা আয়াতে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সব কিছুর নির্ভরশীলতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন। তিনিই সব কিছু জানেন। দুনিয়া আখেরাতে সব কিছুরই চূড়ান্ত পরিণতি তাঁর হাতে নিবদ্ধ। আদি অন্তে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। পৃথিবীতে তাঁরই সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব বিরাজ করে, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহর বান্দাদের কোনই ক্ষমতা ও অধিকার নেই নিজেদের এবং অন্যদের জন্যে কোনো কিছু নির্ধারণ করার। এ ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। ৬৮ থেকে ৭০ পর্যন্ত আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য।

কাফেরদের 'তোমার আনীত হেদায়াতের বাণীর অনুসরণ করলে আমরা আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবো,' এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর এবং কেয়ামতের দিন তাদের শেরেক ও

বিপথগামিতার যে পরিণতি হবে, তা পর্যালোচনার পর এ আয়াতগুলোতে এই কথাগুলো বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের জন্যে কোনো নির্বাচনের ক্ষমতাই রাখে না যে, ভীতি কিংবা নিরাপত্তা নির্বাচন করবে। এতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এক এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

'তোমার প্রভু যা কিছু চান সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচন করেন। তাদের কোনো নির্বাচনের ক্ষমতাই নেই।'

এটা এমন এক বাস্তব সত্য, যা অনেকেই সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ভুলে যায়। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু ইচ্ছা করেন স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেন, কেউ তাঁকে পরামর্শ বা প্রস্তাব দিতে পারে না, কেউ তাঁর সৃষ্টিতে কম বেশী করতে কিংবা পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারে না। তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন যে কোনো কাজ বা পদমর্যাদার জন্যে মনোনীত করেন। কেউ তাঁর কাছে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বা কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটানোর জন্যে কথা বা কাজের মাধ্যমে সুপারিশ করতে পারে না। 'তাদের কোনোই নির্বাচনী ক্ষমতা নেই।' অর্থাৎ নিজের ব্যাপারেও নয়, অন্যের ব্যাপারেও নয়, ছোট বড় সকল ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

এই বাস্তব সত্য যদি মানুষের মনে বদ্ধমূল থাকে, তাহলে মানুষ তার কোন বিপদ মসিবতেই উদ্বিগ্ন হতে পারে না, কোনো সুখকেই সে বড়ো কিছু মনে করতে পারে না, কোন কাংখিত জিনিস হারিয়ে সে দুঃখিত হতে পারে না। কেননা এ সব জিনিস নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের কোনো হাত নেই. হাত শুধু আল্লাহর।

তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, মানুষ তার বিবেক বুদ্ধির চর্চা, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ও চেষ্টা সাধনা বন্ধ করে দেবে। এর অর্থ এই যে, মানুষ তার সাধ্যমতো চিন্তা গবেষণা, পরিকল্পনা, চেষ্টা-সাধনা ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পর তার ভাগ্যে যা ঘটবে, তা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। কেননা মানুষের হাতে শুধু চেষ্টা-সাধনার ক্ষমতাই রয়েছে। এরপর সব কিছু আল্লাহর হাতে।

মোশরেকরা তাদের কল্পিত দেবদেবীকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো। অথচ আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাঁর সৃষ্টিতে ও ক্ষমতায় কেউ তাঁর শরীক নেই।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল শেরেকের উর্ধ্বে ও তা থেকে পবিত্র।'

'আর তোমার প্রভু তাদের ভেতরে লুকানো বা প্রকাশিত সব কিছুই জানেন।'

তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি যা জানেন সে অনুসারে তাদের কর্মফল দেবেন। তারা যে জিনিসের যোগ্য, তা-ই তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করবেন। গোমরাহীর যোগ্য হলে গোমরাহী এবং সৎপথের যোগ্য হলে সৎপথ দেখাবেন।

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'

সুতরাং তাঁর সৃষ্টিতে ও মনোনয়নে তাঁর কোনো শরীক নেই।

'আদিতে ও অন্তে একমাত্র তাঁরই জন্যে সকল প্রশংসা। তাঁর নির্বাচন ও মনোনয়ন, তাঁর নেয়ামত, তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য এবং তাঁর সুবিচার ও দয়ার জন্যে তাঁর সমস্ত প্রশংসা। একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য।

'একমাত্র তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।' তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কেউ তা রদও করতে পারে না, বদলাতেও পারে না।

'এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।'

'তখন তিনিই তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন।'

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা, একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ইচ্ছা করার ক্ষমতা এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব ব্যাপারে অবগত থাকার অনুভূতি ও চেতনা দান করেন। বান্দাদের কোনো কিছুই তাঁর অজানা থাকে না। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে, কেউ পালাতে পারবে না। সুতরাং তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যখন কেউ যেতে পারে না তখন তার সাথে অন্যকে শরীক করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

এরপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য অবলোকন করান। এই প্রকৃতিতেই তারা বাস করে। অথচ এখানে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাদের জন্যে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করে চলেছেন এবং তাদের জীবন যাপন ও আয় উপার্জনের জন্যে বিভিন্ন পন্থা নির্বাচন করছেন, সে সম্পর্কে একেবারেই তারা উদাসীন। বিশেষত দুটো বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনা– রাত ও দিনের অন্তরালে আল্লাহর একত্বের যে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, সে সম্পর্কে তাদের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন।

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো আল্লাহ তায়ালা যদি রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করতেন ....' (আয়াত ৭১-৭৩)

মানুষ যেহেতু দিন ও রাতের আগমন দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই দিন রাতের এই পুন পুন আবির্ভাব ও তিরোভাব সে ভুলে যায়। সূর্যের উদয়াস্তের দৃশ্য তাকে তেমন বিস্মিত করে না। রাতের বিদায় ও দিনের আগমন তাকে রোমাঞ্চিতও করে না। এভাবে আবহমানকাল ধরে দিন ও রাতের আবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি যে আল্লাহর কতো দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে এবং ক্ষয়, ধ্বংস, নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা ও স্থবিরতা প্রতিহত করা হচ্ছে, তা সে ভেবে দেখে না।

কোরআন মানুষকে একটা ভিন্নতর অবস্থার কথা কল্পনা করার আহ্বান জানায়। যদি রাত চিরস্থায়ী হতো অথবা দিন চিরস্থায়ী হতো, তা হলে কেমন হতো ভেবে দেখার আহ্বান জানায়। কল্পিত এই উভয় অবস্থার ফলাফল সম্পর্কে তাকে আতংকিত করে তোলে। এভাবে সে তার দিনরাতের আবর্তনের চিরাচরিত দৃশ্য দর্শনে অভ্যস্ততাজনিত একঘেঁয়েমি ও জড়তা দূর করে। চার পাশের প্রকৃতি ও তার গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যসমূহের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জন্যেই সে এই কল্পনার আশ্রয় নেয়। কারণ মানুষ কোনো জিনিস না হারানো পর্যন্ত অথবা হারানোর আশংকা বোধ না করা পর্যন্ত তার মূল্য বোঝে না। বলা হয়েছে,

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি শুনতে পাও না?'

শীতকালে রাত সামান্য একটু লম্বা হয়ে যায়। তাতেই মানুষ প্রভাত দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ক্ষণেকের জন্যে সূর্য মেঘে ঢাকা পড়লে মানুষ অস্থির হয়ে ভাবতে থাকে, কখন সূর্যের কিরণ আবার বেরিয়ে আসবে। আর এই কিরণ যদি চিরতরেই চলে যায় এবং কেয়ামত পর্যন্ত রাত স্থায়ী হয়, তাহলে উপায়? এ প্রশ্ন তো রাখা হয়েছে সকল মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে ধরে নিয়ে। নচেত দিন যদি একেবারেই না আসে, তাহলে তো এ পৃথিবীতে কোনো জীবের বেঁচে থাকাই আদৌ সম্ভব নয়।

পুনরায় বলা হয়েছে,

'বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকে তোমাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত নিয়ে আসবে? তোমরা কি দেখতে পাও না?(১)

দিনের বেলায় যখন দুপুরের খরতাপ অতিরিক্ত কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ হয়, তখন মানুষ ছায়ার জন্যে কেমন উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং গ্রীষ্মের সময় যখন দিন কয়েক ঘন্টা লম্বা হয়, তখন মানুষ রাতের জন্যে কেমন অস্থির হয়ে ওঠে, তা আমাদের সবার জানা আছে। এ সময় রাতের আধার ও নিস্তব্ধতাই হয়ে ওঠে বিশ্রাম এবং আশ্রয়ের প্রধান অবলম্বন।

আসলে শুধু মানুষের নয়, বরং প্রাণী মাত্রেরই রাতের বিশ্রামের প্রয়োজন। দিনের বেলার পরিশ্রমে যে শক্তি ক্ষয় হয় রাতের বিশ্রামে সেই শক্তি পুনর্ববহাল হয়। মানুষকে যদি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত ধরে নেয়া হয় এবং দিন যদি কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহলে সে কিভাবে বিশ্রাম নেবে ও হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করবে? প্রকৃতপক্ষে দিন যদি কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহলে এই জীবজগত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য।

আসলে প্রতিটা বস্তু সুপরিকল্পিত এবং মহাবিশ্বের ছোট বড় সকল জিনিসই নিয়ন্ত্রিত। সকল জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ও পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা ধার্য করে রেখেছেন।

'এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত এবং আল্লাহর রবাদ্দকৃত অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করার জন্যে দিন সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।'

বস্তুত রাত বিশ্রাম ও আরামের সময় আর দিন কাজের এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোঁজার সময়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যা কিছুই দেন তা তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। 'যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যে রহমত ও নেয়ামত দিয়ে তোমাদের খুশি করেন, রাত দিনের আবর্তনের ব্যবস্থা করে এবং জীবনের অন্য সকল উপকরণ সরবরাহ করে যে অনুগ্রহ করেন তার জন্যে কৃতজ্ঞ হও। এসব উপকরণ তোমরা সংগ্রহ করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর অনুগ্রহ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা এগুলো সরবরাহ করেছেন। অথচ তোমরা এগুলো ক্রমাগত দেখতে দেখতে ও ভোগ করতে করতে তাঁর সেই অনুগ্রহ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা ভুলে যাও, উদাসীন হয়ে যাও।

আল্লাহ তায়ালা এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানছেন অতি সংক্ষেপে কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরে, তাদের কল্পিত শরীকদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে এবং তাদেরকে তাদের ভিত্তিহীন দাবী দাওয়ার মুখোমুখি করে এ বক্তব্য সমাপ্ত করছেন। কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে তাদের কল্পিত সেসব শরীক তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

'যেদিন আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের সম্বোধন করবেন এবং বলবেন, তোমাদের কল্পিত আমার সেই শরীকরা আজ কোথায়? আজ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন সাক্ষী হাযির করবো তারপর বলবো, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো। তাদের কল্পিত মিথ্যা শরীকরা (তখন) উধাও হয়ে যাবে।'

---

(১) যখন রাতের চিরস্থায়ী হওয়ার কথা বলেছেন তখন বলেছেন, 'তোমরা কি শুনতে পাও না? আর যখন দিনের চিরস্থায়ী হওয়ার উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন, 'তোমরা কি দেখতে পাও না?' এর কারণ এই যে, রাতের বেলা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজই প্রধান। আর দিনের বেলা দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ প্রধান। এটা কোরআনের ভাষাগত শৈল্পিক নৈপুণ্যের একটা উল্লেখযোগ্য দিক।

কেয়ামতের দিনের এই সম্বোধন ও শরীক সংক্রান্ত প্রশ্নের বিবরণ পূর্ববর্তী একটা সূরায় এসেছে। এখানে একটা নতুন দৃশ্য তুলে ধরার কারণে সে বিবরণের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখানকার এই নতুন দৃশ্য হল প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন সাক্ষী হাযির করা সম্বলিত। এই সাক্ষী তাদের নবী, সে জাতি তাঁর দাওয়াতে কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। 'আন্-নায্‌য়্', শব্দের অর্থ হলো প্রচন্ড জোরে কোনো কিছুকে নাড়ানো। এখানে এ শব্দটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের নবীকে তাদের মধ্য থেকে বের করে এনে খুবই লক্ষণীয় করে দাঁড় করানো হবে- যাতে তার জাতি সম্পর্কে তিনি এবং তার সম্পর্কে তার জাতি সাক্ষ্য দিতে পারে। আর এই সাক্ষীর সামনেই তাদের কাছ থেকে তাদের আকীদা ও কর্ম সম্পর্কে প্রমাণ এবং সনদ চাওয়া হবে, কিন্তু তারা কোনো সনদ দেখাতে পারবে না। সেদিন সনদ ছাড়া গলাবাজি করারও কোনো সুযোগ থাকবে না,

'অতপর তারা জানবে যে, সত্য কেবল আল্লাহর জন্যে।' অর্থাৎ সমস্ত সত্য নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্যে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

'তাদের কল্পিত মিথ্যে শরীকরা সব তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।' অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় তারাও তার কাজে লাগবে না। আর তিনিও তাদের কোনো উপকার করতে পারবেন না।

এখানে ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর পর্যালোচনা শেষ হচ্ছে, এ পর্যালোচনা শ্রোতার মন ও বিবেককে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, দৃশ্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট জগতগুলোতে টেনে নিয়ে যায়, দুনিয়া থেকে আখেরাতে ও আখেরাত থেকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে নেয়। এ পর্যালোচনা মানুষকে প্রকৃতির বিভিন্ন দিক, মানব সত্ত্বার অন্তর্নিহিত অংশ, অতীত জাতিগুলোর ধ্বংস বৃত্তান্ত এবং জীবন ও জগতের বিধি বিধান সম্পর্কে বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য অবহিত করে। সেই সাথে সে সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে এগুলোর সমন্বয় ঘটায়। সমন্বয় ঘটায় সূরার প্রধান দুটো কাহিনীর সাথেও। একটা হলো হযরত মূসার কাহিনী এবং অপরটা কারুনের কাহিনী। প্রথমটা তো অলৌকিকভাবে সংঘটিত হয়েছে। এবার আমরা দ্বিতীয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا

تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ

الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا

أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ

مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ

الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

রুকু ৮

৭৬. নিসন্দেহে কারূন ছিলো মূসার জাতির লোক, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে তাদের ওপর ভারী যুলুম করেছিলো, (অথচ) আমি তাকে (এতো) বিশাল পরিমাণ ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, তার (ভান্ডারের) চাবিগুলো (বহন করা) একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো (একটা) কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তার জাতির লোকেরা তাকে বললো, (ধন সম্পদ নিয়ে) দম্ভ করো না, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। ৭৭. (এবং এই যে সম্পদ) যা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ তালাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) অংশ (পরকালে নিয়ে যেতে হবে) তা ভুলে যেয়ো না এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার ওপর মেহেরবানী করেছেন, তুমিও তেমনি (তাঁর পথে তা ব্যয় করে তাঁর বান্দাদের ওপর) দয়া করো, (সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেয়ো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদী লোকদের ভালোবাসেন না। ৭৮. কারূন (একথা শুনে) বললো, এ (বিশাল) ধন সম্পদ আমার জ্ঞান (ও যোগ্যতা)-বলেই আমাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এ (মূর্খ) লোকটা কি জানতো না, আল্লাহ তায়ালা তার আগে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তি সামর্থে তার চাইতে ছিলো অনেক প্রবল এবং তাদের জমা মূলধনও (তার তুলনায়) ছিলো অনেক বেশী; অপরাধীদের তাদের অপরাধ (-জনিত অজুহাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। ৭৯. অতপর (একদিন) সে তার লোকদের সামনে (নিজের শান শওকতের প্রদর্শনী করার জন্যে) জাঁকজমকের সাথে বের হলো; (মানুষদের মাঝে) যারা পার্থিব জীবনের (ভোগবিলাস) কামনা করতো তখন তারা বললো, আহা! (কতো ভালো হতো) কারূনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকতো, আসলেই সে মহাভাগ্যবান ব্যক্তি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ أَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮০. (অপরদিকে) যাদের (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললো, ধিক তোমাদের (সম্পদের) ওপর, (বস্তুত) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালার দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর তা শুধু ধৈর্যশীলরাই পেতে পারে। ৮১. পরিশেষে আমি তাকে এবং তার (ঐশ্বর্যে ভরা) প্রাসাদকে যমীনে গেড়ে দিলাম। তখন (যারা তার এ সম্পদের জন্যে একটু আগেই আক্ষেপ করছিলো তাদের) এমন কোনো দলই (সেখানে মজুদ) ছিলো না, যারা আল্লাহ তায়ালার (গযবের) মোকাবেলায় তাকে (একটু) সাহায্য করতে পারলো, না সে নিজে নিজেকে (গযব থেকে) রক্ষা করতে পারলো! ৮২. মাত্র গতকাল (সন্ধ্যা) পর্যন্ত যারা তার জায়গায় পৌঁছার কামনা করছিলো, তারা আজ সকাল বেলায়ই বলতে লাগলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান (তার জন্যে) রেযেক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে চান (তার জন্যে) তা সংকীর্ণ করে দেন, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরও তিনি (কারূনের মতোই আজ) যমীনের ভেতর পুঁতে দিতেন; (আসলেই) কাফেররা কখনোই সফলকাম হয় না।

রুকু ৯

৮৩. এটা হচ্ছে আখেরাতের (চির শান্তির) ঘর, আমি এটা তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছি যারা দুনিয়ায় (কোনো রকম) প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় না– না তারা (যমীনে) কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, শুভ পরিণাম তো (এই) পরহেযগার মানুষদের জন্যেই রয়েছে। ৮৪. যে ব্যক্তিই (কেয়ামতের দিন কোনো) নেকী নিয়ে হাযির হবে, তাকে তার (পাওনার) চাইতে বেশী পুরস্কার দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (সে যেন জেনে রাখে), যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদের কেবল সেটুকু পরিমাণ শাস্তিই দেয়া হবে, যে পরিমাণ (মন্দ তারা নিয়ে এখানে) হাযির হবে।

তাফসীর

আয়াত ৭৬-৮৪

সূরার প্রথমাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিলো মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী। রাষ্ট্রীয় শক্তি ও শাসন ক্ষমতা কতো দাপট ও দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী হয়ে থাকে এবং যুলুম, আগ্রাসন, আল্লাহর নাফরমানী, অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণামে এই প্রবল প্রতাপান্বিত রাষ্ট্র শক্তিও কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সেটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আসছে কারূনের কেসসা। এ কেসসাতে দেখানো হয়েছে ধন সম্পদ ও জ্ঞানের ক্ষমতা কতো, আর জনগণের ওপর স্বৈরাচার, যুলুম ও অহংকার চাপিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণামে তা কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সাথে সাথে এতে প্রকৃত মূল্যবোধ কী, তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ঈমান ও সচ্চরিত্রের সামনে পার্থিব সহায় সম্পদ এবং জাঁকজমকের মূল্য খাটো করে দেখানো হয়েছে। আর দুনিয়ার হালাল ও পবিত্র ধন সম্পদ ভোগ করতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পৃথিবীতে বড়াই না করা ও বিপর্যয় সৃষ্টি না করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। কারূ কারূ

ধনকুবের কারূনের ধ্বংসের ইতিহাস

এখান থেকে শুরু হয়েছে ধন সম্পদ পেয়ে অহংকারী হয়ে যাওয়া কারূনের কাহিনী, তবে এই কাহিনীর সময় ও স্থান সম্পর্কে কোরআন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানায়নি। শুধু এতোটুকু বলেছে যে, কারূন মূসার গোত্রেরই একজন লোক ছিলো এবং সে তার গোত্রের ওপর যুলুম নিগ্রহ চাপিয়ে দেয়। এই ঘটনা কি বনী ইসরাঈলের ও হযরত মূসার মিসরে থাকাকালে এবং তাদের নির্বাসনের আগেই ঘটেছিলো, না তারপরে হযরত মূসার জীবদ্দশায় বা তার ইন্তেকালের পর ঘটেছিলো? এ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে,

কারও কারও মতে কারূন ছিলো হযরত মূসার চাচাতো ভাই এবং এ ঘটনা হযরত মূসার জীবদ্দশায় ঘটে। অন্যান্য বর্ণনায় আরো বাড়তি তথ্য রয়েছে যে, কারূন হযরত মূসাকে উত্যক্ত করতো এবং সে এক মহিলাকে ঘুষ দিয়ে এই মর্মে সম্মত করে যে, সে হযরত মূসার ওপর তার সাথে ব্যভিচার করার অপবাদ আরোপ করবে। আল্লাহ তায়ালা যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে হযরত মূসাকে অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি দেন এবং কারূনকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হয়।

এসব বর্ণনার সব কটা আমাদের প্রয়োজন নেই। কোথায় ও কবে এ ঘটনা ঘটেছিলো, তাও জানা অনাবশ্যক। ঘটনাটা কোরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঘটনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তাই যথেষ্ট। যে মূল্যবোধ ও নীতিমালা বর্ণনা করার জন্যে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর জন্যে এ ঘটনা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর স্থান, কাল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনা করলে যদি এ কাহিনীর তাৎপর্য কিছু বাড়তো, তাহলে কোরআন সেসব খুঁটিনাটির কিছুই উল্লেখ করতে বাদ দিতো না। এবার দেখা যাক, ঘটনাটা কোরআনে কিভাবে এসেছে। অন্য সব বর্ণনার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

'কারূন মূসার গোত্রের লোক ছিলো। সে তাদের ওপর অত্যাচার চালালো। ....' (আয়াত ৭৬, ৭৭ ও ৭৮)

এভাবেই কাহিনীটা শুরু হয়েছে। এর নায়ক কারূন। কারূনের গোত্র হযরত মূসারই গোত্র। গোত্রের লোকদের সাথে তার আচরণ ছিলো অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক। আর এই অত্যাচারের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কারণটা হলো তার প্রাচুর্য। 'আমি তাকে এতো সম্পত্তি দিয়েছিলোম যে, তার চাবিগুলো বহন করতে একটা শক্তিশালী দলও হিমশিম খেতো।'

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী ঘটনাবলী, তদসংক্রান্ত কথাবার্তা ও মানসিক প্রতিক্রিয়াসমূহ।

মূসার স্বগোত্রীয় এই কারূনকে আল্লাহ তায়ালা বিপুল ধন সম্পদ দান করেছিলেন। তার ধন সম্পদ এতো বেশী ছিলো যে, তার আধিক্য বুঝাতে সে ধন সম্পদকে 'কুনুয' বলা হয়েছে। 'কুনুয' হচ্ছে 'কান্‌য' শব্দের বহুবচন। 'কান্‌য' বলা হয় সেই ধন-সম্পদকে, যা ভোগ, ব্যবহার ও লেনদেনে খাটানো সম্পদের অতিরিক্ত হওয়ার কারণে লুকিয়ে পুঁজি করে রাখা হয়। কারূনের ধন-সম্পদের বিপুলতা বুঝাতে আরো একটা কথা বলা হয়েছে। সেটা এই যে, অত্যন্ত শক্তিশালী লোকদের একটা দলও তার চাবিগুলো বহন করতে হিমশিম খেতো। এ কারণে কারূন তার গোত্রের লোকদের ওপর আগ্রাসন চালাতো। সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি সে কিভাবে আগ্রাসন চালাতো, যাতে করে বুঝা যায়, সে নানা উপায়ে এবং অজ্ঞাত সংখ্যক পন্থায় আগ্রাসন চালাতো। হয়তো বা সে তাদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ চালাতো এবং তাদের জমিজমা ও অন্যান্য সহায় সম্পদ দখল করার মাধ্যমে আগ্রাসন চালাতো, যেমন বহু অত্যাচারী ধনীকরা চালিয়ে থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে, তার সম্পদে জনগণের যে প্রাপ্য ছিলো, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করতো। এটাও এক ধরনের আগ্রাসন। কেননা ধনীকদের সম্পদে গরীবদের অধিকার থাকে, যাতে সম্পদ কেবল ধনীকদের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান না থাকে। চারদিকে যেখানে অভাবী ও বঞ্চিতদের ভীড়, সেখানে তাদের বঞ্চিত করে শুধু ধনীকরাই যদি ভোগ করতে থাকে, তাহলে জনমনে অসন্তোষ ধূমায়িত হবে এবং জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠবে। হয়তো এই দুই পন্থায় কিংবা আরো বহু পন্থায় সে অত্যাচার চালাতো।

যাই হোক, তার গোত্রের মধ্যে এমন ব্যক্তিরও অভাব ঘটেনি, যে কারূনকে এসব অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা যে পথে অর্থ ব্যয় করলে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই পথে অর্থ ব্যয় করার উপদেশ দিয়েছে। এটা এমন একটা বিধান, যা ধনীকদের কাছ থেকে তাদের ধন কেড়ে নেয় না; বরং আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে ভোগ করতে বাধ্য করে। আর তার আগে আল্লাহ তায়ালা যে তাদের ধন সম্পদ দান করেছেন তা চেনা এবং আখেরাতে এই ধন-সম্পদের হিসাব দিতে হবে এ কথা মনে রাখার নির্দেশ দেয়।

'তার গোত্র তাকে বললো, তুমি গর্বিত হয়ো না ...... ' (আয়াত ৭৬-৭৭)

এখানে ইসলামী বিধানের সেই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধগুলো একত্রিত করা হয়েছে, যা তাকে অন্য সকল মানব রচিত বিধান থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

'লা-তাফরাহ্' কথাটার শাব্দিক অর্থ হলো 'আনন্দিত হয়ো'না'। তবে এখানে সাধারণ আনন্দ বুঝানো হয়নি। 'বিপুল পুঞ্জীভূত সম্পদের মালিক হওয়া ও ভোগবিলাসে মেতে ওঠার ফলে যে লাগামহীন আনন্দ উল্লাস জন্ম নেয়, যা এমন গর্ব অহংকারের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে যে, সম্পদের মালিক তার দাতা মহান আল্লাহকেই ভুলে যায়, তাঁর প্রশংসা ও শোকর আদায় করার কথা ভুলে যায় এবং সম্পদকে আল্লাহর বান্দাদের ওপর প্রভু হিসেবে চেপে বসার হাতিয়ারে পরিণত করে, সেই আনন্দ বুঝানো হয়েছে।

'আল্লাহ তায়ালা ধন-গর্বিতদের ভালবাসেন না।' এ কথা বলে গোত্রের লোকেরা কারূনকে আল্লাহর দিকে ফেরাতে চেয়েছিলো এবং সম্পদের দম্ভে মানুষের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দাপট দেখানো থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলো।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার একাংশ দিয়ে তুমি আখেরাতের শান্তি অর্জন করো, আর তোমার দুনিয়ার প্রয়োজনীয় অংশকে ভুলে যেও না।' এই কথার ভেতর দিয়ে

ইসলামী বিধানের ভারসাম্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ বিধান সম্পদের মালিকের মনকে আখেরাতমুখী করে এবং তার দুনিয়ার অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করে না; বরং দুনিয়ার অংশ গ্রহণ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে ও নির্দেশ দেয়, যাতে সে বৈরাগ্যবাদী হয়ে পার্থিব জীবনকে দুর্বল ও অর্থহীন না করে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে বহু পবিত্র ও হালাল সম্পদ সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ তা ভোগ ব্যবহার করে এবং উপার্জন ও সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়। এতে করে জীবন বিকশিত, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হবে এবং পৃথিবীতে মানব জাতির খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা তাদের পার্থিব সম্পদ অর্জন ও ভোগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাত। তাই আখেরাতের পথ থেকে তারা কখনো বিপথগামী হয় না এবং পার্থিব সম্পদের ভোগ ব্যবহার করতে গিয়ে আখেরাত সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব বিস্মৃত হয় না। এরূপ দায়িত্ব সচেতন অবস্থায় যেটুকু পার্থিব সম্পদ ভোগ করা হয়, সেটুকু আল্লাহর নেয়ামতের শোকার আদায়, তাঁর নেয়ামত সাদরে গ্রহণ ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বলে গণ্য হবে। সুতরাং এই ভোগ এক ধরনের এবাদাত, যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কার দেবেন।

এভাবে ইসলাম মানব জীবনে ভারসাম্য ও ইনসাফ বাস্তবায়িত করে এবং মানুষকে তার স্বাভাবিক, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করে। এ জীবনে না আছে কোনো বঞ্চনা, আর না আছে স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ।

'আর আল্লাহ তায়ালা যেমন তোমার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি তুমিও মহানুভবতা প্রদর্শন করো।' বস্তুত দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ সম্পত্তি আল্লাহর দান। এই দানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে মহত্ত্ব ও মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তার বদলা ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মানুষেরও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি উদারতা মহানুভবতা দেখানো উচিত।

'পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়িও না।' যুলুম, অত্যাচার ও আগ্রাসন দ্বারা, আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের চিন্তামুক্ত হয়ে লাগামহীনভাবে ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া দ্বারা মানুষের মনে অপর মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা দ্বারা, অবৈধ বা অনুপযুক্ত খাতে অর্থের অপচয় অপব্যয় দ্বারা এবং উপযুক্ত খাতে অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করা দ্বারা অরাজকতা ছড়ানো হয়।

'আল্লাহ তায়ালা অরাজকতাকারীদের ভালবাসেন না।'

যেমন তিনি অর্থগর্বে আত্মহারা লোকদের ভালবাসেন না।

এ ছিলো কারূনের প্রতি তার স্বগোত্রীয়দের উপদেশ। এর জবাবে সে একটামাত্র বাক্য উচ্চারণ করলো, যার ভেতরে অরাজকতা ও বিকৃতির একাধিক উপকরণ নিহিত ছিলো।

'সে বললো, এ সব সম্পদ তো আমি নিজের জ্ঞানের বলেই উপার্জন করেছি।' অর্থাৎ সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকারী আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানই আমাকে এর যোগ্য করেছে। এখন এই সম্পদ ব্যয়ে একটা নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে তোমরা আমাকে আদেশ দিচ্ছো কেন? কেনই বা তোমরা আমার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছো? অথচ আমি নিজের চেষ্টায়ই এ সম্পদ উপার্জন করেছি এবং নিজের জ্ঞানবলেই তার যোগ্যতা লাভ করেছি।

এটা হচ্ছে অহংকারে মাথা বিগড়ে যাওয়া এমন এক ব্যক্তির বক্তব্য, যে তার বিত্ত বৈভবের উৎস কী তা ভুলে গেছে এবং, কী উদ্দেশ্যে তা দেয়া হয়, তাও ভুলে গেছে। প্রাচুর্য তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

পৃথিবীতে এ ধরনের মানুষ বার বার এসে থাকে। অনেকেই মনে করে, তার জ্ঞান ও শ্রমই তার ধন সম্পদের একমাত্র কারণ। তাই সে তার সম্পদ কোথায় ব্যয় করবে এবং কোথায় করবে না, তা দ্বারা সৎ কাজ করবে না অসৎ কাজ করবে, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহর কাছে কোনো হিসাবও তাকে দিতে হবে না এবং তার সন্তোষ বা অসন্তোষের কোনো তোয়াক্কাও তার করতে হবে না।

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। সম্পদ উপার্জনে যে ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনা ব্যয়িত হয়, তারও সে মূল্য দেয়। তবে তার নির্ধারিত হালাল পন্থাগুলোকেই সে মেনে নেয়। ব্যক্তিগত শ্রম সাধনা তার কাছে মূল্যহীন নয়। তবে সেই সাথে সে ব্যক্তি মালিকানার জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়, যেমন সে সম্পদ অর্জন এবং তার উন্নয়নের জন্যেও বিধান দেয়। তার এ বিধান ইনসাফপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ। ব্যক্তিকে তার শ্রমের ফল থেকে ইসলাম বঞ্চিত করে না। তা দ্বারা অবাধ ভোগবিলাসেরও অনুমতি দেয় না এবং কার্পণ্যও করতে দেয় না। সমাজের জন্যে তাকে কিছু অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তা উপার্জন ও উন্নয়নের পন্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সম্পদের খরচ ও ভোগ করার পন্থাও সে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামের এ বিধান সুনির্দিষ্ট এবং এর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ।

কারূন তার গোত্রের লোকদের উপদেশে কর্ণপাত করলো না এবং তার সম্পদ যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত, সে কথাও সে উপলব্ধি করলো না। এ জন্যে সে আল্লাহর বিধানের অনুগতও রইলো না। চরম অহংকারের বশবর্তী হয়ে সে এ সব উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলো। তাই আয়াত শেষ হবার আগেই তার প্রতি হুমকি ও ধিক্কার এবং তার ঘৃণ্য উক্তির জবাব হুমকির আকারে দেয়া হয়েছে,

'সে (কারূন) কি জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বে তার চেয়েও শক্তিশালী ও অধিকতর জনবলসম্পন্ন বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর অপরাধীদের ধ্বংস করার সময় তাদের কাছ থেকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তা করা হয় না।'

অর্থাৎ কারূন যদিও বিপুল শক্তির অধিকারী এবং ধন সম্পদের মালিক হয়ে থাকে, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বে তার চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর ধনবান বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সে যখন জ্ঞানের এতোই গর্ব করে, তখন ইতিহাসের এই অকাট্য সত্যটাও তার জানা উচিত ছিলো। কেননা এই জ্ঞান তাকে ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারতো। কারূনের একথাও জানা উচিত ছিলো যে, তাকে ও তার মতো অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্যে আল্লাহর তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় না। কেননা তারা বিচারকও নয়, সাক্ষীও নয়।

এটা ছিলো কারূনের কাহিনীর প্রথম দৃশ্য। কারূনের অহংকার ও আগ্রাসন, সদুপদেশ প্রত্যাখ্যান, নিজেকে সকল উপদেশের উর্ধ্বে মনে করা, অন্যায় অত্যাচার ও অরাজকতা বিস্তারের কাজ অব্যাহত রাখা, সম্পদের প্রাচুর্যের বড়াই এবং এই বড়াই ও দম্ভের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা ইত্যাকার অপরাধগুলো এই দৃশ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

এরপর আসছে দ্বিতীয় দৃশ্য। এই দৃশ্যে কারূন তার গোত্রের সামনে নিজের জাঁকজমক প্রদর্শন করে। এ সব দেখে তাদের একাংশের মনে আক্ষেপ জন্মে, হায়, এ রকম ধনৈশ্বর্য যদি তাদেরও হতো। কারূন তো অসাধারণ সৌভাগ্যশালী। আর বঞ্চিতরা তাকে দেখে কেবল

আক্ষেপই করছে। অন্য একটা দলের মনে তখন ঈমানী প্রেরণা উজ্জীবিত হয় এবং তা দ্বারা তারা কারূনের ধনৈশ্বর্যের মোহ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যারা কারূনের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিলো, তাদের ঈমানদার ব্যক্তিরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আল্লাহর প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন,

কারূন জাঁকজমক সহকারে তার গোত্রের লোকদের সামনে বেরুলো। যারা দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত ছিলো, তারা বললো, হায় আক্ষেপ! আমাদের যদি কারূনের মতো ধনসম্পদ হতো! সে তো দারুণ ভাগ্যবান।' আর যাদের সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিলো তারা বললো, ধিক তোমাদের, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহর দেয়া পুরস্কারই উত্তম। এটা কেবল ধৈর্যশীলরাই পেয়ে থাকে।'

এভাবে দুনিয়ার প্রলোভনের সামনে তাদের একটা দল পরাজিত হলো। আর অপর দলটা ঈমান, আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান পাওনা আছে তার আশা ও আখেরাতের সওয়াবের প্রত্যয়ের জোরে জয় লাভ করলো। ঈমান ও ধন-সম্পদ এই দুটো জিনিসের কোন্‌টা বেশী মূল্যবান, তা একই দাঁড়িপাল্লায় মাপা হলো,

'যারা দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত, তারা বললো, হায়, আমাদের যদি কারূনের মতো ধন-সম্পদ হতো। সে তো খুবই ভাগ্যবান!'

পার্থিব ধন সম্পদ জাঁকজমকের প্রলোভন সকল যুগে ও সকল দেশে কিছু লোককে প্রলুব্ধ করে থাকে। যারা দুনিয়া চায়, তারাই ওসব দ্বারা প্রলুব্ধ হয় এবং এর চেয়েও সম্মানজনক কোনো প্রাপ্তি বা প্রতিদান থাকতে পারে কিনা, সে কথা ভেবে দেখে না। তারা জিজ্ঞেস করে না, বিত্তশালী ব্যক্তি কিসের বিনিময়ে বিত্ত-বৈভব পেলো এবং পদমর্যাদাধারী কিসের সাহায্যে পদমর্যাদা লাভ করলো। তাই মাছি যেমন মিষ্ট দ্রব্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারাও তেমনি দুনিয়ার সম্পদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাগ্যবান বিত্তশালীদের ধনৈশ্বর্য দেখে তাদের মুখ দিয়ে লালা পড়ে। কিন্তু কতো মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে এবং কতো নোংরা পন্থায় যে তারা তা অর্জন করেছে, সেটা উপলব্ধি করে না।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অনুগত, তাদের কাছে রয়েছে জীবনের মূল্যায়নের ভিন্ন এক দাঁড়িপাল্লা। তাদের চোখে দুনিয়াবী সম্পদের চেয়ে অন্য জিনিস অধিক মূল্যবান। তারা দুনিয়াবী সম্পদের লোভে লালায়িত হয় না। তাদের হৃদয় এর চেয়ে অনেক উচ্চ ও বড়। আল্লাহর অনুগত হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা এতো উচ্চে থাকে যে, তা তাদের আল্লাহর বান্দাদের সামনে নত হতে ও তাদের ঐশ্বর্য দেখে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হতে দেয় না। তারাই হচ্ছে 'প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী'। তাদের কাছে রয়েছে সেই নির্ভুল ওহীর জ্ঞান, যা দ্বারা জীবনকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে,

'যারা জ্ঞান লাভ করেছে, তারা বললো, ধিক তোমাদের', আল্লাহর পুরস্কার ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে উত্তম ....'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা দেবেন, তা এই ধনৈশ্বর্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা কারূনের সম্পদের চেয়ে ভালো। আর এই উচ্চাংগের অনুভূতি ও চেতনার অধিকারী হওয়া একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। যারা মানুষের ধন সম্পদের মাপকাঠি ও মানদন্ড দ্বারা

উত্তম অধম নিরূপণ করে না, যারা দুনিয়ার জীবনের সকল প্রলোভন জয় করতে পারে এবং যারা সকল বঞ্চনা সহ্য করতে পারে, তাদের পক্ষেই এরূপ চেতনা লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের মধ্যে এই মানের ধৈর্য দেখতে পান, তখন তাদের অনুরূপ উচ্চাংগের চেতনা ও অনুভূতি দান করেন। ফলে তারা পৃথিবীর সকল প্রলোভন উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর প্রতিদান লাভ করার জন্যে সর্বান্তকরণে সচেষ্ট হয়।

যখন কারূনের জাঁকজমকের প্রভাবে সামাজিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করল এবং লোকেরা ব্যাপকভাবে তার প্রতি প্রলুব্ধ হতে লাগল, তখন আল্লাহ তায়ালা এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে হস্তক্ষেপ করলেন, দরিদ্র ও দুর্বল জনগণকে প্রলোভনের শিকার হওয়া থেকে অনুগ্রহপূর্বক রক্ষা করলেন এবং কারূনের দর্প অহংকার ভেংগে চুরমার করে দিলেন। কাহিনীর এই তৃতীয় দৃশ্য এভাবে একটা চূড়ান্ত ফয়সালার আকারে আবির্ভূত হল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি কারূন ও তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দিলাম। এখন আল্লাহর আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো দল তার ছিলো না, আর সাহায্য গ্রহণ করতেও সে সক্ষম ছিলো না।'

একটা ক্ষুদ্র বাক্যে জানিয়ে দেয়া হলো এক নিমেষে ঘটে যাওয়া একটা ভয়ংকর ঘটনা, 'আমি তাকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম।' যে মাটির ওপর একদিন সে দোর্দন্ড প্রতাপ খাটাতো, সদম্ভে হুংকার ছাড়তো, সেই মাটির ভেতরেই সে জ্যান্ত প্রোথিত হয়ে গেলো। যেমন কর্ম ঠিক তেমন ফলই সে পেলো। একেবারেই দুর্বল অসহায় ও অক্ষম অবস্থায় সে ধরাপৃষ্ঠ থেকে পাততাড়ি গুটালো। কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না এবং নিজের অগাধ ধন সম্পদ ও পদমর্যাদা কাজে লাগিয়ে সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না।

এই সাথে অবসান ঘটলো সেই ভয়ংকর ফেতনার, যা অনেককে বিপথগামী করতে শুরু করে দিয়েছিলো। কারূনের ধ্বংসলীলা মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিলো এবং তাদের মন থেকে সকল বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা দূর করে দিলো। এটাই ছিলো কাহিনীটার শেষ দৃশ্য।

'যারা গতকাল কারূনের মতো হবার আকাংখা পোষণ করেছিলো, তারা সকাল বেলা বলতে লাগলো .... '

অর্থাৎ আজ তারা আল্লাহকে এ জন্যে প্রশংসা করতে ও ধন্যবাদ দিতে লাগলো যে, গতকাল তারা মনে মনে যে আশা পোষণ করছিলো তা তিনি পূরণ করেননি এবং কারূনকে যেমন ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা তাদের দেননি। কেননা তারা মাত্র একদিন ও এক রাতের মধ্যেই কারূনের শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দর্শন করেছে। তারা উপলব্ধি করেছে যে, প্রাচুর্য ও ধনৈশ্বর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির আলামত নয়; বরং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, বিপুল সম্পদ দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা করেন, তার ওপর অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত না হলেও অন্যান্য কারণে সম্পদ হ্রাস করেন। ধন ঐশ্বর্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষণ হতো তাহলে কারূনকে এমন ভয়ংকরভাবে পাকড়াও করতেন না।

এটা হলো একটা পরীক্ষা। এ ধরনের পরীক্ষার পর আল্লাহ তায়ালা কখনও কখনও বিপদ-মসিবত দিয়ে থাকেন। সবাই জানে, কাফেররা সফলকাম হয় না। কারুন যদিও

খোলাখুলিভাবে কুফরীসূচক কোনো কথা বলেনি, কিন্তু ধন সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে দম্ভ করা ও তা তার নিজের জ্ঞানের কারণে হয়েছে বলে মনে করার দরুন জনগণ তাকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তার ধ্বংসীলালার ধরন দেখে তারা ধরে নিয়েছে, সে কাফেরসুলভ মৃত্যুই বরণ করেছে।

এখানে এসে এই দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটেছে। আল্লাহর সময়োচিত আকস্মিক হস্তক্ষেপ এখানে মোমেনদের বিজয় সূচিত ও ঈমানের পাল্লা ভারী করেছে অতপর, ঘটনার সময়োচিত পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে।

'এটা হলো আখেরাতের সেই বাসস্থান, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের জন্যেই এটা নির্দিষ্ট করেছি। শুভ পরিণাম তো আল্লাহভীরুদের জন্যেই।' (আয়াত ৮৩)

অর্থাৎ কারূনের গোত্রের মধ্য থেকে ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত মোমেনরা যে আখেরাতের কথা বলেছিলো, এ হচ্ছে সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সুদূরপ্রসারী আখেরাত। সেই নির্ভুল ও সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতেই তারা এর কথা বলেছিলো, যে জ্ঞান যাবতীয় জিনিসের যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকে। 'যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না, আমি তাদের জন্যেই এটা নির্দিষ্ট করেছি।' অর্থাৎ যারা নিছক নিজেদের উচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে না, বরং আল্লাহর বিধান জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্যে তৎপর থাকে, আখেরাতের কল্যাণ কেবল তাদেরই প্রাপ্য। তারা দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় না এবং কোনো ফাসাদেও জড়িত হতে চায় না।

'শুভ পরিণাম তো কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যে।'

অর্থাৎ যারা আল্লাহর অসন্তোষকে এড়িয়ে চলে ও তার সন্তোষ কামনা করে তাদের জন্যে।

সেই আখেরাতের বাসস্থানেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুত প্রতিদান দেবেন। সে প্রতিদান হবে সৎকর্মের চেয়ে উত্তম ও বহুগুণ উৎকৃষ্ট। কিন্তু অসৎ কর্মের ফল দেয়া হবে শুধু এক গুণ। বান্দার দুর্বলতার প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার হিসাব সহজ করার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

'যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে সে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে। ....' (আয়াত ৮৪)

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

৮৫. (হে নবী,) যে আল্লাহ তায়ালা এ কোরআন তোমার ওপর অবশ্য পালনীয় করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার (কাংখিত পুণ্য) ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন; তুমি (তাদের) বলো, আমার মালিক এটা ভালো করেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছে। ৮৬. (হে নবী,) তুমি (তো কখনো) এ আশা করোনি, তোমার ওপর কোনো কেতাব নাযিল হবে, (হাঁ, এটা ছিলো) তোমার মালিকের একান্ত মেহেরবানী (যে, তিনি তোমাকে কেতাব দান করেছেন), সুতরাং তুমি কখনো (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) যালেমদের পক্ষ নেবে না। ৮৭. (দেখো,) এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নাযিল হবার পর তারা তোমাকে (এর অনুসরণ থেকে) বিরত রাখবে, (তোমার কাজ হবে) তুমি মানুষদের তোমার মালিকের দিকে আহ্বান করবে এবং নিজে তুমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ৮৮. কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে তুমি অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেইও। তাঁর মহান সত্তা ছাড়া প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল; যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

তাফসীর
আয়াত ৮৫-৮৮

এখানে এ সূরার কাহিনীগুলো শেষ হলো। সেই সাথে এসব কাহিনীর ওপর প্রত্যক্ষ পর্যালোচনাও সমাপ্ত হলো।

মোহাজেরদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওয়াদা

এখন রসূল (স.)-কে এবং তাঁর মাধ্যমে সেদিন তাঁর সাথে মক্কায় অবস্থানকারী সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্বোধন করা হচ্ছে। এ সময় রসূল (স.)-কে তাঁর জন্মস্থান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। তিনি মদীনায় রওনা হয়েছেন কিন্তু পৌঁছেননি। তিনি তখনো মক্কার নিকটবর্তী জুহফাতে ছিলেন। অর্থাৎ তখনও তিনি বিপদ মুক্ত নন। তাঁর চোখ ও মন প্রিয় মাতৃভূমির সাথে লেগে রয়েছে। মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়া তার কাছে কষ্টকর লাগছে। তবে তাঁর দাওয়াত অব্যাহত রাখা তাঁর কাছে তার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত মাতৃভূমির চেয়েও প্রিয় ছিলো। তাই তিনি মদীনায় যাত্রা করেছেন। এই অবস্থায় তাঁকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,

'যিনি তোমার ওপর কোরআন সমর্পণ করেছেন তিনি তোমাকে অবশ্যই তোমার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন ...... '

কেননা তিনি তোমার ওপর কোরআনের দায়িত্ব ও ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ অর্পণ করেছেন। তিনি তোমাকে মোশরেকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না, যারা তোমাকে তোমার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে, তোমার ওপর ও তোমার আন্দোলনের ওপর দমন নীতি চালায় এবং তোমার সাথী মোমেনদের নির্যাতন করে। যে সময়ের ভেতরে তিনি তোমাকে বিজয়ী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে সময়ের ভেতরে তোমাকে বিজয়ী করবেন বলেই তিনি তোমাকে কোরআন দিয়েছেন। আজ তুমি মক্কা থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাকে সাহায্য করা হবে এবং তুমি ওখানে অবশ্যই ফিরে যাবে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা সেই কঠিন ও দুর্যোগময় মুহূর্তে তাঁর বান্দার ওপর এই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নাযিল করার প্রাজ্ঞ পদক্ষেপ নিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তিনি যেন নির্দ্বিধায় ও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁর গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে যেতে পারেন। আল্লাহর ওয়াদা যে সত্য সে ব্যাপারে তাঁর কণামাত্রও সন্দেহ ছিলো না।

আল্লাহর ওয়াদা সর্বকালে আল্লাহর পথের সকল পথিকের জন্যেই সমভাবে কার্যকর। আল্লাহর পথে যে কেউ নির্যাতন ভোগ করবে, ধৈর্যধারণ করবে ও সত্যের ওপর বিশ্বাসী থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী করবেন। যখন সে সাধ্যমতো সকল চেষ্টা সম্পন্ন করে এবং নিজের সকল দায়িত্ব পালন করে, তখন তার সংগ্রাম সাধনাকে সফল করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেন।

হযরত মূসা (আ.)ও যে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেখানে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারপর তাকে দিয়ে দুর্বল বনী ইসরাঈলীদের মুক্ত করেছিলেন এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার দাওয়াত গ্রহণকারীরাই সফল হয়েছিলো। সুতরাং তুমিও তোমার পথে চলতে থাকো এবং তোমার ও তোমার জাতির মধ্যে নিষ্পত্তির দায়িত্ব আল্লাহর ওপর অর্পণ করো, যিনি তোমার ওপর কোরআনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন,

'তুমি বলো, আমার মালিকই ভাল জানেন কে সুপথগামী এবং কে সুস্পষ্ট বিপথগামী।'

আর সুপথপ্রাপ্ত ও বিপথগামীদের কর্মফল দেয়ার কাজটা আল্লাহর ওপর অর্পণ করো।

ইসলামবিরোধীদের সহযোগীতা না করার নির্দেশ

পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তোমাকে কোরআনের দায়িত্ব অর্পণ করা আল্লাহর এক নেয়ামত ও রহমত ছাড়া আর কিছু নয়।.

এই গুরুদায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হবে সে কথা তুমি ভাবতেও পারোনি। এটা এক মহান কাজ, যা তোমাকে করতে না বলা পর্যন্ত তুমি চেয়ে নিতে পারতে না!

'তুমি আশা করতে পারতে না যে, তোমার ওপর কেতাব নাযিল হবে, তবে এটা একান্তই আল্লাহর রহমত হিসেবে নাযিল হয়েছে।'

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে জানা গেলো যে, রসূল (স.) কখনো আবেদন করে রসূল হননি। এটা ছিলো আল্লাহর নিয়োগ। আল্লাহ তায়ালা যে কোনো জিনিসের সৃষ্টি ও নিয়োগে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহর নিয়োগ ও তাঁর কাছ থেকে এর যোগ্যতা না পাওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। আল্লাহর এই নিয়োগ ও মনোনয়ন মানব জাতির ওপর এবং যাকে

নিয়োগ করেন তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ। *রসূল বা নবী হিসেবে কাউকে নিয়োগ দান করে* আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে হেদায়াত করেন। এ অনুগ্রহ শুধু মনোনীত ব্যক্তিরাই পায়, যারা চায় তারা পায় না। আরবে ও বনী ইসরাঈলে অনেকেই শেষ যুগের প্রতিশ্রুত নবী হতে উদগ্রীব ছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকেই শেষ নবী বানালেন, যিনি তা চাননি, আশাও করেননি। যারা এর জন্যে লালায়িত ছিলো ও প্রার্থী ছিলো, তাদের কাউকে রসূল বানাননি। যার ভেতরে এর যোগ্যতা আছে বলে তিনি জানতেন তাকেই রসূল করে পাঠিয়েছেন।

এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তিনি এই কেতাবের মতো নেয়ামত লাভ করার পর কোনোক্রমেই কাফেরদের প্রতি নমনীয় না হন এবং সাবধান করে দিচ্ছেন যেন কাফেররা তাকে আল্লাহর নাযিল করা আয়াতগুলোর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকে বিরত রাখতে না পারে। তাঁকে আরো নির্দেশ দিচ্ছেন যে, শেরেক ও মোশরেকদের মোকাবেলায় তিনি যেন সব সময় নির্ভেজাল তাওহীদ প্রচার করেন। (আয়াত ৮৬-৮৭)

এ হচ্ছে সূরার সর্বশেষ উক্তি। এ দ্বারা রসূল (স.)-এর পথ এবং কুফর-শেরেকের পথ পৃথক করা হয়েছে। এ দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত রসূল (স.)-এর যতো অনুসারী হবে, তাদেরও তাদের পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এ উক্তি তখনই ঘোষিত হচ্ছে, যখন রসূল (স.) হিজরত করে মদীনায় চলে যাচ্ছেন। এ হিজরত ছিলো ইতিহাসের দুটো যুগের মধ্যবর্তী একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

'অতএব তুমি কাফেরদের সহযোগী হয়ো না।'

কেননা কাফেরদের ও মোমেনদের মধ্যে সহযোগিতার কোনো অবকাশ নেই। উভয়ের পথ ভিন্ন। উভয়ের জীবন ব্যবস্থা আলাদা। মোমেনরা হলো আল্লাহর দল আর কাফেররা শয়তানের দল। কাজেই তাদের মধ্যে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না।

'আল্লাহর আয়াতগুলো তোমার ওপর নাযিল হবার পর কাফেররা যেন তোমাকে তা থেকে ফিরিয়ে না রাখতে পারে ...... কাফেরদের চিরাচরিত নীতি হলো, যারা দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত তাদের দাওয়াত থেকে ফেরানো, তা যে কোনো পন্থায় ও যে কোনো কৌশলেই হোক। আর মোমেনদের চিরাচরিত নীতি হলো তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কোনো শত্রু তাদের তা থেকে ফেরাতে পারে না। কেননা তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ রয়েছে। এগুলো তাদের কাছে আমানত রাখা হয়েছে।

'এবং তোমার প্রভুর দিকে ডাকো।' ......

অর্থাৎ খালেসভাবে ও স্পষ্টভাব ডাকো। শুধু আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাও, কোনো জাতীয়তা বা গোত্রপ্রীতির দিকে নয়, কোনো ভূমি বা পতাকার দিকেও নয়, কোনো আর্থিক স্বার্থের দিকেও নয়, কোনো প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার দিকেও নয়। যে ব্যক্তি এই নির্ভেজাল দাওয়াতের অনুসারী হতে ইচ্ছুক, তার হওয়া উচিত, আর যে অন্য কিছু চায় তার জন্যে এ পথ নয়।

'তুমি কোনোক্রমেই মোশরেক হয়ো না।' শেরেক ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করতে দুবার নিষেধ করা হলো। কেননা এটাই ইসলামী আকীদার প্রধানতম মূলনীতি। এর ওপরই ইসলামের সমগ্র আকীদা শাস্ত্র, আইন বিধান ও নীতিমালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এটাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ইসলামী আইন ও বিধান প্রণীত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক আইন প্রণয়নের আগে এই মূলনীতি উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

পুনরায় এই মূলনীতি ঘোষণা করা হচ্ছে,

'তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া আর সব জিনিস ধ্বংসশীল। ফয়সালা করা একমাত্র তাঁরই অধিকার, একমাত্র তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।'

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো অনুগত্য চলে না, আর কারো দাসত্ব চলে না, আর কেউ শক্তির উৎস নয়, আর কেউ আশ্রয়স্থল ও রক্ষক নয়।

'তিনি ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল।' সব কিছুই মরণশীল। সব কিছুই ক্ষয়িষ্ণু। সম্পদ, পদ, ক্ষমতা, জীবন, জীবনোপকরণ, সব কিছুই ধ্বংসশীল। এই পৃথিবী ও এর সকল অধিবাসী, আকাশ ও আকাশের সব কিছু, মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের যেখানে জানা অজানা যত কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ স্থায়ী নয়।

'ফয়সালা একমাত্র তাঁরই অধিকার।' তিনি যা খুশী ফয়সালা করেন, যেমন খুশী শাসন করেন। তাঁর শাসনে কেউ শরীক হয় না। তাঁর ফয়সালা কেউ নাকচ করে না, তাঁর আদেশ কেউ বাধাগ্রস্ত করে না। তিনি যা চান শুধু তাই হয়, আর কিছু হয় না।

'একমাত্র তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।' সুতরাং তাঁর শাসনের বাইরে যাওয়ার জায়গা নেই, তাঁর ফয়সালা এড়িয়ে যাওয়ার এবং তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় নেয়ার উপায় নেই।

এখানে এই সূরাটা শেষ হচ্ছে। এ সূরায় আল্লাহর হাত সদা সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহর দিকে দাওয়াতের আন্দোলনকে তিনি সব সময় প্রহরা দেন ও রক্ষা করেন এবং আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারী শক্তিকে ধ্বংস ও নির্মূল করেন। সবার শেষে ইসলামের মূলনীতি আল্লাহর একত্বের ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তাঁকেই একমাত্র মাবুদ, চিরঞ্জীব মাবুদ, সার্বভৌম মনিব ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারী প্রভু ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে ইসলামের দাওয়াতদাতারা তাঁর ওপর সর্বাত্মকভাবে নির্ভরশীল হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে, অবিচল নিষ্ঠা সহকারে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান।

সূরা আল আনকাবুত

আয়াত ৬৯ রুকূ ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْٓا أَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝٢

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْكٰذِبِيْنَ ۝٣ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۚ سَآءَ مَا

يَحْكُمُوْنَ ۝٤ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٥ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম, ২. মানুষরা কি (এটা) মনে করে নিয়েছে, তাদের (শুধু) এটুকু বলার কারণেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদের (কোনো রকম) পরীক্ষা করা হবে না। ৩. আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী, (আবার ঈমানের) মিথ্যা দাবীদারদেরও তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন। ৪. যারা সব সময় গুনাহের কাজ করে বেড়ায় তারা এটা ধরে নিয়েছে, তারা (বৈষয়িক প্রতিযোগিতায়) আমার থেকে আগে চলে যাবে, (এটা তাদের) একটা মন্দ সিদ্ধান্ত, যা (আমার সম্পর্কে) তারা করতে পারলো। ৫. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ আশা করে, সে আল্লাহ তায়ালার সামনাসামনি হবে (তবে সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত (এ) সময়টা অবশ্যই আসবে; আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। ৬. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার পথে) সংগ্রাম সাধনা করে, সে তো (আসলে) তা করে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত। ৭. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের সেসব দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেবো এবং তারা যেসব নেক আমল করে আমি তাদের সেসব কর্মের উত্তম ফল দেবো। ৮. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ

وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا

فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ۖ وَمَا

هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ

وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

আদেশ দিয়েছি; (কিন্তু) যদি কখনো তারা তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে জবরদস্তি করে, (যেহেতু এ) ব্যাপারে তোমার কাছে (কোনো রকম) দলীল প্রমাণ নেই, তাই তুমি তাদের কোনো আনুগত্য করো না; কেননা তোমাদের তো ফিরে যাবার জায়গা আমার কাছেই, আর তখন আমি অবশ্যই তোমাদের সবকিছু বলে দেবো, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে কে কোথায়) কি করতে! ৯. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদের নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো। ১০. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তাদের আল্লাহর পথে (চলার জন্যে) কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের এ পীড়নকে আল্লাহ তায়ালার আযাবের মতোই মনে করে; আবার যখন তোমার মালিকের কোনো সাহায্য আসে তখন তারা (মুসলমানদের) বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম; (এরা মনে করে,) আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে মোটেই অবগত নন? ১১. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা ঈমান এনেছে, আবার তিনি মোনাফেকদেরও ভালো করে জেনে নেবেন। ১২. কাফেররা ঈমানদারদের বলে, তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ করো, আমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের গুনাহসমূহের বোঝা তুলে নেবো; (অথচ) তারা (সেদিন) তাদের নিজেদের গুনাহসমূহের সামান্য পরিমাণ বোঝাও উঠাতে পারবে না; এরা (আসলেই) হচ্ছে মিথ্যাবাদী। ১৩. (কেয়ামতের দিন) এরা অবশ্যই তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা উঠাবে, (তারপর) তাদের এ বোঝার সাথে (থাকবে তোমাদের) বোঝাও, (দুনিয়ার জীবনে) যতো মিথ্যা কথা তারা উদ্ভাবন করেছে, তাদের অবশ্যই সে ব্যাপারে সেদিন প্রশ্ন করা হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরা আনকাবুত মক্কী সূরা। কোনো কোনো বর্ণনায় প্রথম এগারো আয়াতকে মাদানী বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই এগারো আয়াতে 'জেহাদ' ও মোনাফেকীন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তবে এতদসত্ত্বেও আমাদের মতে, সূরার মক্কী হওয়াই অগ্রগণ্য। ৮ম আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওটা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে এ ঘটনার বিবরণ আসছে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ যে মক্কাতেই সংঘটিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আর এ আয়াতটা মতান্তরে মাদানী বলে কথিত এগারো আয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে পুরো সূরাটাই মক্কী মনে করা আমার কাছে অগ্রগণ্য। তবে এই আয়াতগুলোতে 'জেহাদে'র উল্লেখের কারণ সহজেই বুঝা যায়। কেননা জেহাদের উল্লেখ করা হয়েছে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রসংগে। অর্থাৎ মন দিয়ে জেহাদ করতে বলা হয়েছে, যাতে মোমেনরা ধৈর্য ধারণ করে এবং নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমান ত্যাগ না করে বসে। পূর্বাপর আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার। নেফাকের উল্লেখের ব্যাখ্যাও এভাবেই করা যায়। ঈমানের দাবীদারদের একটা শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য।

সূরাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের বর্ণনাভংগি পরিলক্ষিত হয়। প্রারম্ভিক বর্ণমালা 'আলিফ-লা-ম-মীম।' এরপর ঈমান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়েই সূরার শুরু। অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল যথার্থ ঈমানের পরিচয় ও দায়দায়িত্ব কী, সেটা দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান শুধু মুখ দিয়ে দাবী করার জিনিস নয়। ঈমান হচ্ছে কষ্টকর ও অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকার এবং এর দায়দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করার নাম। কেননা ঈমানের পথ দায়দায়িত্বপূর্ণ ও কাঁটা বিছানো।

দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের পরীক্ষা দেয়া যে প্রত্যেক মোমেনের জন্যে অবধারিত, এ বিষয়টাই সম্ভবত এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। কেননা সূচনায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার পর সমগ্র সূরা জুড়েই হযরত নূহ, ইবরাহীম, লূত, শোয়ায়ব, আদ, সামূদ, কারূন, ফেরাউন ও হামানের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় এটাই যে, ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরিণামে বিভিন্ন রকমের বাধাবিঘ্ন ও যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সকল যুগে সকল প্রজন্মেই অনিবার্য।

এরপর এসব কাহিনীর ওপর পর্যালোচনা চালানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সত্য প্রকাশ ও হেদায়াতের বাণী প্রচারের পথে কিছু লোক ও কিছু শক্তি বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এ সব শক্তির দাপট দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়। কেননা এদের প্রত্যেককেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করেছেন ও ধ্বংস করেছেন। বলা হয়েছে,

'প্রত্যেককেই আমি তার করা অপরাধের দায়ে পাকড়াও করেছি .... ' (আয়াত ৪০)

আর এসব শক্তির উদাহরণ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, এতে তাদের দুর্বলতা ও নগণ্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন –

'যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ মাকড়সার মতো। ......' (আয়াত ৪১)

এরপর যে সত্যের দিকে আল্লাহর নবীরা দাওয়াত দিয়েছেন আর আল্লাহর সৃষ্টিজগতে যে সত্য নিহিত রয়েছে, সেই উভয় সত্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, আর সকল নবীর দাওয়াত ও মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াতকে এক অভিন্ন দাওয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা সবই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। সবই আল্লাহর অনুগত হবার দাওয়াত। এ জন্যে

সর্বশেষ কেতাব কোরআন সম্পর্কেও বক্তব্য এসেছে। মোশরেকেরা এই বক্তব্য কিভাবে গ্রহণ করেছে তাও জানানো হয়েছে। মোশরেকেরা শুধু এই কেতাবে সন্তুষ্ট হয়নি, এই কেতাবে বিশ্বাসীদের জন্যে যে উপদেশ, শিক্ষা ও অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, তা তাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি; বরং তারা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চেয়েছে এবং আল্লাহর আযাব তাড়াতাড়ি আসুক বলে দাবী জানিয়েছে, অথচ জাহান্নাম তো কাফেরদের ঘেরাও করেই রেখেছে।

তারা তাদের যুক্তিতে সব সময় স্ববিরোধী। একদিকে আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিয়ে মৃত পৃথিবীকে কে পুনরুজ্জীবিত করেছে, জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা করেছেন, আর জাহাজে চড়লে তারা কায়মনে আল্লাহকে ডাকে। অথচ এ সব সত্তেও তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক মানে এবং মোমেনদের নির্যাতন করে।

মোশরেক ও মোমেনদের মধ্যে সংঘটিত এই তর্ক-বিতর্ক প্রসংগে আল্লাহ মোমেনদের তাদের জীবনাদর্শের নিরাপত্তার খাতিরে বিদেশে হিজরত করার আহ্বান জানিয়েছেন (আয়াত ৫৬) এবং এ ব্যাপারে মৃত্যু ও ক্ষুধার ভয় সম্পর্কে নির্ভীক থাকতে বলেছেন। কেননা, 'প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা অনিবার্য'...... (আয়াত ৫৭) এবং আল্লাহ তোমাদের ও সকল প্রাণীর জীবিকা দিয়ে থাকেন।' .... (আয়াত ৬০)

সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের প্রশংসা এবং তাদের সৎপথে অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

'যারা আমার পথে জেহাদ করে, তাদের আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ এসব সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।' (আয়াত ৬৯)

এভাবে সূরার সূচনায় ও সমাপ্তিতে অপূর্ব মিল দেখতে পাওয়া যায়, সূরার পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে, এর মধ্যে চমৎকার এককেন্দ্রিকতা এবং বিষয়গত সমন্বয় ও একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়।

সমগ্র সূরায় আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীভূত হলেও সূরাটা তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য ও পরিচয়। নানা রকমের বিপদ মসিবতের আকারে ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর নীতি। মোমেন, কাফের ও মোনাফেকদের পরিণাম এবং অন্যদের বিপথগামী করার দরুন পাপের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়া সত্তেও কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের নিজ নিজ পাপের জন্যে নিজেকেই জবাবদিহি করার অপরিহার্যতা।

দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ওপরে যেসব কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো। এসব কাহিনী থেকে ইসলামের দাওয়াতের পথে বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের অনিবার্যতা সম্পর্কে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং আল্লাহর শক্তির সামনে সেসব বাধা-বিঘ্ন আরোপকারীদের শক্তির নগণ্যতা সংক্রান্ত বক্তব্য। এই সাথে নবীদের দাওয়াত ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে যে একই মহাসত্য নিহিত রয়েছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা উভয়টাই আল্লাহর কাছ থেকে আগত।

তৃতীয় পর্বে কেতাবধারীদের মধ্যে যারা যালেম, তারা ছাড়া অন্য সবার সাথে কেবলমাত্র ভদ্রজনোচিত ও মার্জিত ভাষায় বিতর্ক করতে আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের ধর্ম ও মোহাম্মদ (স.) আনীত ধর্ম যে এক ও অভিন্ন, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং সর্বশেষে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জানানো হয়েছে নানা ধরনের পুরস্কার বিনিময়ের কথা।

সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহু স্থানে ঈমানের হাকীকত ও তাৎপর্য সম্পর্কে অত্যন্ত জোরদার গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা পাঠকের চেতনা ও অনুভূতিতে শিহরণ

জাগায়, বিবেককে ঝাঁকুনি দেয় এবং তাকে ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করার অদম্য প্রেরণা যোগায়। ফলে সে হয় ঈমানের দাবী পূরণে সক্রিয় হয়ে ওঠে, নতুবা তা থেকে পিছু হটে যায় অন্যথায় মোনাফেকীর নীতি অবলম্বন করে, যা আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত ফাঁস করে দেন এবং তাকে অপমানিত করেন।

এ আলোচনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়েছে তা এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো ছাড়া আর কোনো কিছু দ্বারা ফুটিয়ে তোলা যেতো না। তাই এখানে সে সম্পর্কে শুধু কিছু আভাস দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি। বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট আয়াতের সাথেই করা যাবে।

তাফসীর

আয়াত ১-১৩

'আলিফ-লা-ম-মী-ম'

এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি আগেই আমার দৃষ্টিভংগি তুলে ধরেছি। আমি বলেছি, এগুলো দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার ওপর যে কেতাব নাযিল করেছেন, তার উপাদান হিসেবে এই অক্ষর বা বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়েছে। এ বর্ণমালা আরবদের কাছে সুপরিচিত এবং এগুলো দ্বারা তারা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো কথা সহজেই রচনা করতে পারে। অথচ তারা এ দ্বারা এ ধরনের একটা কেতাব রচনা করতে পারেনি এবং কখনো পারবেও না। কেননা এ কেতাব আল্লাহর রচিত– মানুষের রচিত নয়।

আমি ইতিপূর্বে আরো বলেছি, যে কটা সূরা এরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা দিয়ে শুরু হয়েছে, সেগুলোতে কোরআন সম্পর্কে কিছু না কিছু বক্তব্য থাকেই। সে বক্তব্য এই অক্ষরগুলোর অব্যবহিত পরও থাকতে পারে আবার সূরার ভেতরেও থাকতে পারে। এ সূরায় রয়েছে ভেতরের দিকে। যেমন, 'যে কেতাব তোমার কাছে ওহীযোগে পাঠানো হয়েছে তা পড়ে শোনাও।' (আয়াত ৪৫) 'এভাবেই আমি তোমার কাছে কেতাব নাযিল করেছি।' (আয়াত ৪৭) 'ইতিপূর্বে তুমি কোনো কেতাব পড়তে সক্ষম ছিলে না .... ' (আয়াত ৪৮) 'আমি যে তোমার কাছে কেতাব নাযিল করেছি তা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয়?' (আয়াত ৫১) সূরার শুরুতে এসব বর্ণমালার ব্যাখ্যা দিতে আমি যে মূলনীতি গ্রহণ করেছি, তার সাথে এই আয়াতগুলো সংগতিপূর্ণ।

ঈমানের পথে পরীক্ষা অনিবার্য

এই সূচনার পর শুরু হয়েছে ঈমান সংক্রান্ত আলোচনা। ঈমান বাস্তবায়িত করার জন্যে এবং বিপদ-আপদ দিয়ে কে ঈমানের সত্য দাবীদার ও কে মিথ্যা দাবীদার, তা নির্ণয় করার জন্যে মোমেনদের যে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, সেই পরীক্ষা সম্পর্কেও এ সূরার প্রথম কটা আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন,

মানুষ কি ভেবেছে যে, তারা 'ঈমান এনেছি' বললেই তাদের পরীক্ষা না নিয়েই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকেও পরীক্ষা নিয়েছি।......... (আয়াত ১-২)

সূরার এই জোরদার অধ্যায়টা হচ্ছে এর প্রথম বক্তব্য, যা প্রশ্নের আকারে রাখা হয়েছে। এ প্রশ্নে যে 'ঈমানে'-র উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের ধারণাজাত ঈমান। তাদের ধারণা, ঈমান হলো এমন একটা জিনিস, যার কথা মুখ দিয়ে দাবী করাই যথেষ্ট।

অথচ ঈমান কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার নাম নয়, বরং ঈমান হলো একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ, একটা ঝুঁকিপূর্ণ আমানত, এমন এক জেহাদ যা জয় করতে ধৈর্যের প্রয়োজন এবং এমন এক সাধনা, যার সাফল্যের জন্যে সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। সুতরাং এটা যথেষ্ট নয় যে, মানুষ

ঈমান এনেছি এই দাবী করেই পার পেয়ে যাবে। এই দাবী করার পর যখন পরীক্ষা আসবে তখন তাকে সেই পরীক্ষায় এমনভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে যে, তার ঈমানে কিছুমাত্র ভেজাল মিশবে না এবং কিছুমাত্র দুর্বলতা আসবে না। যেমন আগুন স্বর্ণকে পরীক্ষা করে এবং স্বর্ণ ও তার সাথে যুক্ত খাদ পৃথক করে দেয়। এটাই ফেত্না' (পরীক্ষা) শব্দটার ধাতুগত অর্থ, আবার এটাই এর ভাবার্থ। স্বর্ণের মতো এই ফেতনা মনকেও খালেস তথা ভেজালমুক্ত করে দেয়, অর্থাৎ বিপদ মসিবতের আকারে আগত পরীক্ষা এটাকে খাঁটি করে তোলে।

ঈমানের এই পরীক্ষা আল্লাহর মানদন্ডে একটা চিরস্থায়ী মূলনীতি ও একটা শাশ্বত রীতি।

'আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি। এভাবে আল্লাহ্ সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের পরখ করে নেবেনই।'

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা পরীক্ষার আগেও কার মন কেমন তা জানেন। তবে আল্লাহর কাছে যা জ্ঞাত ও উন্মুক্ত, পরীক্ষার মাধ্যমে তা বাস্তব জগতেও জ্ঞাত ও উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ যা জানতো না, পরীক্ষার পর তা জানতে পারে। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা যে হিসাব নেবেন ও কর্মফল দেবেন, তা শুধু তার নিজের জানার ভিত্তিতেই নয়, বরং মানুষের বাস্তব কাজের ভিত্তিতেও দেবেন। এটা একদিক থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ আর একদিক থেকে তাঁর সূক্ষ্ম সুবিচার। আর এক দিক থেকে মানুষের প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিংয়ের শামিল। মানুষেরাও নিজেদের কাউকে তার প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে যা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়, কেবল তারই প্রতিফল দেবে। কেননা মানুষের মন সম্পর্কে অন্য মানুষ আল্লাহর চেয়ে বেশী জানতে পারে না।

এটা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি মোমেন ও ভন্ড মোমেনকে বাছাই করার তাঁর একই চিরন্তন রীতি।

কারণ ইসলাম পৃথিবীতে আল্লাহর আমানত। এ আমানত কেবল তারাই গ্রহণ করে, যাদের তা গ্রহণ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে, যাদের অন্তরে এর প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা আন্তরিকতা রয়েছে এবং যারা একে নিজেদের সুখ শান্তি, ভোগবিলাস ও সহায় সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। ঈমান হচ্ছে পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব, মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের সমার্থক। সুতরাং এটা এক মহা মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব। ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা আসলে আল্লাহর কাজ– যা সম্পাদনের দায়িত্ব মানুষ গ্রহণ করে, তাই এর জন্যে বিপদাপদে ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় এক বিশেষ ধরনের ধৈর্য আবশ্যক।

মোমেনের ওপর পরীক্ষা এভাবেও আসতে পারে যে, তাকে বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে যুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। অথচ তাকে সাহায্য করা ও উদ্ধার করার মতো কোনো লোকও পাওয়া যাচ্ছে না, নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে এবং রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে না, আগ্রাসনের মুখে টিকে থাকার জন্যে যে শক্তি দরকার তাও অর্জন করতে পারছে না। এটা ফেতনা বা পরীক্ষার একটা উল্লেখযোগ্য রূপ। ফেতনা শব্দটা উল্লেখ করলেই এই অবস্থাটা মানসপটে ভেসে ওঠে। তবে এটাই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা নয়। বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এমন বহু ফেতনা বা পরীক্ষা আসতে পারে, যা এর চেয়েও ভয়ংকর কষ্টকর।

কখনো কখনো আপনজন ও বন্ধু বান্ধব ফেতনা হয়ে দেখা দিতে পারে। ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির কারণে তাদের ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসতে পারে এবং সে হয়তো তা রোধ করতে সক্ষম হবে না। ওসব আপনজন অতিষ্ঠ হয়ে তাকে আপোষ বা

আত্মসমর্পণ করার জন্যে চাপ দিতে পারে। তারা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে এবং ক্ষয় ক্ষতি, যুলুম বা ধ্বংসের মুখোমুখি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের রক্ষা বা সাহায্য করতে এগিয়ে আসার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখালে আল্লাহর শাস্তির ভয় পর্যন্ত দেখায়। এই সূরায় আরো এক ধরনের ফেতনার উল্লেখ রয়েছে, যা খুবই কঠিন ও জটিল। এই ফেতনা পিতামাতা সংক্রান্ত।

আরো একটা ফেতনা হলো, বাতিলপন্থীদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও সুখ সমৃদ্ধি। মানুষ তাদের সফলকাম ও ভাগ্যবান দেখতে পায়। মানুষ দেখে যে, বাতিলপন্থীদের সর্বত্র সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে, জনগণ তাদের স্বাগত জানাচ্ছে, তাদের পথের সমস্ত বাধা এক নিমেষে দূর হয়ে যাচ্ছে। এক কথায়, তাদের জীবন সুখ শান্তি ও সম্মানে পরিপূর্ণ। অথচ ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেন সবার কাছে অবহেলিত ও অপরিচিত। কেউ তাদের পক্ষ নিতে চায় না। তারা যে সত্যের পতাকাবাহী, একমাত্র তাদেরই মতো মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক ক্ষমতাহীন লোক ছাড়া সে সত্য কেউ বিবেচনায় আনতে চায় না।

আবার কখনো কখনো এমন হয় যে, মোমেন তাকিয়ে দেখতে পায় তার চারপাশের সবাই গোমরাহীতে মগ্ন এবং ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। ওই সমাজে সে নিজেকে সম্পূর্ণ একা, অচেনা ও কোণঠাসা অনুভব করে। সেখানকার পরিবেশ তার ও তার আদর্শের সম্পূর্ণ বৈরী। এটাও মোমেনের জন্যে একটা ফেতনা বা পরীক্ষার রূপ ধারণ করে থাকে।

আরো এক ধরনের ফেতনা রয়েছে, যাকে ইদানীং আমরা অত্যন্ত গুরুতর মনে করছি। সেটা হচ্ছে এই যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন যাপনের মান অত্যন্ত উন্নত। সেখানে ব্যক্তির অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও জানমালের নিরাপত্তার এমন চমৎকার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, যা মানুষের মূল্য ও মর্যাদার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। সেসব দেশ ও জাতি শক্তিশালী সম্পদশালী। অথচ তারা কট্টর আল্লাহদ্রোহী!

এসব কিছুর পাশাপাশি আরেকটি বড় ও মারাত্মক ফেতনা হলো প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা, পার্থিব লালসা ও মোহ, রক্ত-মাংসের চাহিদা তথা জৈবিক ক্ষুধা, সম্পদ ও ক্ষমতার লিপ্সা, শান্তি ও নিরাপত্তার আকাংখা, ঈমানের পথে টিকে থাকা ও অগ্রগতি অর্জনের বাধা বিপত্তি এবং অন্তরের গভীরে, জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে, পরিবেশ সংক্রান্ত যুক্তিতর্কে ও সমকালীন সমাজের ধ্যান ধারণায় ইসলাম বিরোধী উপাদানসমূহ বদ্ধমূল হয়ে আছে।

এসব ফেতনা বা পরীক্ষার কোনো একটাও যখন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আল্লাহর সাহায্যের আগমন বিলম্বিত হয়, তখন ফেতনা আরো কঠিন ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এহেন ফেতনা ধৈর্য ধারণ করাও গণ্য হয় নিদারুণ যাতনাময় পরীক্ষারূপে। এরূপ পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যাকে রক্ষা করেন সে-ই ধৈর্য ধারণ করতে ও টিকে থাকতে পারে। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, তারাই নিজেদের সত্ত্বায় ঈমানের মর্মার্থ বাস্তবায়িত করতে পারে এবং তাদের ওপরই অর্পিত হয় আল্লাহর সর্ববৃহৎ আমানত বা দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা কখনোই এ সব ফেতনা দ্বারা মোমেনদের শাস্তি ও কষ্ট দিতে চান না। পরীক্ষা আর শাস্তি এক কথা নয়। আসলে এসব পরীক্ষা ও ফেতনার উদ্দেশ্য হলো মোমেনকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করা– যাতে সে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে। মোমেনের এ ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে এবং সেটা বাস্তব ময়দানে কষ্টকর অবস্থা উত্তরণের মাধ্যমে ছাড়া সম্ভব নয়।

ফেতনা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ও পরীক্ষা যাতনাময় হওয়া সত্তেও দুঃখ কষ্টে সত্যিকারভাবে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর সাহায্য বা প্রতিদানের ব্যাপারে সত্যিকার নির্ভরশীলতা ও অটুট আস্থা স্থাপন করা এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে নিজেকে সংযত রাখার মাধ্যমে এ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

আগুন যেমন স্বর্ণকে গলিয়ে তা থেকে খাদ বের করে দেয়, তেমনি কঠিন পরীক্ষা মনকে গলিয়ে তা থেকে ভেজাল দূর করে দেয়। ভেজাল দূর করার পর তার সুপ্ত শক্তিগুলো জাগিয়ে তোলে ও সংঘবদ্ধ করে। শক্তি প্রয়োগ করে তাকে সোজা করে এবং ধুয়ে ও ঘষে মেজে পরিষ্কার করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি। সামষ্টিকভাবে বিপদ-মসিবত ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করে একটা দল বা জাতিকেও পরিশুদ্ধ করা হয়। ফলে দৃঢ়চেতা, পরিপক্ক ঈমানদার ও আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের অধিকারী ছাড়া আর কেউ টিকে থাকতে পারে না। যারা টিকে থাকে তারা অটুট বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর কাছ থেকে তারা দুটো উত্তম পুরস্কারের মধ্য থেকে যে কোনো একটা অবশ্যই পাবে। দুনিয়ার বিজয় অথবা আখেরাতের সওয়াব। অবশেষে এই মযবুত ঈমানদারদের হাতেই পতাকা অর্পিত হয়। কেননা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা এর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে থাকে।

যে দায়িত্ব তারা গ্রহণ করে তা তাদের কাছে অত্যধিক মূল্যবান। কেননা এর জন্যে তারা অত্যধিক মূল্য দিয়েছে, এর জন্যে তারা অনেক ধৈর্য ধারণ করেছে, এর জন্যে তারা বহু কষ্ট সহ্য করেছে এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। যে ব্যক্তি এর জন্যে নিজের রক্ত বা শরীরের কোনো অংগ প্রত্যংগ বিসর্জন দেয় এবং নিজের সুখ-শান্তি ও প্রিয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়, আর এই বঞ্চনা ও কষ্ট সহ্য করে, সে এতো ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত এই দায়িত্বের মূল্য ও কদর বোঝে। তাই সে এই দায়িত্ব ও এই পতাকা সহজে পর্যুদস্ত হতে দেবে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, এতো দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, এতো ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে সত্য ও ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্যে মোমেনরা যে সংগ্রাম সাধনা করে, তা কি শেষ পর্যন্ত বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হবে? এর জবাব এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর দ্বীনই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। কোনো মোমেন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে না। তবে সে বিজয় এবং সাফল্য বিলম্বিতও হতে পারে। যদি বিলম্বিত হয়, তবে তার পেছনেও সুনির্দিষ্ট যুক্তি, প্রজ্ঞা ও বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। সে বিলম্ব অবশ্যই মোমেনদের ও তাদের ঈমানের জন্যে কল্যাণকর। আল্লাহর সত্য দ্বীন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত তার সম্মান ও মর্যাদা যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, সে কথা স্বয়ং আল্লাহর চেয়ে বেশী আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং দ্বীনের বিজয়ে বিলম্বের জন্যে মোমেনদের উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। শত বিপদ মসিবত এবং যুলুম নির্যাতন ভোগ করার পরও তাদের জন্যে এই গৌরবই যথেষ্ট যে, তাদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের আন্দোলন করার জন্যে মনোনীত করা হয়েছে। তাদের পরীক্ষার জন্যে মনোনীত করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাদের দ্বীনদারী অনমনীয় ও আপোষহীন।

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হন নবীরা, তারপর তাদের উম্মতের সৎ ও নেককার ব্যক্তিরা, অতপর পর্যায়ক্রমে যারা তাদের নিকটতর তারা। মানুষকে তার দ্বীনদারী ও সততার দৃঢ়তা অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হয়। তার দ্বীনদারী যদি দৃঢ় ও মযবুত হয়, তাহলে তার পরীক্ষা বেড়ে যায়।'

পক্ষান্তরে যারা মোমেনদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালায় এবং অন্যায় ও অসৎ কাজে নিয়োজিত থাকে, তারা কখনো আল্লাহর আযাব থেকে নিস্তার পাবে না। চাই তাদের বাতিল শক্তির দৌরাত্ম্য, প্রতাপ ও জাঁকজমক যতোই বেড়ে যাক না কেন এবং যতোই তা সফল ও বিজয়ী বলে মনে হোক না কেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটাই আল্লাহর অংগীকার এবং এটাই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত তারা কি আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করে? তাদের এ অভিমত খুবই নিকৃষ্ট।' (আয়াত ৪)

অর্থাৎ কোনো দুরাচারীর এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, সে আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে, আমার পাকড়াও থেকে নিস্তার পেয়ে গেছে। এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ও মত যে ব্যক্তি পোষণ করে, সে অত্যন্ত ভ্রান্ত মূল্যায়ন করে ও খারাপ ধারণা পোষণ করে। কেননা যে আল্লাহ মোমেনদের ঈমানের দৃঢ়তা যাচাই এবং ভন্ড ও নিষ্ঠাবান মোমেনকে চিহ্নিত করার জন্যে পরীক্ষা করা চিরস্থায়ী রীতি হিসেবে চালু করেছেন, সেই আল্লাহ তায়ালাই অত্যাচারীদের শাস্তি দেয়ার চিরস্থায়ী নীতিও চালু করেছেন। এই নীতিতে কোনো রদদল, হেরফের ও সংশোধনের অবকাশ নেই।

এটা এই সূরার প্রথমাংশের দ্বিতীয় প্রধান বক্তব্য, যা প্রথম বক্তব্যটার সমমানের। বিপদাপদ দিয়ে ঈমানের দৃঢ়তা যাচাই করা যখন চিরন্তন রীতি, তখন অত্যাচারী ও পাপাচারীদের ব্যর্থ হওয়া এবং পাকড়াও হওয়াও একটা চিরস্থায়ী বিধি, যা কার্যকর হতে বাধ্য।

তৃতীয় প্রধান বক্তব্যটা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী ও তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠকারীদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের যে আশা পোষণ করে, তা অবশ্যই সফল হবে। তাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণে তাদের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে প্রতীক্ষ্যমাণ থাকা উচিত। (আয়াত ৫)

আয়াতের বর্ণনাভংগি থেকে আল্লাহর সাক্ষাত প্রত্যাশী মোমেনদের ব্যাকুলতার চিত্র ফুটে ওঠে। এই প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাসও দেয়া হয়েছে আয়াতের শেষাংশে এই বলে যে, আল্লাহ তায়ালা শ্রবণকারী ও বিজ্ঞ। তিনি মোমেনদের প্রত্যাশা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

চতুর্থ প্রধান বক্তব্যটা রাখা হয়েছে ঈমানের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও সংগ্রামমুখর মোমেনদের লক্ষ্য করে। এতে বলা হয়েছে যে, মোমেনদের এই জেহাদ সংগ্রাম এবং এই ত্যাগ ও কোরবানী, সবই তাদের নিজেদেরই কল্যাণ, নিজেদেরই মর্যাদা বৃদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত। নচেত আল্লাহর এ সবের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর চাহিদা থেকে মুক্ত। তিনি সর্বতোভাবে অভাবশূন্য ও অমুখাপেক্ষী। (আয়াত ৬)

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন মোমেনদের ওপর কোনো ফেতনা তথা পরীক্ষা ও বিপদ মসিবত চাপিয়ে দেন এবং তারা যাতে বিপদ মসিবতে ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত হয় সে জন্যে নিজেদের প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত করার জন্যে সংগ্রাম সাধনা করার আদেশ দেন, তখন সেটা তাদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যেই দেন। এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করেন।

জেহাদ বা সংগ্রাম মোমেনের মন ও প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করে। তার চিন্তাধারা উন্নত ও মার্জিত করে। তাকে কৃপণতা, অলসতা ও কর্মবিমুখতা থেকে মুক্ত করে, তার ভেতরে যে উৎকৃষ্টতম যোগ্যতা ও প্রতিভা রয়েছে তাকে জাগ্রত, জোরালো ও শাণিত করে। এটা শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য, যা মোমেনদের কোনো দলে অন্তর্ভুক্ত হবার আগেই সে অর্জন করে। মোমেনদের দলে

অন্তর্ভুক্ত হবার পর সে সমগ্র দলের সততা ও কল্যাণমুখিতা, তার ভেতরে বিদ্যমান ন্যায় ও সত্যের স্থীতিশীলতা এবং মন্দের ওপর ভালোর প্রাধান্য দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত, উপকৃত ও উদ্বুদ্ধ হয়।

'যে ব্যক্তি জেহাদ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যেই জেহাদ করে...... ।'

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্যে জেহাদের একটা স্তর অতিক্রম করে, তার সেখানে মাঝপথে ক্ষান্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। আংশিক জেহাদ করেই তার সুফল চাওয়া, 'আল্লাহর ও তাঁর দ্বীনের প্রচারে যথেষ্ট অবদান রেখেছি বলে বড়াই করা এবং আল্লাহর কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ চাওয়া কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তার জেহাদ, সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা আল্লাহর কোনোই লাভ হয় না। তিনি একজন দুর্বল ও অক্ষম মানুষের চেষ্টা সাধনার মুখাপেক্ষী নন। 'তিনি সারা বিশ্ব থেকেই চাহিদামুক্ত ও অমুখাপেক্ষী।' সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যে তাকে জেহাদে নিযুক্ত করেছেন, তার ওপর যে পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং আখেরাতে যে তার পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর বিশেষ অনুগ্রহ। এ কথাই বলা হয়েছে ৭ নং আয়াতে।

'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের সমস্ত গুনাহ্ আমি ক্ষমা করে দেবো.......'

সুতরাং সৎকর্মশীল মোমেনদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। তাদের জেহাদের সুফল, গুনাহর মার্জনা ও সৎকর্মের প্রতিদানপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত, জেহাদের কষ্ট সহ্য করা উচিত এবং সবরকমের বিপদ-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা তাদের জন্যে এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যত ও চমৎকার প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে। মোমেন যদি সারা জীবন ইনসাফ থেকে বঞ্চিতও থাকে, তথাপি তার জন্যে এই সুফলগুলো যথেষ্ট।

এরপর একটা বিশেষ ধরনের ফেতনা বা পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, যার সম্পর্কে আমি সূরার শুরুতে আভাস দিয়ে এসেছি। এটা হলো আত্মীয়স্বজন, পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবজনিত পরীক্ষা। এ সংক্রান্ত সঠিক বিধি-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ মধ্যম ও দৃঢ় ভাষায় দেয়া হয়েছে, যাতে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতাও নেই, আবার মাত্রাতিরিক্ত নমনীয়তাও নেই। বলা হয়েছে,

'আমি তার পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছি ....' (আয়াত ৮)

এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, পিতা-মাতাই মানুষের নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন। তাদের জন্যে বিশেষ মর্যাদা, বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি বিশেষ কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। তাদের ভালোবাসতে হবে, ভক্তি ও সম্মান করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এটা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করে পিতা-মাতার আনুগত্য করার অবকাশ নেই। এটাই ইসলামের অকাট্য বিধান। আল্লাহ এ কথাই আয়াতে বলেছেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি, কিন্তু যদি পিতা-মাতা আমার সাথে শরীক করার জন্যে তোমাকে চাপ দেয়, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না।'

বস্তুত আল্লাহর সাথে সম্পর্কই হচ্ছে সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে মযবুত সম্পর্ক। তাই পিতা-মাতা যদি মোশরেক হয়, তাহলে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে হবে, কিন্তু তাদের আনুগত্য ও অনুকরণ করা চলবে না। এই ব্যবস্থা কেবল পার্থিব জীবনের জন্যে। এরপর সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। আয়াতের শেষাংশে এ কথা বলা হয়েছে।

এরপর ৯ নং আয়াতে মোমেনদের ও মোশরেকদের পার্থক্য বর্ণনা করা হচ্ছে,

'আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের আমি অবশ্যই সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করবো।'

এভাবেই আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত বান্দারা আখেরাতে একই দলে সংঘবদ্ধ হবে, যেমন দুনিয়ার জীবনে তারা একই দল। রক্ত, আত্মীয়তা, বংশ ও বর্ণের বন্ধন দুনিয়ার জীবনের অবসানের সাথে সাথেই ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা এগুলো চূড়ান্ত বন্ধন নয়, কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী বন্ধন। আসল অটুট বন্ধনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ও যোগসূত্র নেই।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, এ আয়াত হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ও তার মাতা হামনা বিনতে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সাদ খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। একদিন তার মাতা বলে বসলেন, 'তুমি এই যে নতুন ধর্ম বানিয়েছো, এর রহস্যটা কী? আল্লাহর কসম, তুমি তোমার সাবেক ধর্মে ফিরে না এলে আমি কিছুই খাবো না। আমি এভাবে না খেয়ে মরে গেলে লোকে তোমাকে সারা জীবন 'মাতৃহন্তা' বলে ডাকতে থাকবে। সাদের মা এরপর পুরো একদিন একরাত উপোস করে কাটালেন।' তারপর সাদ তার কাছে এলেন এবং বললেন,

'আম্মা, আপনার যদি একশোটা প্রাণ থাকতো এবং প্রত্যেকটা প্রাণ এক এক করে বেরিয়ে যেতো, তাহলেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন ইচ্ছা হলে আপনি খেতেও পারেন ইচ্ছা হলে উপোসও করতে পারেন।' এরপর যখন তার মা দেখলেন ছেলের ভেতরে পরিবর্তনের আর কোনো আশা নেই, তখন আবার খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন। এতে তিনি একদিকে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিলেন। অপরদিকে তারা মোশরেক হলে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন।

এভাবে ঈমান বিজয়ী হলো আত্মীয়তা ও রক্তের বন্ধনের ওপর এবং শুধু সদ্ব্যবহারই অবশিষ্ট রইলো। মোমেন মাত্রই সব সময় এ ধরনের ফেতনার সম্মুখীন। সুতরাং আল্লাহর বিধান ও সাদের বাস্তব দৃষ্টান্ত যেন সকলের জন্যে মুক্তি ও নিরাপত্তার পথনির্দেশক হয়।

এরপর ১০ নং আয়াতে একশ্রেণীর মানুষের পরিপূর্ণ নমুনা পেশ করা হয়েছে, যারা নির্যাতন নিপীড়নের আকারে পরীক্ষার সম্মুখীন হলেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে আবার শান্তির সময়ে বড় বড় বুলি আওড়ায়। মাত্র কয়েকটা বাক্যে এই শ্রেণীটার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ঈমানের পরীক্ষায় মোনাফেকদের অবস্থা

'এমন মানুষও আছে যারা মুখে বলে যে, ঈমান এনেছি ...... ।'

এ হচ্ছে সেই নমুনার মানুষ, যে শান্তির সময়ে ঈমান আনার কথা ঘোষণা করে। কেননা সে মনে করে, ঈমান আনার কারণে কোনো বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই। অতপর যখন আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে তাকে নির্যাতন করা হয়– 'তখন সে মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে।' তাই সে পরীক্ষার মুখোমুখি হলেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। ফলে তার কাছে নৈতিক মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব থাকে না এবং তার বিবেকের কাছে আকীদা ও আদর্শের কোনো মূল্য থাকে না। সে মনে করে যে, দুনিয়ার জীবনে আজ সে যে নির্যাতন ভোগ করছে, তার চেয়ে বড় আর কোনো আযাব থাকতে পারে না, এমনকি আল্লাহর আযাবও নয়। সে মনে মনে বলে, 'এ হচ্ছে এমন কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যার চেয়ে বড় আর কোনো আযাব নেই। তাহলে ঈমানের খাতিরে আর কোন জিনিসটায় আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে? আজকে আমি

যে যন্ত্রণায় ভুগছি, আল্লাহর আযাব এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সে মানুষের আযাব ও আল্লাহর আযাবকে একাকার করে ফেলে। অথচ মানুষ চেষ্টা করলে মানুষের তৈরী আযাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর আল্লাহর আযাবের তো সীমা সরহদ্দই কারো জানা নেই।

এই হলো কঠিন পরীক্ষার মুখে দিশেহারা একশ্রেণীর মানুষের অবস্থা।

'তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সাহায্য এলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।'

'আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম', অর্থাৎ সে দিশেহারা ও মোনাফেকী লাঞ্ছনা গঞ্জনার কঠিন মুহূর্তে এবং ভুল মূল্যায়নের সময় আমরা ছিলাম, কিন্তু যখনই সুখের দিন এলো, অমনি লম্বা লম্বা বুলি আওড়ানো শুরু হয়ে গেলো এবং দুর্বল পরাজিত লোকেরাও সিংহের রূপ ধারণ করে বলতে লাগলো, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।'

'জগদ্বাসীর মনের অবস্থা সম্পর্কে কি আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বেশী অবহিত নন?' অর্থাৎ কাদের মনে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আছে, আর কাদের মনে হতাশা ও কাপুরুষতা, কাদের মনে ঈমান এবং কাদের মনে মোনাফেকী, তা কি আল্লাহ তায়ালাই বেশী জ্ঞাত নন? তাহলে তারা কাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে?

'কারা মোমেন এবং কারা মোনাফেক তা আল্লাহ অবশ্যই জ্ঞাত হবেন।' অর্থাৎ তিনি উভয় শ্রেণীর পরিচয় উন্মুক্ত করে দেবেন, ফলে সকলেই জানতে পারবে কারা মোমেন এবং কারা মোনাফেক। বস্তুত ফেতনা বা পরীক্ষা তথা বিপদ-মসিবত ও যুলুম-নিপীড়নের উদ্দেশ্যই হলো মোমেন ও মোনাফেকদের ছাঁটাই-বাছাই করা।

কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের কোরআনের নিম্নোক্ত উক্তির সূক্ষ্ম ইংগিত নিয়ে ভাবা উচিত। এতে এই বিশেষ ধরনের মানব শ্রেণী কোন বিষয়টাতে ভুল করে, তা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে,

'মানুষের নির্যাতনকে সে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে।' অর্থাৎ তাদের ভ্রান্তি এটা নয় যে, আযাব সহ্য করার ব্যাপারে তাদের ধৈর্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ ধরনের সাময়িক দুর্বলতা কখনো কখনো খাঁটি মোমেনদের মধ্যেও দেখা দিয়ে থাকে। কেননা মানুষের শক্তি সামর্থ সীমিত। আসলে তারা এ কথাটার মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনা ও উপলব্ধির পার্থক্য স্পষ্ট করে দিচ্ছে। মানুষ মানুষের ওপর যুলুম নির্যাতন চালানোর যতোটা ক্ষমতা রাখে, তার সাথে আল্লাহর ভয়াবহ আযাবের পার্থক্য কতোখানি, সেটাই এখানে দেখানো হচ্ছে। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী জগত এবং আখেরাতের সীমাহীন ও অন্তহীন জগত তাদের অনুভূতিতে কখনো একাকার হয়ে যায় না। এমনকি যখন মানুষের নির্যাতন তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনো নয়। যুলুম নির্যাতন যতোই সহ্যের বাইরে যাক, আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই মোমেনের অনুভূতিতে বহাল থাকেন, কোনো কিছুই তাতে বাদ সাধতে পারে না। অন্তরে ঈমান অথবা মোনাফেকীর অবস্থানে যে পার্থক্য ঘটে, তা এটুকুই।

সবার শেষে তুলে ধরা হচ্ছে এক ধরনের প্রতারণা ও প্রলোভনের ফেতনাকে। আর সেই সাথে কর্মফল সম্পর্কে কাফেরদের বিকৃত ধ্যান-ধারণাও উন্মোচন করা হচ্ছে। এটা হলো ইসলামের সেই মহান মতবাদ, যাতে ন্যায়বিচারের সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছে। (আয়াত ১২-১৩)

কাফেররা তাদের গোত্রীয় জীবনে গোষ্ঠীগতভাবে খুনের জরিমানা বা দিয়াত দিতে অভ্যস্ত থাকায় তাদের মধ্যে এরূপ ধারণা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর সাথে শেরেক করলে যদি

কোনো শাস্তি ভোগ করা একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে তারা সেটাও অনুরূপ গোষ্ঠীগতভাবে আর্থিক জরিমানা দিয়ে প্রতিহত করতে সক্ষম। আর এই ধারণাটাকে তারা আখেরাতের কর্মফল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করারও ধৃষ্টতা দেখায়,

'কাফেররা মোমেনদের বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো, আমরা তোমাদের পাপের ভার বহন করবো।'

তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার কঠোর জবাব দিয়ে বলা হচ্ছে যে, সেটা তারা কখনো পারবে না। কেননা আল্লাহর কাছে সমষ্টিগতভাবে নয় বরং প্রতিটা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়াবে। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের হিসাব নেবেন, অন্য কেউ তার হিসাব দেবে না।

'তারা তাদের পাপের কোনো অংশই বহন করবে না।'

তাদের এই উক্তি যে মিথ্যা ও ছলনায় পরিপূর্ণ, সে কথা জানিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে,

'তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

পরের আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা অন্যের পাপের ভার বহন করা এবং অন্য কাউকে পাপ থেকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, তারা স্বয়ং নিজেদের পাপের বোঝা এবং যাদের তারা বিপথগামী করে তাদেরও পাপের বোঝা বহন করবে,

তারা নিজেদের পাপের বোঝাও বহন করবে এবং সেই সাথে আরো বহু পাপের বোঝা বহন করবে। অতপর কেয়ামতের দিন তাদের ছলনা প্রতারণা সম্পর্কে তাদের অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

এভাবে এই ফেতনার পথও রুদ্ধ করা হলো। মানুষ জানতে পারলো যে, আল্লাহ তায়ালা দলগতভাবে নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে হিসাব নেবেন ও বিচার করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মফলের কাছেই জিম্মী হয়ে থাকবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

রুকু ২

১৪. আমি নূহকে অবশ্যই তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে ওদের মাঝে অবস্থান করলো পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর; (তারা তার কথা শুনলো না) অতপর মহাপ্লাবন এসে তাদের পাকড়াও করলো, (মূলত) তারা ছিলো (বড়োই) যালেম। ১৫. (এ মহাপ্লাবন থেকে) আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকার আরোহীদের রক্ষা করেছি, আর আমি এ (ঘটনা)-কে সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) জন্যে একটি নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি। ১৬. আর যখন ইবরাহীম তার জাতিকে বললো, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এ বং তাঁকেই ভয় করো; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো যদি তোমরা বুঝতে পারো। ১৭. তোমরা তো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে কেবল মূর্তিসমূহের পূজা করো এবং (স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করো; আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যেসব মূর্তির তোমরা পূজা করো, তারা তোমাদের কোনোরকম রেযেকের মালিক নয়, অতএব তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রেযেক চাও, শুধু তাঁরই এবাদাত করো এবং তাঁর (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে। ১৮. আর যদি তোমরা (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো (তাহলে জেনে রেখো), তোমাদের আগের জাতির লোকেরাও (তাদের যমানার নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; (মূলত) সুস্পষ্টরূপে (মানুষদের কাছে আল্লাহর কথা) পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে রসূলের কাজ। ১৯. এ লোকেরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমবার তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করলেন, কিভাবে তাকে আবার (তার আগের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনবেন; এ কাজটা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিতান্ত সহজ। ২০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা আল্লাহর যমীনে পরিভ্রমণ করো এবং (এর সর্বত্র) দেখো,

فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে প্রথম বার অস্তিত্বে আনেন এবং (একবার ধ্বংস হয়ে গেলে) কিভাবে আবার তিনি তা পুনর্বার পয়দা করেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান। ২১. তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি দেন আবার যাকে চান তাকে (ক্ষমা করে তার ওপর) অনুগ্রহ করেন; (সর্বাবস্থায়) তোমাদের তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। ২২. তোমরা যমীনে (যেমন) আল্লাহ তায়ালাকে (তাঁর পরিকল্পনায়) অক্ষম করে দিতে পারবে না, (তেমনি পারবে না) আসমানে (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও!

রুকু ৩

২৩. যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনাসামনি হওয়াকে অস্বীকার করে, (মূলত) সেসব লোক আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ২৪. অতপর তাদের (ইবরাহীমের জাতির) কাছে এ ছাড়া (আর কোনো) জবাব থাকলো না যে, তারা বলতে লাগলো, একে মেরেই ফেলো কিংবা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও, অতপর (তারা যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করলো তখন) আল্লাহ তায়ালা তাকে (জ্বলন্ত) আগুন থেকে উদ্ধার করলেন; অবশ্যই মোমেনদের জন্যে এ (ঘটনা)-র মাঝে (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের) অনেক নিদর্শন মজুদ রয়েছে। ২৫. (ইবরাহীম) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা (বৃদ্ধি)-র খাতিরে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে (নিজেদের মাবুদ) ধরে নিয়েছো, অথচ কেয়ামতের দিন তোমাদের (এ ভালোবাসার) একজন ব্যক্তি আরেকজনকে (চিনতেও) অস্বীকার করবে, তারা তখন একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে থাকবে, (পরিশেষে) তোমাদের সবার (চূড়ান্ত) ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর সেদিন কেউই তোমাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ

وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَلُوْطًا

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِىْ

نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ

اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا

اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا

২৬. অতপর লূত তার ওপর ঈমান আনলো। (ইবরাহীম) বললো, আমি (এবার) আমার মালিকের (বলে দেয়া স্থানের) দিকে হিজরত করছি; অবশ্যই তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ কুশলী। ২৭. অতপর আমি তাকে (ছেলে হিসেবে) ইসহাক ও (নাতি হিসেবে) ইয়াকুব দান করলাম, তার বংশধারায় আমি নবুওত ও কেতাব (নাযিলের ধারা অব্যাহত) রাখলাম, (নবুওত দ্বারা) আমি দুনিয়াতেও তাকে পুরস্কৃত করলাম, আর আখেরাতে সে অবশ্যই আমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হবে। ২৮. আর (আমি) লূতকে (তার লোকদের কাছে) পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ নিয়ে এসেছো, যা ইতিপূর্বে সৃষ্টিকুলের কোনো মানুষই করেনি। ২৯. (তোমাদের এ কি হলো!) তোমরা কি (তোমাদের কামনা-বাসনার জন্যে মহিলাদের বাদ দিয়ে) পুরুষদের কাছে হাযির হচ্ছো এবং (এ উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত) পথকে তোমরা (প্রকারান্তরে) কেটে দিচ্ছো এবং তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসে এ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছো; তাদের (লূতের জাতির মানুষের) কাছেও এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিলো না যে, তারা বলল (হাঁ, যাও), নিয়ে এসো আমাদের ওপর আল্লাহর আযাব, যদি তুমি (তোমার আযাবের ওয়াদায়) সত্যবাদী হও। ৩০. (এ কথা শুনে) সে (আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে) বললো, হে আমার মালিক, (এই) ফাসাদী জাতির মোকাবেলায় তুমি আমায় সাহায্য করো।

রুকু ৪

৩১. অতপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা একটা সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা (লূতের) এ জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করবো, কেননা তার অধিবাসীরা বড়ো যালেম। ৩২. (একথা শুনে) সে বললো, (তা কি করে সম্ভব?) সেখানে তো (নবী) লূতও রয়েছে; তারা বললো, আমরা (ভালো করেই)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ

الْغَابِرِينَ ۝٣٢ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝٣٤ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٣٥

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ

الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٣٦ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝٣٧ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ

مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا

জানি সেখানে কে (কে) আছে। আমরা লূত এবং তার পরিবারের লোকজনদের অবশ্যই রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়, সে আযাবে পড়ে থাকা লোকদের দলে শামিল হবে। ৩৩. তারপর যখন (সত্যই) আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে এলো, তখন (তাদের আগমন) লূতের কাছে খারাপ লাগলো, এদের (সম্মান রক্ষা করতে পারবে না) কারণে তার মন ভেংগে গেলো, ওরা (এটা দেখে) বললো (হে লূত), তুমি ভয় পেয়ো না, (তুমি) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। আমরা তুমি এবং তোমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়, সে তো আযাবে পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরই একজন। ৩৪. আমরা (অচিরে) এ জনপদের (বাকী) অধিবাসীদের ওপর আসমান থেকে এক (ভীতিকর) আযাব নাযিল করবো, কেননা এরা ছিলো (ভীষণ) গুনাহগার জাতি। ৩৫. (একদিন সত্যি সত্যিই আমি এ জনপদকে উল্টে দিয়েছি এবং) তখন থেকে আমি তার জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন করে রেখে দিয়েছি। ৩৬. আমি মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে পাঠিয়েছি, তখন সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং পরকাল দিবসের (পুরস্কারের) আশা করো, (আল্লাহর) যমীনে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। ৩৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো। ৩৮. আ'দ এবং সামুদকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি), তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতি থেকেই তো তোমাদের কাছে (আযাবের সত্যতা) প্রমাণিত হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজ তাদের সামনে শোভন করে রেখেছিলো এবং (এ কৌশলে) সে তাদের (সঠিক) রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, অথচ তারা (তাদের অন্য সব

مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ
فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ
لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ব্যাপারে) ছিলো দারুণ বিচক্ষণ! ৩৯. কারুন, ফেরাউন এবং হামানকেও (আমি ধ্বংস করেছি)। মূসা তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু তারা (তাকে মানার বদলে) যমীনে বড়ো বেশী অহংকার করেছিলো এবং তারা কোনো অবস্থায় (আমার আযাব থেকে) পালিয়ে আগে চলে যেতে পারতো না। ৪০. অতপর এদের সবাইকেই আমি (তাদের) নিজ নিজ গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি, এদের কারো ওপর প্রচন্ড ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে মহাগর্জন এসে আঘাত হেনেছে, কাউকে আমি যমীনের নীচে গেড়ে দিয়েছি, আবার কাউকে আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এমন ছিলেন না যে, তিনি এদের ওপর কোনো যুলুম করেছেন, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে। ৪১. যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যকে (নিজেদের) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার মতো, তারা (নিজেরাও এক ধরনের) ঘর বানায়; আর (দুনিয়ার) দুর্বলতম ঘর হচ্ছে (এ) মাকড়সার ঘর। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ সত্যটুকু) বুঝতে পারতো। ৪২. এরা আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে যেসব কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়। ৪৩. এ হচ্ছে (সেই) উদাহরণ, যা আমি মানুষদের জন্যেই পেশ করি, কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে। ৪৪. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) এতে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের পক্ষে বড়ো) প্রমাণ রয়েছে।

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. (হে নবী,) যে কেতাব তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা তেলাওয়াত করো এবং নামায প্রতিষ্ঠা করো; নিসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; পরন্তু আল্লাহ তায়ালাকে (হামেশা) স্মরণ করাও একটি মহান কাজ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত আছেন।

তাফসীর

আয়াত ১৪-৪৫

ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে কারা সত্যিকার মোমেন এবং কারা কপট ও ভন্ড মোমেন, সেটা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেয়া যে আল্লাহর চিরস্থায়ী রীতি, সে সম্পর্কে আলোচনার প্রথম পর্ব এখানে শেষ হয়েছে। বৈরী পরিবেশ, যুলুম ও নির্যাতন, প্রলোভন ও প্রতারণা– পরীক্ষার এই কটা পন্থা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন যে পর্ব শুরু হলো, এতে পরীক্ষার কতিপয় বাস্তব নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ মানবেতিহাস জুড়ে যে ইসলামী আন্দোলন চলেছে, সেই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব পরীক্ষা সংঘটিত হয়েছে। এ সব পরীক্ষা ইসলামী দাওয়াতের পথিকৃত নবীদের ওপরও সংঘটিত হয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূতের ওপর সংঘটিত পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ আর অন্য নবীদের ওপর সংঘটিত পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এসব কাহিনীতে ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের পথে বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন এবং যুলুম নির্যাতনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে হযরভ নূহ (আ.)-এর কাহিনীতে দেখানো হয়েছে কতো বড় ও দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা সাধনা চালিয়ে তিনি কতো সামান্য ও নগণ্য সুফল পেয়েছেন। তিনি নয়শ' পঞ্চাশ বছর তার জাতির সাথে বসবাস করেছেন এবং দাওয়াতী কাজ চালিয়েছেন, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলো।

'অতপর সেই পাপাচারী জাতি বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিলো।'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায়ও তার জাতির নিদারুণ গোমরাহী ও তার দাওয়াতের (বাহ্যিক) শোচনীয় অসাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে। 'তার দাওয়াতের জবাবে তার জাতি শুধু এ কথাই বললো যে, ইবরাহীমকে হয় হত্যা করো, নচেত পুড়িয়ে দাও।'

হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনায় ফুটে ওঠেছে জঘন্য নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য। এ ঘটনায় মানবতা কিভাবে বিপথগামিতার সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহর নবীর সতর্কবাণী পর্যন্ত কিভাবে অবজ্ঞা করা হয়, তা দেখানো হয়েছে।

হযরত শোয়ায়বের কাহিনীতে ব্যবসায়ে দুর্নীতি ও কারচুপি এবং সত্য ও ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট।

আদ ও সামুদ জাতির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাদের শক্তির দম্ভ ও সম্পদের প্রাচুর্যজনিত দর্প প্রকাশ পেয়েছে।

অনুরূপভাবে কারূন, ফেরাউন ও হামানের ধন ঐশ্বর্যের অহংকার, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে স্বৈরাচার ও আল্লাহর সাথে মোনাফেকীজনিত বিদ্রোহের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এসব কাহিনী পর্যালোচনা প্রসংগে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের পথে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো যতোই হুংকার ছাড়ুক ও আস্ফালন করুক, তারা যে আসলে মাকড়সার মতোই দুর্বল, সে কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এই পর্বের শেষে রসূল (স.)-কে কোরআন পড়ে শোনাতে, নামায কায়েম করতে এবং এরপর সব কিছু আল্লাহর হাতে সমর্পণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত নূহ ও ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা

'আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম .... ' (আয়াত ১৪-১৫)

সর্বাধিক অগ্রগণ্য মত এই যে, হযরত নূহের নবুওতের মেয়াদ ৯৫০ বছর। এই পুরো মেয়াদ জুড়ে তিনি তার জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। নবুওতলাভের আগেও তার একটা সময় কেটে গেছে এবং বন্যার পরও তার জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত হয়েছে। এই অংশ কতো বছরের, তা অজ্ঞাত। মোট কথা, তিনি যে একটা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এতো দীর্ঘ জীবন আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ও অসাধারণ মনে হয়। তবে এ তথ্যটা আমরা বিশ্বজগতের সবচেয়ে নির্ভুল ও সত্য উৎস থেকে পেয়েছি। এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে যে, এ তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। তবে এতো দীর্ঘ আয়ুষ্কাল লাভ করা কিভাবে সম্ভব, তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে বলা যায়, তৎকালে মানুষের সংখ্যা ছিলো খুবই কম ও সীমাবদ্ধ। কাজেই এটা বিচিত্র নয় যে, সে কালের প্রজন্মগুলো সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পৃথিবীতে আবাদ ও বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যে ক্ষতির সম্মুখীন ছিলো, তা পূরণের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলো এবং পৃথিবী আবাদ হয়ে গেলো, তখন আর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ করার কোনো প্রয়োজন রইলো না। জীবজগতের বহু প্রাণীর আয়ুষ্কাল কম বা বেশী হবার পেছনে এই রহস্যটা সক্রিয় রয়েছে। প্রজাতির সংখ্যা যেখানেই কম, সেখানেই আয়ুষ্কাল বেশী হতে দেখা যায়– যেমন শকুন ও কচ্ছপের ক্ষেত্রে এটা লক্ষণীয়।

এদের কোনো কোনোটা কয়েকশ' বছরও বেঁচে থাকে। পক্ষান্তরে মাছি, যার সংখ্যা কোটি কোটি, দু'সপ্তাহের বেশী বাঁচে না। এ সম্পর্কে জনৈক আরব কবি বলেন,

'দুর্বল ও নগণ্য পাখীকুল অনেক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে পক্ষান্তরে বাজপাখীর সন্তান খুবই কম জন্মে।'

এজন্যে বাজপাখী দীর্ঘজীবী আর ছোট ছোট পাখী স্বল্পজীবী হয়ে থাকে। এসব কিছুর পেছনেই আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তিনি সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন। হযরত নূহ (আ.)-এর সাড়ে নয়শো বছরব্যাপী দাওয়াতী কাজ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির ঈমান আনা ছাড়া আর কোনো সুফল বয়ে আনেনি। এই দীর্ঘকালব্যাপী পরিচালিত দাওয়াত ও তাবলীগকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাস করার মাধ্যমে নিজেদের ওপর অত্যাচারকারী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঈমান আনয়নকারী স্বল্পসংখ্যক

মানুষ– যারা নৌকায় স্থান পেয়েছিলো, তারাই বন্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলো। এভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর বন্যা ও নৌকার কাহিনী সমগ্র বিশ্ববাসীর স্মৃতিতে চিরন্তন শিক্ষার উৎস হয়ে টিকে রইল। যুগ যুগকাল ধরে এ কাহিনী কুফুর ও যুলুমের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করতে থাকবে।

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনীর পর সূরার পরবর্তী আয়াতগুলোতে সংক্ষেপে শত শত বছরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত ইবরাহীমের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে,

'আর ইবরাহীমের কথা স্মরণ করো, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও আল্লাহকে ভয় করো।.........' (আয়াত ১৬-১৮)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াত ছিলো খুবই স্বচ্ছ, স্পষ্ট, সহজ সরল। এতে ছিলো না কোনো জটিলতা ও অস্পষ্টতা। এই দাওয়াত ছিলো অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিপাটিভাবে সাজানো, দাওয়াতী কাজে লিপ্ত যে কোনো ব্যক্তি বা দল তাঁর এই দাওয়াতের অনুকরণ করতে পারে।

প্রথমে তিনি দাওয়াতের মূল কথাটা এভাবে তুলে ধরেন,

'আল্লাহর এবাদাত করো ও আল্লাহকে ভয় করো।'

অতপর এই মূলকথাটা জনগণের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্যে বলেন, 'তোমরা যদি জানতে তবে এটাই তোমাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণকর।' এই মন্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে অজ্ঞতা দূর করতে উৎসাহিত এবং নিজেদের জন্যে সর্বোত্তম জিনিস বাছাই করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এটা মূলত একটা গভীর সত্য কথা নিছক উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়নি।

তারপর তৃতীয় পর্যায়ে তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অন্যায় অসত্য আকীদা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার একাধিক যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন। প্রথমত, তারা যার উপাসনা করে তা হচ্ছে কাঠের তৈরী পুতুল। এটা একটা হাস্যকর উপাসনা, বিশেষত যখন এই উপাসনার কারণে তারা আল্লাহর এবাদাত থেকে বিচ্যুত হয়। দ্বিতীয় কথা হলো, তারা তাদের এই এবাদাতের পেছনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। তারা কেবল মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে থাকে। তারা এসব পুতুলকে পূর্বে কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে বলে প্রচারণা চালায়। তৃতীয়ত এসব পুতুল, তাদের জন্যে কোনো উপকার বয়ে আনে না এবং তাদেরকে কোনো জীবিকা এনে দেয় না।

'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যার যার উপাসনা করে থাকো, তারা তোমাদের কোনো জীবিকা সরবরাহ করতে পারে না।'

চতুর্থ পর্যায়ে তিনি তাদের আল্লাহর কাছ থেকে জীবিকা চাইতে উদ্বুদ্ধ করেন। বস্তুত এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় জিনিস।

'অতপর আল্লাহর কাছে জীবিকা চাও।'

জীবিকার চিন্তা মানুষের মনকে অস্থির ও দিশেহারা করে দেয় এবং সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখে, বিশেষত যাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়নি তাদেরকেই বেশী ব্যস্ত রাখে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর কাছে জীবিকা চাওয়া একটা বাস্তব ব্যাপার। এটা কেবল মানুষের মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে উস্কে দেয়া নয়।

সবার শেষে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও সম্পদদাতার শোকর আদায় ও এবাদাত করার জন্যে তাদের আহবান জানানো এভাবে,

' তোমরা তাঁর এবাদাত ও শোকর করো।'

'অতপর তাদেরকে জানান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো পালাবার জায়গা নেই। তাই আল্লাহর একনিষ্ঠ এবাদাতকারী ও শোকরগোযার বান্দা হিসেবে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করাই সর্বোত্তম পন্থা,

'তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।'

এরপরও যদি তারা রসূলের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাহলে তাতে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের কোনোই ক্ষতি হবে না। ইতিপূর্বে অনেকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। রসূলদের কাজ প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

'তোমরা যদি মিথ্যা সাব্যস্ত করো, তাহলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। রসূলের কাজ প্রকাশ্য প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

এভাবে হযরত ইবরাহীম তার জাতিকে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সৎপথে আনার চেষ্টা করেছেন। এই পন্থাটা সকলের জন্যেই অনুকরণীয়।

দাওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি কোরআনের আহবান

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর সমাপ্তি টানার আগে দাওয়াত অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলা হয়েছে, যা প্রত্যেক কাফেরকে এবং বিশেষত আখেরাত অস্বীকারকারীকে বলা হয়ে থাকে। এই কথাগুলো 'তারা কি দেখেনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা ও পুনঃ সৃষ্টি করেন? (আয়াত ১৯-২৩)

আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের বিষয় অস্বীকার করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এ ধরনের সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এই সম্বোধনে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্ব প্রকৃতিকে এবং এর ক্ষেত্র হলো আকাশ ও পৃথিবী। ঈমানের নিদর্শন ও তার সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে গোটা প্রকৃতিকে তুলে ধরা কোরআনের রীতি। এ মহাবিশ্ব মানুষের সামনে একটা খোলা পৃষ্ঠা, তার মন ও বিবেক এখানে আল্লাহর নিদর্শনাবলী, তার অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ সমূহ, এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রমাণসমূহ খুঁজতে পারে, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী চিরদিন জনসমক্ষে উপস্থিত থাকে। এগুলো তার স্মৃতিশক্তি থেকে কখনো হারিয়ে যায় না। তবে এগুলোকে দীর্ঘকাল দেখতে দেখতে মানুষ এর নতুনত্বের ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলে। আর বারবার দেখার কারণে মনের ওপর এর প্রভাবও ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই কোরআন মানুষকে প্রকৃতির সেই চমৎকার দৃশ্যের দিকে ফিরিয়ে নিতে চায় এবং এ সব দৃশ্যের রহস্য ও শিক্ষা অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করে। এগুলো থেকে সে এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণ করে যা চোখ দিয়ে দেখা যায় এবং যা দ্বারা চেতনা ও অনুভূতি প্রভাবিত হয়। সে এ দ্বারা সেই সব নিষ্প্রাণ ও নির্জীব তর্ক শাস্ত্রীয় ও মনস্তাত্বিক বিতর্কের পথ অবলম্বন করে না, যা ইসলামী চিন্তাধারার অভ্যন্তরে বাইরের বস্তুবাদী দর্শন থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। তাই এ চিন্তাধারা কোরআনের অজানা অচেনা ও অগ্রহনযোগ্য। অথচ কোরআন তার নিজস্ব মত ও পথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

'তারা কি দেখেনি কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করেন। এ কাজটা আল্লাহর কাছে সহজ ।' (আয়াত ১৯)

আল্লাহ তায়ালা কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, সেটা তারা নিশ্চয়ই দেখে থাকে। বিকাশমান উদ্ভিদে, পরিণতির দিকে অগ্রসরমান ডিম ও জ্রণে এবং প্রত্যেক অস্তিত্বহীনের অস্তিত্ব গ্রহণের সময় এটা লক্ষ্য করা যায়। এ সব বস্তুর কোনোটাই মানুষ এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না, এমনকি সে দাবীও করতে পারে না। বস্তুত জীবনের রহস্য চিরদিনই দুর্বোধ্য।

জীবনের সৃষ্টিকর্তা কে ও কিভাবে তা সৃষ্টি হয় তা কেউ জানে না, সৃষ্টির চেষ্টা বা দাবী করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা প্রতি মুহূর্তে সবার চোখের সামনে কতো নতুন নতুন সৃষ্টি করে চলেছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সবাই তা দেখতে পায় এবং কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

মানুষ যখন স্বচক্ষেই সৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছে তখন যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি এগুলো ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম।

'এ কাজটা আল্লাহর কাছে সহজ।'

সৃষ্টিজগতে এমন কোনো জিনিস নেই যা সৃষ্টি করা আল্লাহর কাছে কঠিন, কিন্তু আল্লাহ মানুষের ভাষায় কথা বলেন এবং মানুষের মানদন্ডে পরিমাপ করেন। মানুষ মনে করে, যে কোনো জিনিস দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা প্রথম বার সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ। নচেত আল্লাহর কাছে প্রথম সৃষ্টি দ্বিতীয় সৃষ্টির মতোই এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির মতোই। এ কাজের জন্যে তাঁর শুধু ইচ্ছা করা এবং 'হও' বলাই যথেষ্ট।

অতপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবী পরিভ্রমণের আহ্বান জানান এবং আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনাবলী দেখতে বলেন। এক্ষেত্রে জীব ও জড়– সবই সমান। সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখলে সে বুঝতে পারবে, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, পুনরায় সৃষ্টি করে পরকালীন জগতের উদ্ভব ঘটাতে তার কোনো কষ্টই হয় না।

'বলো, তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করো......'। (আয়াত ২০)

পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করলে মানুষের চোখ ও মন অনেক নতুন দৃশ্য দেখতে পায়, অথচ যেখানে সে বাস করে, সেখানে সব কিছু তার কাছে পুরনো ও পরিচিত হয়ে যায়। ফলে সেখানকার কোনো দৃশ্য দেখে সে অবাক হয় না। পরে সে যখন ভ্রমণ করে তখন নতুন জায়গার প্রত্যেক নতুন দৃশ্যের ব্যাপারে তার চেতনা অনুভূতি সজাগ ও কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অথচ তার নিজ এলাকায় সে একই জিনিস দেখে তার কোনো কৌতূহলই সৃষ্টি হতো না। সফর থেকে ফিরে আসার পর হয়তো সেসব জিনিস দেখেই সে অবাক হবে, যা দেখে সে ইতিপূর্বে অবাক হতো না। তার নিজ এলাকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো তাকে এমন অনেক কথা বলবে, যা ইতিপূর্বে বলতো না বা বলতো, কিন্তু সে তা বুঝতো না।

কোরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অন্তরাত্মার গোপন রহস্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান!

'বলো তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, অতপর দেখো আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন!'

এখানে কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতীতকাল সূচনা ক্রিয়া ব্যবহার করায় মনে একটা বিশেষ চিন্তাধারার উদ্রেক করে। অমনি পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু দেখতে পাবেন, যা জীবনের প্রথম উন্মেষ ও সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছিলো, তার প্রমাণ বহন করে। যেমন আধুনিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকরা যখন অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে জানতে চেষ্টা করছেন কিভাবে জীবনের উন্মেষ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটেছে। অবশ্য আজো তারা জীবনের রহস্য উদঘাটনে কোনো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেননি। তারা আজো জানতে পারেননি জীবন কী, কোথা থেকে তা পৃথিবীতে এলো এবং পৃথিবীতে প্রথম জীবিত প্রাণীর উদ্ভব কিভাবে ঘটলো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবনের প্রথম উদ্ভব সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান ও পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সময় যুক্তি প্রদর্শনের পথনির্দেশক স্বরূপ।

এই চিন্তাধারার পাশাপাশি আরো একটা চিন্তাধারা মাথা তোলে। সেটা এই যে, এ আয়াত দ্বারা যাদের প্রথম সম্বোধন করা হয়েছে, তারা তো আধুনিক কালের মতো বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে সক্ষম ছিলো না। তাই আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানীরা যে তথ্য অর্জন করতে চায়, সে তথ্য অর্জন করা তৎকালের আরবদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো। অতএব, কোরআন আয়ত্তাধীন অন্য একটা পন্থায় তাদের পরকালীন জীবনের সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলো। সেই পন্থাটা ছিলো এই যে, উদ্ভিদ, জীবজন্তুতে ও মানুষের ভেতরে কিভাবে জীবনের উদ্ভব ঘটে সেটা পর্যবেক্ষণ করা। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন নতুন নতুন দৃশ্য দেখে অনুভূতিকে জাগ্রত ও সচকিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জীবন সৃষ্টিতে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো। এই জীবন প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি জায়গায় সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বেশী করে ভ্রমণ করতে বলেছেন।

এখানে কোরআনে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্ভাবনা বিদ্যমান সেটা এই যে, আল্লাহ তায়ালা এমন পথনির্দেশ দিতে চান, যা সর্বকালের, সকল পর্যায়ের ও সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনের সাথে এবং তাদের সকল সমস্যা ও সকল জীবনোপকরণের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যাতে সকল প্রজন্মের প্রতিটি মানুষ তার জীবনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকূল কর্মপন্থা অবলম্বন করে। এভাবে জীবনের চিরস্থায়ী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত হয়। তাই উল্লিখিত দু'ধরনের চিন্তাধারা পরস্পর বিরোধী নয়।

এটাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'

অর্থাৎ নিজের এই সীমাহীন ও সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জীবনের প্রথম সৃষ্টি ও পুনর্বার সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই ক্ষমতা মানুষের কল্পিত ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। যেসব নিয়ম কানুনের আওতায় নিজেদের সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ কোনো জিনিসকে 'সম্ভব' ও কোনো জিনিসকে 'অসম্ভব' আখ্যায়িত করে, মানুষের সীমিত অভিজ্ঞতায় সম্ভব অসম্ভব নির্বিশেষে সবই আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার আওতাধীন। সেই সীমাহীন সর্বময় ক্ষমতাধিকারী আল্লাহই যাকে ইচ্ছা-শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা দয়া করেন এবং একমাত্র তাঁর কাছেই সবাই ফিরে যেতে বাধ্য। কেউ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে না। (আয়াত ২১-২২)

আর আযাব ও রহমত আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কেননা তিনি ন্যায়ের পথ ও অন্যায়ের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মানুষকে এই দুটোর মধ্য থেকে যে কোনো একটা বেছে নেয়ার যোগ্যতা দান করেছেন, তার জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং যে কোনো পথ অবলম্বনে স্বাধীন করে দিয়েছেন। তবে আল্লাহর পথ ও সৎপথ অবলম্বন করলে তার জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সৎপথকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করলে এবং তা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখলে গোমরাহী ও আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবেই আযাব ও রহমত নির্ধারিত হয়।

'আর তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।'

'তুকলাবুন' শব্দটা দ্বারা এমন প্রত্যাবর্তন বুঝানো হয়েছে যা যন্ত্রণাময়। পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য এর সাথে সংগতিশীল,

'তোমরা পৃথিবীতেও তাকে ঠেকাতে পারো না, আকাশেও না।'

অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে তোমাদের এমন কোনো ক্ষমতাই নেই, যা দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন রোধ করতে পারো। এই ক্ষমতা পৃথিবীতেও নেই। আর আকাশের যে সব কিছুকে তোমরা কখনো কখনো উপাসনা করো এবং তাদের আকাশের শক্তি মনে করো, যথা জ্বিন ও ফেরেশতা– তাদেরও নেই।

'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাদের অভিভাবক ও সহায় নেই।' আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবক ও সহায় কোথা থেকে আসবে? মানুষের মধ্য থেকে সহায় ও অভিভাবক কিভাবে হবে? জ্বিন ও ফেরেশতা থেকেই বা কিভাবে আসবে? সবাই তো আল্লাহর সৃষ্টি ও আল্লাহর বান্দা তারা তো নিজেদেরই কোনো লাভ লোকসান করতে পারে না, অন্যের লাভ-লোকসান করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

'যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, তারা আমার রহমত থেকে হতাশ হয়ে গেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (আয়াত ২৩)

কারণ মানুষের মনমগয আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী ও অবাধ্য না হওয়া এবং আল্লাহর ও তার সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটা ও তাঁর রহমত থেকে হতাশ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী ও অবাধ্য হয় না। উভয় অবস্থার পরিণাম সুবিদিত, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

ইবরাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র

কাহিনীর মাঝখানের এই প্রাসংগিক আলোচনা, যা প্রত্যেক কাফের ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতির প্রসংগে এসেছে। শেষ হবার পর এবার হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি তার দাওয়াতের কী জবাব দিয়েছিলো তা জানানো হচ্ছে। এ জবাবটা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। ক্ষমতার গর্বে মত্ত হলে মানুষ কতো আগ্রাসী ও উদ্ধত হতে পারে, তা এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে,

'তার জাতির একমাত্র জবাব ছিলো এই যে, ইবরাহীমকে হত্যা করো অথবা পুড়িয়ে দাও। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন। এতে মোমেনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

'তাকে হত্যা করো অথবা পুড়িয়ে দাও।' এই হলো তার সেই সুস্পষ্ট, সহজ, সরল দাওয়াতের জবাব, যা দ্বারা তিনি তার জাতির মন ও বিবেককে আবেদন জানিয়েছিলেন। আমি আগেই বলেছি, এই দাওয়াত কতো উৎকৃষ্ট মানের ছিলো এবং কত অনুকরণীয় ভংগিতে দেয়া হয়েছিলো।

যেহেতু পুরো একটা জাতি তার সমগ্র ঔদ্ধত্য ও আগ্রাসন নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং তিনি এ আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম ছিলেন না। কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় এক ব্যক্তি। তাই এখানে মহান আল্লাহ তাঁর সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে অলৌকিক পন্থায় হস্তক্ষেপ করলেন,

'আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন'

যে অলৌকিক পন্থায় তাকে আগুন থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিলো, তাতে ঈমান আনতে মানসিকভাবে প্রস্তুত– এমন ব্যক্তি মাত্রেরই জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন ছিলো। 'কিন্তু এমন অলৌকিক মোজেযা দেখেও সে জাতি ঈমান আনলো না।' এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, অলৌকিক ঘটনাবলী মানুষকে হেদায়াত করে না, হেদায়াত ও ঈমানের মানসিক যোগ্যতা এবং প্রস্তুতিই তাকে হেদায়াতের দিকে এগিয়ে দেয়।

'এই ঘটনায় মোমেনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে'

প্রথম নিদর্শন হলো আগুন থেকে হযরত ইবরাহীমের নিস্তার লাভ। দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে নিস্তার দিতে চাইলেন, সেই একমাত্র ব্যক্তিকে সমগ্র জাতি মিলেও কষ্ট দিতে

পারলো না। তৃতীয় নিদর্শন এই যে, কুফরী ও অবিশ্বাসের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হঠকারী ব্যক্তি বা জাতিকে অলৌকিক ঘটনা দ্বারা হেদায়াত করা যায় না। যারা দাওয়াত ও আন্দোলনের ইতিহাস, মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর উপকরণাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্যে এতে এই নিদর্শনাবলী রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগুন থেকে নিস্তার পাওয়ার পর কাহিনীর পরবর্তী অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এতোবড় জ্বলজ্যান্ত মোজেযা দেখেও যখন তার জাতির মন নরম হলো না, তখন তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাওয়ার আগে নিম্নরূপ বক্তব্য রাখলেন,

'ইবরাহীম বললো, তোমরা তো আল্লাহ ছাড়া মূর্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছো কেবল পার্থিব জীবনে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতি গড়ার জন্যে। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং পরস্পরকে শাপ শাপান্ত করবে। তোমাদের আশ্রয় হলো জাহান্নাম। তোমাদের কোনো সহায্যকারী থাকবে না।' (আয়াত-২৪)

অর্থাৎ তোমরা এসব মূর্তির উপাসনা যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত বলে বিশ্বাস করে নয়, বরং পরস্পরের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের খাতিরে করে থাকো। সত্য ও ন্যায় কারো কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলেও কেবল পারস্পরিক মৈত্রী সম্প্রীতিকে অগ্রগণ্য মনে করার কারণেই তোমরা এই মূর্তিপূজা ত্যাগ করো না। যারা আকীদা, আদর্শ ও নীতি একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে না, তাদের মধ্যেই এরূপ ঘটে থাকে, ফলে পারস্পরিক সন্তুষ্টির খাতিরে নীতি ও আদর্শ অকাতরে বিসর্জন দেয়া হয়। নিজের প্রিয়জনকে অসন্তুষ্ট করার চেয়ে আদর্শ বিসর্জন দেয়া সেক্ষেত্রে সহজ বিবেচিত হয়। এ হলো এক ধরনের আপোষহীন হঠকারিতা, যাতে কোনো নমনীয়তার অবকাশ থাকে না। এরপর দেখানো হচ্ছে তাদের পরকালীন অবস্থা। সেখানে দেখা যাবে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা। দুনিয়ার জীবনে যে প্রীতি ও মৈত্রীর খাতিরে তারা অবিচলভাবে মূর্তিপূজা আঁকড়ে ধরেছিলো, কেয়ামতের দিন সেই মৈত্রী পরিণত হবে শত্রুতায়, পারস্পরিক অভিসম্পাতে এবং সম্পর্কচ্ছেদে,

'অতপর কেয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে.........' অর্থাৎ যেদিন কেউ কারো প্রাধান্য মানবে না, বন্ধুরা পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং একে অপরকে বিপথগামী করার দায়ে অভিযুক্ত করবে ও অভিশাপ দেবে, কিন্তু এভাবে পরস্পরকে অস্বীকার ও শাপ শাপান্ত করায় কোনো লাভ হবে না এবং এতে কারো আযাব দূর হবে না,

'তোমাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'

অর্থাৎ যে আগুনে তারা ইবরাহীম (আ.)-কে পোড়াতে চেয়েছিলো এবং যে আগুন থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে রেহাই দিলেন, সেই আগুন হবে তাদের আশ্রয়স্থল এবং তা থেকে তাদের কেউ উদ্ধার করবে না।

এখানে এসে সমাপ্ত হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াত এবং তার অকাট্য মোজেযা তার সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার ওপর ঈমান আনলেন তিনি হলেন হযরত লূত। এই হযরত লূতের স্ত্রীও ঈমান আনলো না। হযরত লূত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাইয়ের ছেলে ছিলো বলে কথিত আছে। তিনি তাকে সাথে নিয়ে কেলদানী জাতি অধ্যুষিত ইরানের উর থেকে জর্দান নদীর কিনারে হিজরত করলেন,

'লূত তার ওপর ঈমান আনলো। সে বললো, আমি আমার প্রভুর কাছে হিজরত করবো। ...'

এখানে হযরত লূতের 'আমি আমার প্রভুর কাছে হিজরত করবো' কথাটা লক্ষণীয়। লক্ষণীয় যে, তিনি কি জন্যে হিজরত করলেন। তিনি নিস্তার পাওয়ার জন্যে বা কোনো আয় উপার্জন, ব্যবসা বা ভূমির জন্যে হিজরত করেননি। হিজরত করেছেন স্বীয় প্রভুর দিকে, অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য ও নিরাপত্তা লাভ করার জন্যে। তার কাছে নিজের দেহ বাঁচানোর চেয়ে আকীদা ও আদর্শ

বাঁচানো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজের মন ও সমগ্র সত্ত্বাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার জন্যে কুফরী এবং গোমরাহীর স্থান থেকে বহু দূরে চলে যেতে চেয়েছেন। কেননা তার জাতির হেদায়াত ও ঈমানের কোনো আশা আর অবশিষ্ট ছিলো না।

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাতৃভূমি, জাতি ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ক্ষতি এভাবে পূরণ করলেন যে, তাকে এমন এক বংশধর উপহার দিলেন, যাদের ভেতর দিয়ে আল্লাহর নবুওত ও রেসালাত পৃথিবীতে চালু থাকলো। তার পরের সকল নবী তার বংশধরের মধ্য থেকেই এসেছিলেন। এটা দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট সম্পদ।

'আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করলাম........'

এটা আল্লাহর এক অনবদ্য দান। এর মধ্য দিয়ে হযরত ইবরাহীমের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় আল্লাহর পরিপূর্ণ সন্তোষই প্রতিফলিত হয়েছে। যে ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো একটা পাষন্ড জাতি, তার চারপাশে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। এ ছিলো যথার্থ পুরস্কার।

কওমে লূতের চারিত্রিক বিকৃতি ও ধ্বংস

এরপর আসছে হযরত লূতের কাহিনী। হযরত ইবরাহীমের সাথে হিজরত করার পরের এ কাহিনী। তারা উভয়ে জর্দান নদী বিধৌত সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করলেন, এরপর এক সময় হযরত লূত মৃত সাগরের তীরে একটা গোত্রের কাছে একাকী থেকে গেলেন। পরে এই সাগরের নাম হয় লূত উপসাগর। এই গোত্রটা সাদুম নামক শহরে বাস করতো। হযরত লূত এই গোত্রে বিয়ে করলেন এবং তাদের সাথে মিলে মিশে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

সহসা এই জাতির মধ্যে এক ভয়ংকর পাপাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটলো। কোরআন বলছে, মানবেতিহাসে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম এই পাপাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো।

এ হচ্ছে সেই পুরুষের সাথে পুরুষের বিকৃত যৌন মিলন। অথচ এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের জন্যে নারীদেরকেই সৃষ্টি করেছেন যাতে উভয় লিংগের মিলনে স্বাভাবিক উৎপাদক হিসেবে একটি একক তৈরী হয়, যা সকল প্রাণীর মধ্যে অব্যাহত সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালু রাখবে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জীবনের ক্রমবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় তথা নারী ও পুরুষের আকারে সৃষ্টি করেছেন। আর মহান স্রষ্টার ইচ্ছা অনুসারে আদিকাল থেকে এভাবেই জীবজগতের সৃষ্টির একটা ধারাবাহিকতা চলে আসছে। হযরত লূত (আ.)-এর জাতির আগে একই লিংগের মধ্যে এরূপ ভ্রষ্ট ও বিকৃত মিলন আর কখনো কোথাও হয়নি।

'আর লূতের কথা স্মরণ করো, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন গর্হিত অশ্লীল কাজে লিপ্ত রয়েছো যা জগতের আর কোথাও ইতিপূর্বে হয়নি ....।' (আয়াত ২৮, ২৯, ৩০)

উক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে হযরত লূত তার জাতিকে সম্বোধন করে যে কথা বলেছেন তা থেকে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে সব রকমের অনাচার, অপকর্ম ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। তন্মধ্যে একটা হলো, তারা সমকামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, যা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, সমগ্র সৃষ্টিজগতের কোথাও, কোনো প্রাণীর মধ্যেই ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়নি।

তাদের ভেতরে বিশেষত পুরুষে পুরুষে সমকাম প্রচলিত ছিলো। এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নোংরা ধরনের এক বিরল কর্ম, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বভাব ও প্রকৃতির সার্বিক বিকৃতিরই লক্ষণ। নারীর সাথে যৌন সম্পর্কেও স্বভাবের বিকৃতি ঘটতে পারে, যদি তা শালীনতা ও পবিত্রতার সীমা অতিক্রম করে যায়। সে ক্ষেত্রেও যৌন সম্পর্ক অশ্লীল অপরাধমূলক কাজ বলে গণ্য হবে, কিন্তু তারপরও সেটা স্বাভাবিকতার গন্ডির মধ্যেই থাকবে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত বিরল ও নযিরবিহীন

বিকৃতি সমগ্র জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়ম লংঘনের শামিল। ওটা দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের বিকৃতি। কেননা মহান আল্লাহ স্বামী স্ত্রীর যৌন মিলনের স্বাদ ও আনন্দকে জীবনের বৃহত্তর ধারাবাহিকতার সাথে এবং এই মিলনঘটিত স্বাদ আনন্দকে প্রজাতিক বিস্তৃতি ও বংশ বৃদ্ধির সাথে সমন্বিত করেছেন। আর স্বামী স্ত্রী উভয়কে এই মিলনের আনন্দ উপভোগ করার শারীরিক মানসিক যোগ্যতাও অনুরূপ সমন্বিতভাবে দান করেছেন, কিন্তু একই লিংগধারী দু'ব্যক্তির অস্বাভাবিক ও বিরল যৌন মিলনের যেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই, তেমনি উদ্দেশ্যহীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালা এই কাজের ভেতরে কোনো স্বাভাবিক স্বাদ আনন্দও রাখেননি। যদি কেউ এতে কোনো স্বাদ আনন্দ পায়, তবে বুঝতে হবে যে, তার যোগসূত্র সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার এমন রুচি বিকৃতি ঘটেছে যে, তাকে আর কোনো সুস্থ স্বাভাবিক জীব বলা যায় না।

তাদের আর একটা দুষ্কর্ম ছিলো সড়ক পথে ডাকাতি ও রাহাজানি। পথচারীদের টাকা পয়সা, সহায় সম্পদ লুণ্ঠন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি ছাড়াও তাদের ওপর পাশবিক বলাৎকার এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ছিনতাই, লুণ্ঠন ও দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টির পাশাপাশি এই ডাকাতি রাহাজানি সমকাম ব্যাপকতর করারও মাধ্যম হয়ে ওঠেছিলো।

আর এই সমকামটা তারা করতো প্রাকাশ্যে, সম্মিলিতভাবে ও সর্বসম্মতভাবে। কেউ কাউকে দেখে লজ্জা বা সংকোচবোধ করতো না। এভাবে তারা অশ্লীলতা, স্বভাব বিকৃতি, রুচি বিকৃতি ও ধৃষ্টতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে তাদের সংশোধনের আর কোনো আশা ছিলো না।

হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। এটা সুস্পষ্ট যে, প্রথম প্রথম তিনি মিষ্ট ভাষায় তাদের সদুপদেশ দিচ্ছিলেন এবং অশ্লীলতা পরিহার করার আহবান জানাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা তাদের অপকর্ম যথারীতি অব্যাহত রাখে। অবশেষে তিনি তাদের আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেন এবং তাদের এই অপকর্মের জঘন্যতা বুঝাতে চেষ্টা করেন। 'তার জাতির একমাত্র জবাব ছিলো এই যে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো।'

এ কথাটার মধ্য দিয়ে তাদের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে ভীতি প্রদর্শনের মোকাবেলায় চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য প্রর্দশন; নবীর হুমকিকে মিথ্যা সাব্যস্তকরণের সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ প্রদান এবং এমন এক বিদ্রোহ, যা পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পথে ফিরে আসার কোনো আশা নেই। হযরত লূত (আ.) তাদের অনেক বুঝালেন, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। অবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে সর্বশেষ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানালেন–

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে দুষ্কৃতকারীদের ওপর বিজয়ী করো।'

হযরত লূত (আ.)-এর এই দোয়ার সাথেই কাহিনীর একটা পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে। এ দোয়া কবুল হলো। দোয়া বাস্তবায়িত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা পথিমধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার যে স্ত্রী এ যাবত বন্ধ্যা ছিলেন তার মাধ্যমেই তাকে একজন সৎ সন্তান দেয়া হবে বলে সুসংবাদ দিলেন। পরবর্তী ৩১-৩২ নং আয়াতে এ বিষয়টার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ফেরেশতাদের সাক্ষাত এবং কথাবার্তাও এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটা বর্ণনা করা এখানে লক্ষ্য নয়। ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছিলেন। আর ইসহাক (আ.)-এর জন্ম এই সুসংবাদের বিষয়বস্তু। তাই সে কাহিনী এখানে বিশদভাবে বর্ণনা করেননি। কেননা মূল উদ্দেশ্য হলো লূতের কাহিনী পূর্ণ করা। এ জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ফেরেশতাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিলো সুসংবাদ দেয়া।

তারপর তারা তাদের প্রথম করণীয় কাজ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন এই বলে যে, 'আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি। এ জনপদের অধিবাসীরা অপরাধী।'

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের স্বভাবসুলভ দয়া ও মমত্ববোধের কারণে অস্থির হয়ে ফেরেশতাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ওখানে তো লূত রয়েছে। আর লূত তো সৎমানুষ, সে কোনো অপরাধী নয়।

ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে আশ্বস্ত করলেন এবং তাকে জানালেন যে, তাদের করণীয় কাজ কী এবং তা কিভাবে সমাধা করা যাবে, সেটা তাদের বেশ জানা আছে। 'তারা বললো, ওখানে কে কে আছে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি। লূত ও তার পরিবারকে আমরা অবশ্যই রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকবে।' (আয়াত-৩২)

হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর অভিরুচি ছিলো সেই দেশের অধিবাসীদের অনুরূপ। সে তাদের যাবতীয় অন্যায় অনাচার, অপরাধ ও বিকৃতির সমর্থক ছিলো। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বৈ কি!

এরপর তৃতীয় দৃশ্যের অবতারণা। এ দৃশ্যে রয়েছেন হযরত লূত এবং তার সাথে এক দল সুদর্শন যুবকের বেশে কতিপয় ফেরেশতা। হযরত লূত তো তার জাতির নোংরা চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি এই ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন যে, কখন না জানি তার মেহমানদের ওপর সেই উপদ্রব নেমে আসে, যা ঠেকানোর কোনো ক্ষমতাই তার নেই। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সেই যুবকদের আগমন তার কাছে ভালো লাগেনি। তিনি এতে বিব্রত বোধ করছিলেন। ৩৩ নং আয়াতে এ বিষয়টাই তুলে ধরা হয়েছে।

'আমার দূতরা যখন লূতের কাছে এলো, তখন সে অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করলো।'

এরপর মেহমানদের ওপর জনতার হুমড়ি খেয়ে পড়া, তাদের সাথে হযরত লূতের বাক্য বিনিময় এবং তাদের বিকৃত রুচির পরিচয়দানের ব্যাপারটা এখানে উহ্য রাখা হয়েছে। শুধু সর্বশেষ ঘটনাটা তুলে ধরা হয়েছে। সেটা এই যে, হযরত লূতকে এমন উৎকণ্ঠিত ও বিব্রত অবস্থায় দেখে যুবকরা নিজেদের আসল পরিচয় ও তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। 'তারা বললো, আপনি ভয় পাবেন না এবং চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার স্বজনদেরকে রক্ষা করবো। তবে আপনার স্ত্রীকে নয়। কারণ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।..............' (আয়াত ৩৩- ৩৪)

এ দুটো আয়াতে সেই জনপদ ও তার সমগ্র অধিবাসীদের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ফুটে ওঠেছে। এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে হযরত লূত ও তার মোমেন সাথীরা রক্ষা পেয়েছিলেন। কাদা মাটি মাখা পাথর বৃষ্টির মাধ্যমে এ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিলো। খুব সম্ভবত এটা একটা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত জাতীয় ঘটনা ছিলো এবং তা গোটা এলাকাকে ওলট-পালট করে গ্রাস করে ফেলেছিলো। এ ধরনের গলিত লাভা বর্ষণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।

এই ধ্বংসযজ্ঞের লক্ষণগুলো এখনো বিদ্যমান। চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। আল্লাহ তায়ালা ৩৫ নং আয়াতে এ কথাই বলেছেন।

বস্তুত নোংরা ও বিকারগ্রস্ত বিষবৃক্ষরূপী এই ঘৃণ্য মানবগোষ্ঠীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ও বংশ বিস্তারের কোনো যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট ছিলো না। শুধু ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ছিলো ওদের একমাত্র অনিবার্য পরিণতি।

কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এরপর হযরত শোয়ায়ব ও মাদইয়ানের কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে।

হযরত শোয়ায়বের উক্তি– 'আল্লাহকে ভয় করো ও আখেরাতের (পুরস্কারের) আশা রাখো' থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী আদর্শের মৌল বাণী সব সময় এক

অভিন্ন। এক আল্লাহর দাসত্ব আনুগত্য আর আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের আশা পোষণ ইসলামী আকীদার মূল কথা। যা হযরত শোয়ায়বের জাতি মাপে ও ওযনে কম দেয়া এবং বেশী নেয়ার মাধ্যমে হারাম সম্পদ উপার্জন, তাদের পথ দিয়ে যাতায়াতকারী বণিকদের সম্পদ লুণ্ঠন, মানুষকে ঠকানো, সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি এবং মানুষের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানোর ন্যায় চারিত্রিক দোষগুলো সংশোধনের সহায়ক ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রসূলকে ও তার যাবতীয় সদুপদেশকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এ ধরনের প্রত্যাখ্যানকারী জাতিকে ধ্বংস করার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা যে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সে কথা ৩৮ নং আয়াতে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে যে, এই জাতির ওপর দু'পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালার আযাব নাযিল হয়। প্রথমে একটা বিকট চিৎকারের শব্দে সমগ্র দেশবাসী মূর্ছা যায় এবং সবাই নিশ্চল নিথর ও নিস্তব্ধ হয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে পড়ে থাকে। ইতিপূর্বে তারা যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করতো এবং তর্জন গর্জন করে মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে বেড়াতো, তারই শাস্তি আল্লাহ তায়ালা তাদের এভাবে দিলেন।

অনুরূপভাবে আ'দ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের ধ্বংসেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এসেছে ৩৯ নং আয়াতে। আদ জাতি আরব উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'হাযরামাউতের' নিকটবর্তী আহকাফ আঞ্চলে বাস করতো। আর সামুদ বাস করতো সর্বউত্তরে অবস্থিত 'ওয়াদিল কোরার' নিকটবর্তী 'আল-হেজরে'। আদ জাতিকে তীব্র গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় দিয়ে এবং সামুদকে দেশ কাঁপানো চিৎকারের শব্দ দিয়ে ধবংস করা হয়। তাদের আবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ আরবদের কাছে সুপরিচিত ছিলো। শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক সফরে যাওয়া আসার সময় তারা সেই জায়গায় প্রত্যক্ষ করে, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা একটা জাতিকে ক্ষমতা ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর পর ধ্বংস করে দিয়েছেন।

এই সংক্ষিপ্ত আয়াতটাতে তাদের গোমরাহীর মূল কারণ, সেই সাথে অন্যদের গোমরাহীর মূল কারণও তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর শয়তান তাদের কাজগুলোকে সুশোভিত করে তুলে ধরে এবং তাদের বিপথগামী করে। অথচ তারা চক্ষুষ্মান ছিলো।'

অর্থাৎ তাদের বিবেক ছিলো এবং তাদের সামনে সৎপথের সন্ধানও ছিলো, কিন্তু শয়তান তাদের বিপথগামী করেছে এবং তাদের কার্যকলাপকে ভালো কাজ হিসাবে সাজিয়েছে। তাদের আত্মম্ভরিতার এই ফাঁক দিয়ে এবং নিজেদের ভালো কাজ, শক্তি ও সম্পদের বড়াইয়ের সুযোগ গ্রহণ করে শয়তান তাদের কাছে আসে এবং তাদের হেদায়াত ও ঈমানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। 'অথচ তারা চক্ষুষ্মান ছিলো।' অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ছিলো।

এরপর কারূন, ফেরাউন ও হামানের কথা বলা হয়েছে যে, 'মূসা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলো, কিন্তু তারা পৃথিবীতে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করলো। শেষ পর্যন্ত তারা জয় লাভ করতে পারেনি।'

কারূন হযরত মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো। সে নিজের অগাধ সম্পত্তি ও বিদ্যা বুদ্ধির জোরে তাদের বিরুদ্ধে চলে গেলো এবং সদাচার, ন্যায়সম্মত আচরণ, বিনয়, বিদ্রোহ না করা ও অরাজকতা না ছড়ানোর সমস্ত উপদেশ সে অগ্রাহ্য করলো, আর ফেরাউন ছিলো আগ্রাসী একনায়ক। সে জঘন্যতম অপকর্মে লিপ্ত থাকতো, সাধারণ মানুষকে ব্যংগ-বিদ্রূপ করতো, তাদের নানা দলে-উপদলে বিভক্ত করে রাখতো, বনী ইসরাঈল গোত্রের পুরুষ সন্তানদের হত্যা করতো এবং মেয়ে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতো। এ সবই সে করতো নিছক যুলুম অত্যাচার চালানোর

নেশায়। তার এই যুলুম অত্যাচারে ও নিত্য নতুন অপকৌশল উদ্ভাবনে সহযোগী ছিলো তার মন্ত্রী হামান, কিন্তু এতো শক্তি সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি তাদের আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি, আল্লাহর আযাব থেকে তাদের বাঁচাতে পারেনি; বরং তাদের আক্রান্ত করেছে।

তারা দীর্ঘকাল মানুষকে নিষ্ঠুর নির্যাতনে নিষ্পেষিত করার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার ওপর আযাব নাযিল করে ধ্বংস করে দেন। পৃথিবীতে টিকে থাকা ও বিজয়ী হওয়ার উপকরণাদি, শক্তি এবং সহায় সম্পদের অধিকারী হয়েও তারা বাঁচতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদের সকলকে আমি তাদের অপরাধের দরুন পাকড়াও করেছি......।' (আয়াত-৪১)

আ'দ জাতিকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদকে বিকট শব্দ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিলো। কারূনকে তার প্রাসাদসহ মাটিতে ধসিয়ে এবং ফেরাউন ও হামানকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো। 'আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছিলো।'

বাতিলশক্তি মাকড়াশার মতো দূর্বল

কাফের পাপাচারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের যুগ যুগান্তরের ইতিহাস এবং সূরার শুরুতে ঈমানের পরীক্ষার অনিবার্যতার কথা বর্ণনা করার পর এক্ষণে এমন একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে, যার ভেতর দিয়ে এসব যুদ্ধরত শক্তির প্রকৃত ক্ষমতা কতোখানি, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। এতে বলা হয়েছে, প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। এ ছাড়া যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষমতা নিতান্তই ভংগুর ও দুর্বল। সৃষ্টির ক্ষমতার ওপর নির্ভরকারী বা আশ্রয় গ্রহণকারীর অবস্থা দুর্বল প্রাণী মাকড়সার মতো। মাকড়সা নিজের সুতোর তৈরী ঘরে বাস করে। সেই ঘর যেমন দুর্বল, তেমনি তার ওপর নির্ভরকারী মাকড়সাও দুর্বল। (আয়াত ৪১, ৪২ ও ৪৩)

এখানে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির প্রকৃত ও নির্ভুল পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ কখনো কখনো এই পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। ফলে তারা দুনিয়ার যাবতীয় মূল্যাবোধ, মানদন্ড ও সম্পর্ক সম্বন্ধের ভুল মূল্যায়ন করে। তাদের লক্ষ্য কী এবং কোন জিনিস গ্রহণযোগ্য ও কোন্ জিনিস বর্জনীয়, তা তারা জানে না।

এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই দুনিয়ার শাসক ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো মানুষকে প্রতারণা করে। মানুষ তাদেরই পৃথিবীর আসল নিয়ামক শক্তি ও ভাগ্যবিধাতা ভাবতে থাকে, তাদের ভীতি ও প্রলোভনে প্রভাবিত হয়। তাদের ভয়ে জড়সড় থাকে এবং তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাদের খুশী রাখে।

পৃথিবীর বিত্তশালীরাও তাদের প্রতারিত করে। তারা ভাবে, এই বিত্তশালীরাই হচ্ছে মানুষের ভাগ্যবিধাতা ও মূল্যবোধের নিয়ামক। তারপর এই বিত্তশালীদের ভয়ে ও প্রলোভনে তাদের কাছে যায় এবং জনগণের প্রভু হবার অভিলাষে তারাও বিত্তশালী হবার চেষ্টা করে।

অনুরূপভাবে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাদের প্রতারিত করে। তারা ভাবে, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানই যাবতীয় ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও অর্থ সম্পদের উৎস। ফলে পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের জন্যে তারা এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে যেন তারা কোনো উপাসানালয়ের সেবায়েত।

এসব পার্থিব শক্তি কখনো থাকে ব্যক্তির হাতে, কখনো সমষ্টির হাতে এবং কখনো রাষ্ট্রের হাতে। আর এগুলো অর্জন করার জন্যে তারা এমনভাবে এগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেমনভাবে কীটপতঙ্গ প্রদীপের ওপর ও আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ যে মহাশক্তি এসব ক্ষুদ্র শক্তিকে সৃষ্টি করেন, এগুলোকে পদানত ও বশীভূত করেন এবং এগুলোর মালিক যাকে যতোটা ইচ্ছা এগুলো দান করেন, তা তারা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায়, এসব শক্তির কাছে ধর্না দেয়া ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাকড়সার জালের কাছে ধর্না দেয়া ও মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো। এসব শক্তি

কোনো ব্যক্তি, সমষ্টি বা রাষ্ট্র– যার হাতেই কেন্দ্রীভূত থাক তাতে কিছু আসে যায় না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, মাকড়সা এতো দুর্বল একটা কীট যে, তার নরম জাল তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র মহান আল্লাহ।

এই বিরাট ও অকাট্য সত্যটাই কোরআন মোমেনদের মনে বদ্ধমূল করতে চেয়েছিলো। এটা বদ্ধমূল হবার পর মোমেনরা তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আল্লাহদ্রোহীদের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিলো, পৃথিবীর সকল স্বৈরাচারীর দর্প চূর্ণ করেছিলো এবং সকল ক্ষমতার দুর্গ ভেংগে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। সকল মোমেনের মনে এ মহাসত্য বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো, তাদের রক্তের সাথে এটা মিশে গিয়েছিলো এবং তাদের ধমনীতে এটা চালু হয়ে গিয়েছিলো। ফলে কাউকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হয়নি এবং কোনো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনেরও দরকার পড়েনি। এ মহাসত্য তারা দিব্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীত কোনো কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি।

বস্তুত আল্লাহর শক্তিই একমাত্র শক্তি, অন্য সকল শক্তি যতোই দর্প করুক, যতোই ঔদ্ধত্য দেখাক এবং মানুষের ওপর যুলুম নির্যাতন চালানোর যতো উপকরণেরই অধিকারী হোক, আসলে তারা দুর্বল ও অক্ষম।

বস্তুত সকল পার্থিব শক্তি মাকড়সা সদৃশ আর তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মাকড়সার জাল সদৃশ। 'আর মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল ঘর, যদি তারা জানতো!'

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহীরা যারা যুলুম নিপীড়ন এবং প্রতারণা প্রলোভনের শিকার, তাদের উক্ত মহাসত্য সব সময় মনে রাখা উচিত এবং এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নানা রকমের ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের নানা উপায়ে ধ্বংস করতে উদ্যত। কেউ তাদের শারীরিকভাবে খতম করে দিতে চায়। কেউ তাদের প্রলুব্ধ করে কিনে নিতে চায়। অথচ এ সবই আল্লাহ তায়ালার চোখে মাকড়সার জাল ছাড়া কিছু নয়। যাদের ঈমান বিশুদ্ধ ও মযবুত তাদের চোখেও ইসলাম বিরোধীদের শক্তি, সম্পদ, প্রতাপ, দাপট, উপায় উপকরণ সবই মাকড়সার জালমাত্র। কেননা যাদের ঈমান বিশুদ্ধ ও মযবুত, তারা সকল শক্তির প্রকৃত পরিচয় জানে এবং সব কিছুর প্রকৃত মূল্য ও মান নির্ণয় করতে সক্ষম।

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের উপাস্যদের প্রকৃত পরিচয় জানেন.............।'

অর্থাৎ তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যে সকল শক্তির সাহায্য চায় তাদের মান ও মুরোদ কতখানি, তা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন। তাদের মুরোদ মাকড়সার সমান। তারা মাকড়সার মতো এবং মাকড়সার জালেই তারা আশ্রয় নিয়েছে।

'তিনি পরাক্রমশালী মহাকুশলী।'

অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের জন্যে তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, সর্বময় ক্ষমতাধর, মহাকুশলী, সুদক্ষ পরিচালক।

'ওগুলো হচ্ছে উদাহরণ, যা আমি মানব জাতির জন্যে উপস্থাপন করে থাকি। জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ এগুলো বোঝে না।'

মোশরেকদের একটা দল, যাদের বিবেক বুদ্ধি একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেছে, তারা এ জাতীয় উদাহরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করে না। বরং তারা রসূল (স.)-কে ব্যংগ বিদ্রূপ ও মস্করা করার উপকরণ হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করে। তারা বলতো, মোহাম্মদের প্রতিপালকের কান্ড দেখো, মশামাছি ও মাকড়সা নিয়ে কথা বলে। অথচ মাকড়সার উদাহরণে যে চমকপ্রদ ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা তাদের চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে না। কারণ তারা নির্বোধ ও মূর্খ।

'আর নির্বোধরা এগুলো বোঝে না।'

এরপর মহান আল্লাহ এই মহাসত্যকে যুক্ত করেছেন সেই ন্যায়নিষ্ঠার সাথে, যাকে তিনি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির পরিকল্পনায় ও সৃষ্টিতে নিয়ামক হিসেবে রেখেছেন। এটা কোরআনের একটা চিরাচরিত রীতি।

'আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে সৃষ্টি করেছেন, এতে মোমেনদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

এখানে এ আয়াতটা নবীদের কাহিনী ও উক্ত উদাহরণটার পরে এসেছে, যা বিশ্বজগতের সকল শক্তির প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেছে। আর এই শক্তিগুলোকে সে সেই ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত ও সমন্বিত করেছে, যা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং যার ওপর আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ ও পৃথিবী এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে চলছে যে, এর কোথাও কোনো ক্রুটি নেই, অগ্র পশ্চাত নেই, কোনোটার সাথে কোনোটার সংঘাত নেই। কেননা এটা সুসমন্বিত সত্য যার কোথাও বক্রতা নেই।

'এতে মোমেনদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

অর্থাৎ সেই মোমেনদের জন্যে যাদের অন্তর চক্ষু মহান আল্লাহর প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দেখা ও উপলব্ধি করার জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। মোমেনরাই এসব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপলব্ধি করতে পারে। কারণ তাদের দৃষ্টি ও চেতনা সব কিছু উপলব্ধি করার যোগ্য।

এ অধ্যায়ের সর্বশেষ আয়াতটাতে আল্লাহ তায়ালা কোরআন, নামায আল্লাহর যেকেরকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিহিত সত্য ন্যায়ের সাথে এবং হযরত নূহ (আ.) থেকে চলে আসা ইসলামী দাওয়াতের ধারার সাথে যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি তোমার কাছে যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পড়ে শোনাও...............'

কেননা এই কিতাব তোমার ইসলামী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, এর সাথে সংযুক্ত আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সহযোগী, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে নিহিত ন্যায় ও সত্যের সাথে সমন্বিত।

'আর নামায কায়েম করো। নামায অশ্লীলতা ও অসততা থেকে বিরত রাখে।' বস্তুত আল্লাহ তায়ালার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগই বান্দার ভেতরে এই লজ্জার সৃষ্টি করে যা তাকে বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীলতা সাথে নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত ওয়া থেকে বিরত রাখে। কেননা নামায এমন এক পবিত্রাবস্থা, যার সাথে অশ্লীলতা ও পাপাচারের নোংরামির কোনই সাযুজ্য নেই। ইমাম ইবনে জরীর বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স.) বলেছেন যে ব্যক্তি নামায পড়ে, অথচ সেই নামায তাকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, সে সেই নামায দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে দূরত্ব ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই অর্জন করে না। অর্থাৎ সে নামায যথারীতি কায়েম করে না, কেবল আদায় করে মাত্র। নামায আদায় করা ও কায়েম করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নামায যখন কায়েম করা হয় তখন তা আল্লাহর যেকের বা স্মরণে পরিণত হয়।

'আল্লাহর যেকের সর্বশ্রেষ্ঠ।'

অর্থাৎ সর্বদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠতম সব রকমের আবেগ, উচ্ছাস, এবাদাত ও বিনয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

' তোমরা যা করো, তা আল্লাহ তায়ালা জানেন।'

অর্থাৎ তার কাছ থেকে কিছুই গোপন থাকে না। তাঁর কাছে কিছুই অজানা থাকে না। তোমাদের সবাইকে একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্মের ফল পাবে।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ

৪৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কেতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, আবার তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা আলাদা, আর (তোমরা) বলো, আমরা ঈমান এনেছি (কেতাবের) যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপর), আরো ঈমান এনেছি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপরও, আসলে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা সবাই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি। ৪৭. এভাবে আমি তোমার ওপর (এ) কেতাব নাযিল করেছি, আমি (আগে) যাদের কেতাব দান করেছিলাম (যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, (পরবর্তী) লোকদের মাঝেও (কিছু ভালো মানুষ আছে) যারা এর ওপর ঈমান এনেছে; (আসলে) অস্বীকারকারীরা ছাড়া কেউই আমার আয়াতের প্রতি বিদ্রোহ করে না। ৪৮. (হে নবী,) তুমি তো (এ কোরআন নাযিল হওয়ার আগে) কোনো বই পুস্তক পাঠ করোনি, না তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখে রেখেছো যে, (তা দেখে) অসত্যের পূজারীরা (আজ) সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ছে! ৪৯. বরং এগুলো হচ্ছে যাদের আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে; তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন, কতিপয় যালেম ব্যক্তি ছাড়া আমার (এ সুস্পষ্ট) আয়াতের সাথে কেউই গোঁড়ামি করতে পারে না। ৫০. তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, এ ব্যক্তির কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) কোনো প্রমাণ নাযিল হয় না কেন? (হে নবী,) তুমি বলো, যাবতীয় নিদর্শন তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; আমি তো হচ্ছি (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র! ৫১. (হে নবী,) এদের জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আমিই তোমার ওপর কেতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে তেলাওয়াত করা

ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ

شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ

وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ

وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا

يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ

فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۟ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

হচ্ছে; অবশ্যই ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে এতে (আল্লাহ তায়ালার) অনুগ্রহ ও নসীহত রয়েছে।

রুকু ৬

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, (কেননা) আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে (তার) সবকিছু তিনি জানেন; যারা বাতিলের ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারাই হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। ৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; যদি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) এদের (শাস্তি দেয়ার) জন্যে একটি দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট না থাকতো, তাহলে কবেই না তাদের ওপর আযাব এসে যেতো; অবশ্যই এদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসবে এবং তারা জানতেও পারবে না। ৫৪. তোমার কাছে এরা আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; (অথচ) জাহান্নাম তো কাফেরদের পরিবেষ্টন করেই নেবে। ৫৫. যেদিন আযাব তাদের গ্রাস করবে তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে, আল্লাহ তায়ালা (তখন) বলবেন, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে (এখন তার) মজা উপভোগ করো। ৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা আমার ওপর ঈমান এনেছো, আমার যমীন অনেক প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা অতপর একমাত্র আমারই এবাদাত করো। ৫৭. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এর পর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে। ৫৮. যারা আমার ওপর ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাদের জন্যে অবশ্যই জান্নাতে (সুরম্য) কোঠা তৈরী করবো, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۵۸﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖۗ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ ز

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۰﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۶۲﴾

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۶۳﴾ وَمَا هٰذِهِ

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۴﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

চিরস্থায়ী হবে; কতো উত্তম পুরস্কার এ নেককার মানুষগুলোর জন্যে! ৫৯. (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে। ৬০. কতো (ধরনের) বিচরণশীল জীব (এ দুনিয়ায়) রয়েছে, যারা কেউই নিজেদের রেযেক (নিজেরা কাঁধে) বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের এবং তোমাদের (নিত্যদিনের) রেযেক সরবরাহ করেন, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। ৬১. (হে নবী,) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে কে বশিভূত করে রেখেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালা, (কিন্তু তারপরও) এরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছে ? ৬২. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (আবার যাকে চান) তার জন্যে তা কমিয়ে দেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন। ৬৩. (হে নবী,) যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর কে যমীন একবার মরে যাওয়ার পর সে (পানি) দ্বারা তাতে জীবন সঞ্চার করেছেন, অবশ্যই এরা বলবে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই; তুমি বলো, যাবতীয় তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু ওদের অধিকাংশ মানুষই (তা) অনুধাবন করে না।

রুকু ৭

৬৪. এ পার্থিব জীবন তো অর্থহীন কতিপয় খেল তামাশা ছাড়া (আসলেই) আর কিছু নয়; নিশ্চয় আখেরাতের জীবন হচ্ছে সত্যিকারের জীবন। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ বিষয়টা) জানতো! ৬৫. যখন এরা জলযানে আরোহণ করে (নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়), তখন তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকে, জীবন বিধানকে একমাত্র তার

الَّذِينَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۙ
وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا
وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

জন্যে (নিবেদন করে), কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের মুক্তি দিয়ে স্থলে নামিয়ে নিরাপদ করে দেন, (তখন) সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার সাথেই এরা শরীক করতে শুরু করে, ৬৬. যেন আমি তাদের (ওপর) যা কিছু অনুগ্রহ করেছি তা তারা অস্বীকার করতে পারে এবং (এভাবেই এরা) কয়টা দিন (দুনিয়ায়) ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দিতে পারে। অচিরেই এরা (আসল ঘটনা) জানতে পারবে। ৬৭. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না, (কিভাবে) আমি (এ মক্কাকে) শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছি, অথচ তার চারপাশে মানুষদের (প্রতিনিয়ত জোর করে) ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; এরপরও কি তারা বাতিলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত অস্বীকার করবে? ৬৮. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালার ওপরই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন তাকেই অস্বীকার করে; (হে নবী,) এমন ধরনের অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামই কি (একমাত্র) আশ্রয়স্থল (হওয়া উচিত) নয়? ৬৯. (অপরদিকে) যারা আমারই পথে জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদের সাথে রয়েছেন।

তাফসীর
আয়াত ৪৬-৬৯

'যদি তাদের তুমি জিজ্ঞাসা করো, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ তায় .... আর যারা আমার সাথে পথে থাকার জন্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালায়; অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ তাদের দেখাবো আমার বহু পথ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন এহসানকারীদের সাথে।'

এটিই সূরা আনকাবূতের শেষ অধ্যায়। অবশ্য ইতিপূর্বে বিশ পারা এই আলোচ্য বিষয়ের ওপর আরও দুটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। যে মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরাটি আবর্তিত হয়েছে তা হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তি ঈমানে বাক্য উচ্চারণ করবে, তার ওপর অবশ্যই আসবে নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিপদ আপদ অর্থাৎ, নান প্রকার বিপদ আপদের মধ্যে ফেলে তাদের ঈমানকে

পরীক্ষা করা হবে এবং এর বিবরণ ইতিপূর্বে এসে গেছে। এ পরীক্ষা আসে অন্তরকে পরখ করে নেয়ার উদ্দেশ্যে এবং সত্যবাদী মোমেন ও মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্যে। এ জন্যে বিপদ আপদ দিয়ে মোমেনদের সবরের পরীক্ষা নেয়া হয়।

আর এসব পরীক্ষা হয় এভাবে যে, ঈমান ও মোমেনদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায় দুনিয়ার বস্তুগত শক্তিমানেরা এবং তারা নানাভাবে এদের লাঞ্ছিত করে, নানাভাবে তাদেরকে কষ্ট দেয় এবং সরল সঠিক পথ থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। এ পর্যায়ে ধৈর্যশীল মোমেনদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জানানো হচ্ছে যে, সর্বপ্রকার বিপদের হুমকির মোকাবেলায় যারা দৃঢ়তা অবলম্বন করবে তাদের আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং যারা বিপদাপন্ন করার চেষ্টা করবে তাদের আল্লাহ তায়ালা নানা কঠিন শাস্তির মধ্যে ফেলে জব্দ করবেন। এটাই আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম যা নূহ (আ.)-এর ঘটনা অবলম্বনে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহর থেকে আসা এ হচ্ছে এক অমোঘ নিয়ম, যার কোনো পরিবর্তন নেই। এ ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সৃষ্টির প্রকৃতিই হচ্ছে এই এবং একইভাবে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের নিয়ম থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে, যার পরিবর্তন নেই।

পূর্বেকার অধ্যায়ের শেষের দিকে 'মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি'-আয়াতটির দিকে রসূলুল্লাহ (স.) ও মোমেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্বিতীয় ভাষণ শেষ করা হয়েছে। শেষ করা হয়েছে আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করার কথা বলে এবং এ কথা বলে যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওদের সমস্ত কাজ তদারক করছেন।

শেষ ভাষণটিতে বিশেষভাবে আলোচনা এসেছে এই কেতাব সম্পর্কে এবং এ কেতাব ও পূর্বে আগত কেতাবসমূহের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের আলোচনা থেকে সাময়িকভাবে নযর সরিয়ে নেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ কথা ছাড়া আহলে কেতাবদের সাথে কোনো তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া যেন না করা হয়, তবে ওদের একদল যালেম আছে, যারা তাদের কেতাবের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন এনেছে এবং শেরেকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর শেরেক হচ্ছে মহা যুলুম। অর্থাৎ তাদেরকে তাদের দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে এবং তাদের কেতাবসমূহ প্রচারের মাধ্যমে ঈমান আনার কথা জানাতে বলা হয়েছে। এসব কেতাবই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্য কেতাব। এ কেতাব তোমাদের কাছে সত্যের যে বার্তা রয়েছে সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী।

এরপর বলা হচ্ছে, মোশরেকরা যখন শেষ কেতাব অস্বীকার করছে, দেখা যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে বহু আহলে কেতাব এ সমাপ্তিকর কেতাবকে আল্লাহর কেতাব বলে মেনে নিচ্ছে। এ সব মোশরেকরাও তো সেই জাতি, যাদের কাছেও আল্লাহর নবীরা এসেছেন এবং যাদের কাছেও কেতাব নাযিল হয়েছে। তারা জেনে বুঝে এ কেতাবকে আল্লাহর কেতাব বলে মানছে না। তাহলে কি তারা ঠেকাতে পারবে এ কেতাবকে আল্লাহর কেতাব বলে মানা থেকে? ইচ্ছা করলেও তারা এ কেতাবকে নিজেদের মধ্যে অন্য কারো কাছে নাযিল করাতে পারবে না। এ কেতাব দ্বারা তো তিনি তাদেরও সম্বোধন করছেন এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলছেন আল্লাহরই কালাম দিয়ে। কই এর আগে (তাঁর বয়স চল্লিশ হওয়ার পূর্বে) তো তিনি এ কেতাব পড়েননি বা নিজের হাতে এ কেতাব লেখেননি। যদি তিনি লিখতে জানতেন বা কখনো কিছু লিখতেন তাহলে হয়তো সন্দেহ জাগার কিছু না কিছু সুযোগ থাকতো যে, এ কেতাব তাঁর নিজের কীর্তি বা নিজ হাতে রচিত কোনো পুস্তক।

মোশরেকরা আযাবের ব্যাপারে বেশী ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, এ জন্যে তাদের সময়মতো সাবধান করা হচ্ছে এবং এজন্যে ধমক দেয়া হচ্ছে যে, তারা দাবী করছে, যেন হঠাৎ করে নাযিল হয়ে যায় কঠিন সে ওয়াদাকৃত কঠিন আযাব। তাদের এমনভাবে সে আযাব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যেন তারা নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের অন্তরে এই অনুভূতি আসছে যে জাহান্নাম তাদের ঘিরে ফেলেছে, যেন এসে গেছে সেই ভয়ানক দিন যখন মাথার ওপর দিয়ে এবং পায়ের নীচে থেকে আযাব তাদের ঘিরে ফেলেছে।

এরপর আলোচনার গতি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে সে সকল মোমেনদের দিকে, যাদের নানাপ্রকার বিপদ-আপদ ঘিরে রেখেছে এবং মক্কী যিন্দেগীতে তাদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের 'দ্বীনের' ওপর টিকে থাকার জন্যে এবং হিজরত করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, যেন সেখানে গিয়ে তারা নিশ্চিন্তে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করতে পারে। এক অতি চমৎকার পদ্ধতিতে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, কাফেরদের পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের মধ্যে যত প্রকার ভীতির সঞ্চার করা হচ্ছে, সেসব বিষয়ে তাদেরকে নিশ্চিন্ত করা হচ্ছে এবং ঈমানী যিন্দেগী যাপনের যতো প্রকার বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, বিষয়ে তাদের শাশ্বস্ত করা হচ্ছে। তাদের অন্তরকে পরিচালনা করা হচ্ছে এমনভাবে যে তারা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে আল্লাহর হাতেই তাদের জীবন, তিনিই তাদের নিয়ন্ত্রণকারী এবং তারা গভীরভাবে অনুভব করছে, যিনি আল কোরআনের প্রেরণকারী তিনিই এ অন্তরগুলোর সৃষ্টিকারী। সুতরাং এদের গভীর অনুভূতি জানা এবং এদের সঠিক গতিপথ দান করার কাজ একমাত্র তাঁরই।

এরপর সেসব মোশরেকদের বর্তমান অবস্থার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কে সৃষ্টি করেছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে? কে নিয়ন্ত্রণ করছে সূর্য ও চাঁদকে, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করছে এবং কে মৃত যমীনকে যিন্দা করছে, তখন ওরা অন্য কোনো জওয়াব না পেয়ে, পরিশেষে হয়রান পেরেশান হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, অবশ্যই এক আল্লাহ তায়ালা এ সবের সৃষ্টিকর্তা। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ সব মানুষরাই যখন জাহাজে আরোহণ করে অকূল সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমায়, তখন অন্য কারো কথা তাদের মনে থাকে না। তখন কায়মনোবাক্যে এবং ঐকান্তিকভাবে তারা আল্লাহকে ডাকে তখন ওরা স্বীকার করে যে, মানুষের জীবন বিধানদানকারী অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

এরপরও ওরা পাক পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহর সাথে শরীক করতে দ্বিধা করে না। এরপরও তার কেতাবকে তারা অস্বীকার করে, কষ্ট দেয় তার রসূলকে এবং মোমেনদেরকেও নানাভাবে কষ্ট দেয়! দেখুন, আবারও মোশরেকদের স্মরণ করানো হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওই তুলনাহীন নেয়ামত সম্পর্কে, এই যে নিরাপদ শহরে তারা বাস করে, যেখানে কেউ তাদের হামলা করে না, এটা হচ্ছে সেই পবিত্র শহর যার প্রতি শ্রদ্ধাবোদ, তাদের বুকে ও মুখে, যে শহরের মধ্যে, শত অপরাধ করে এসে প্রবেশ করার সাথে মানুষ নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যায়, অথচ এ শহরের বাইরে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানুষের জান মাল ইযযতের কোনো নিরাপত্তা আছে; বরং এই শহরের বাইরে আশেপাশের যে কোনো অঞ্চল থেকে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়, জান মালের নিরাপত্তার অভাবে যেখানে মানুষের কোন স্বস্তি নেই, সারা দিনমান ভয়ভীতি লেগেই আছে, কখন কি মসিবত এসে পড়ে, এ চিন্তায় তারা সর্বদা অস্থির হয়ে থাকে। তারা একটুও ভেবে দেখে না যে, কে সে মহান সত্ত্বা যিনি মানুষের অন্তরে হারাম শরীফের প্রতি এমন মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে দিলেন। কার অদৃশ্য হাত এ সবকে এক নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী

পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে? এতোসব আশ্চর্যজনক জিনিস তাদের সামনে থাকা সত্তেও তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা কথা বলছে ও তাঁর ক্ষমতায় অন্য কারও অংশীদারিত্ব আছে বলে জানাচ্ছে! প্রাণ বা প্রাণহীন, যে নিজে সৃষ্ট জীবন, যার নিজের নেই কোনো স্থায়িত্ব, যার নিজের জীবনের গ্যারান্টি দেয়ার কোন ক্ষমতা নেই, যে নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না, যে সাহায্যের জন্যে অপরের ওপর নির্ভরশীল, সে কেমন করে সবার ভালো মন্দের কর্তা হবে? কেন এই ভ্রান্ত মানুষ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের ক্ষমতা এতো সীমাবদ্ধ মনে করে। কেন সে তাকে অপরের মুখাপেক্ষী ভাবে? যাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টির সেরা বানালেন, যাকে সকল কিছু পরিচালনা করার জ্ঞান-গরিমা দান করলেন, যার খেদমতে আঠার হাজার আলমের সবাইকে নিয়োজিত করে দিলেন, যাকে খোদ মালিক মুখতার নিজের প্রতিনিধি বানালেন সে কেন নিজেকে এমনভাবে অপমানিত করছে? এ সব যুক্তির কোন কিছুই যদি তার কানে না পশে, বিদ্ধ না করে দিলকে, না যদি জাগে তার বিবেক আর এই ভাবে যদি সে তার জীবনের মহামূল্যবান ক্ষণগুলো হেলায় ও অসার খেলায় কাটিয়ে দেয়, তাহলে তাদের পরিণতি আর কি হতে পারে! এ তো হলো অর্বাচীনদের জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ভয়ানক জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেটাই হবে কাফের (সত্য অস্বীকারকারী)দের শেষ ঠিকানা।

সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে এ কথার দৃঢ় ঘোষণাদানের সাথে যে, যারা আল্লাহর পথে টিকে তাকার জন্যে চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের জন্যে আল্লাহর জোরদার ওয়াদা রয়েছে যে অবশ্যই তিনি তাদের সঠিক পথ দেখাবেন। যারা খালেস মনে আল্লাহর বান্দা থাকতে চায় এবং যাদের জীবনের চাওয়া পাওয়ার মূলে তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার খাহেশ রয়েছে, তাদের থেকে অবশেষে সকল বাধা বিঘ্ন ও বিপদ আপদের ঝড় ও শত্রুদের রক্তচক্ষুর চাহনি দূরে সরিয়ে দেবেন, তাদের সকল সংকট সহজ করে করে দেবেন, তাদের জীবনের দীর্ঘ সফর ক্ষেত্র তাদের বন্ধুর পথের দূরত্ব সহজ করে দেবেন এবং তাদের শত বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করার যোগ্যতা দেবেন। এরশাদ হচ্ছে,

(হে মুসলমানরা,) তোমরা কেতাবধারী (ইহুদী খৃষ্টান)-দের সাথে কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, অবশ্য ভালো কিছুর ব্যাপারে (বিতর্ক করা) হলে তা আলাদা কথা, তবে তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে (তাদের সাথে তর্ক করতে দোষ নেই,) তুমি (এদের) বলো, আমরা ঈমান এনেছি যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে সে (সে কেতাবের) ওপর, (আরো ঈমান এনেছি) যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে (সে কেতাবের) ওপর, (সত্যি কথা হচ্ছে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন এক (ও অভিন্ন) এবং আমরা সবাই তারই কাছে আত্মসমর্পণ করি।

দাওয়াতের কাজে উত্তেজিত হওয়া নিষিদ্ধ

উপরের আয়াতটিতে এ কথাই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর আহবানে সেই একই কথা বলা রয়েছে যা নূহ (আ.) এবং তার পরবর্তীতে আগত রসূলরা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই পয়গামটাই শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে পৌঁছেছে। অবশ্যই সে দাওয়াত এক আল্লাহর নিকট থেকে আগত অবিকল একই দাওয়াত। এ দাওয়াতের লক্ষ্য একটিই, আর তা হচ্ছে ভ্রান্ত মানুষকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া, তাঁর পথটা দেখিয়ে দেয়া এবং তাঁরই দেয়া পদ্ধতি অনুসারে তাদের গড়ে তোলা। আর সে পথ হচ্ছে, মোমেনরা তাদের ভাইদের কাছে যে পয়গামটা পৌঁছে দেবে তা অন্য সকল পয়গামের যে লক্ষ্য সে একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে নিবেদিত হবে। তার মূল কথাই হচ্ছে, সারা দুনিয়ার সকল মানুষ একই জাতি, যদি তারা এক আল্লাহর দাসত্ব করে। অর্থাৎ,

যারা নিজেদের আল্লাহর বান্দা বা দাস মনে করে, তারা যেখানেই থাকুক এবং যে ভাষাতেই কথা বলুক, তারা সবাই মিলে একই জাতি। আর এটাই সর্ববাদী সত্য কথা যে, সর্বযুগে গোটা দুনিয়ার সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত থেকেছে, একভাগ মোমেন আরেক ভাগ হচ্ছে শয়তানের দল। স্থান কাল নির্বিশেষে এই একই সত্য বরাবর মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যমানাতে মোমেনরা ঈমানী গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে যে যেখানে থাকুক না কেন, এই একটি মাত্র দলের অন্তর্ভুক্ত।

এই হচ্ছে সেই মর্যাদাপূর্ণ সত্য যা প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামের আগমন এবং তার অভিযাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্য আর ওপরের বর্ণিত আল কোরআনের আয়াতটিতে এই কথার দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। এই সত্যটিই তাকে রক্ত ও বংশ সম্পর্কের উর্ধে টেনে তুলেছে এবং তাকে মর্যাদাবান বানিয়েছে, দেশ-শ্রেণী, গোত্র ও বিশেষ কোনো দেশের নাগরিক হওয়া থেকে তাকে ওপরে তুলেছে এবং তাকে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাজ্যের নাগরিক হওয়ার সম্মান দিয়েছে। তারা একই ব্যবসায়ী দলের সদস্য হওয়ার বা বিশেষ দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে মর্যাদাবান হওয়া থেকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কারণে বিশ্ব নাগরিক হওয়া বেশী গৌরবজনক বলে বুঝেছে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উপায় একটিই, আর তা হচ্ছে ঈমানী যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এই আকীদার অধিকারী হওয়ার কারণে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেখানে মানুষের বর্ণ-ভাষা ও রক্তের সম্পর্ক, গৌণ হয়ে যায় সেখানে ভাষা বা ভৌগোলিক জাতীয়তা ও দেশের সীমাবদ্ধতা ঢাকা পড়ে যায়, সেখানে স্থানকালের সীমাবদ্ধতা গৌণ হয়ে যায়, সেখানে একটিই মাত্র সম্পর্ক মানুষকে সংবদ্ধ করে, আর তা হচ্ছে স্রষ্টা ও বিধানদাতা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে নিজেকে আবদ্ধ করা।

এই আংগিকে চিন্তা করলে আহলে কেতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ও যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা আলোচনা করার তাৎপর্য বুঝা যায়। 'মুজাদালা' শব্দটি দ্বারা বুঝায় উত্তেজিত অবস্থায় প্রতিপক্ষকে কোনো কিছু মানতে বাধ্য করা। সেখানে যুক্তি থেকে কড়া ভাষা এবং উত্তেজিত কণ্ঠস্বর দ্বারা প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করাটা প্রাধান্য পায়, কিন্তু ইসলামী দাওয়াত হবে যুক্তি প্রধান এবং সে যুক্তি পেশ করার মধ্যে মিষ্টতা অনুভূত হতে হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 'ডাকো আল্লাহর পথে হেকমত (জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি) এবং সুন্দর সুমিষ্ট কথামালা দ্বারা।'

এমনভাবে ডাকো যেন নতুন এ পয়গাম আসার যৌক্তিকতা সুন্দরভাবে তাদের সামনে ফুটে উঠে এবং শ্রোতার কাছে কথাগুলো আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এটাও যেন বুঝে আসে যে এ পয়গাম এবং পূর্বে অবতীর্ণ পয়গামসমূহের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যেন হৃদয় দিয়ে এটা অনুভব করে যে, আল্লাহর আহবান পূর্বে যেভাবে এবং যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেই একই দাওয়াত আরও সুন্দরভাবে আরবী ভাষায় পেশ করা হচ্ছে। তাদের হৃদয় যেন বলে ওঠে, আহা, এ কথাগুলো কত মনোমুগ্ধকর মনে হচ্ছে, যতোই শুনছি শুনতে যেন আরও ভালো লাগছে, আহ, কী চমৎকার ভাষা, কতো মধুর এ বাচনভংগী, এ তো সেই কথা যা আমাদের নবীর কথার মধ্যে ঝংকৃত হয়েছে, আহা, সেই কথাটাই তো আরও কত সুন্দরভাবে বলা হচ্ছে, হাঁ এভাবে দাওয়াত প্রসারিত হলেই তো আশা করা যায় আজকের বিরাজমান সমস্যা দূর হবে, হয়তো আবার হারিয়ে যাওয়া শান্তি ফিরে আসবে এবং মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণ হবে। 'তবে ওদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে' অর্থাৎ যারা সরে গেছে সেই তাওহীদ থেকে যা স্থায়ী নীতি ও বিশ্বাস হিসেবে সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে চিরদিন স্বীকৃত, যারা আল্লাহর সাথে অন্য

কাউকে শরীক জ্ঞান করেছে এবং দুনিয়ার জীবনের জন্যে প্রদত্ত তার বিধান পরিত্যাগ করেছে, তারাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের সাথে যুক্তিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই, বা নেই কোনো সদ্ব্যবহারের আদান প্রদান। ওদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যখন মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন এসেছে এই ঘোষণা।

আর ওদের মধ্যে অনেকে আছে যারা রসূল (স.) সম্পর্কে চরম বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি করে। ওরা তাঁর সম্পর্কে এ মন্তব্য করে যে, যখন তিনি মক্কাবাসীদের থেকে পালিয়ে এসে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, তখন তারা আহলে কেতাবদের কৃপাধন্য হয়েছিলেন এবং তাদের সদ্ব্যবহারের কারণেই তিনি মদীনায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাদের আশ্রিত হয়েছিলেন বলে তারা এহসান প্রদর্শন করতে চাইতো। তিনি যখন শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলেন তখন তিনি ওদের মদীনা থেকে বিতাড়িত করলেন; এভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি মক্কায় থাকতে আহলে কেতাবদের সম্পর্কে যা কিছু বলতেন, তার পরবর্তীকালের আচরণের মাধ্যমে তিনি নিজের সেসব পূর্বেকার কথার বিরোধিতা করেছেন। এটা তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বানোয়াট মিথ্যা কথা এবং এ সম্পর্কে অবতীর্ণ এ সূরাই সাক্ষ্য দিচ্ছে, তিনি আহলে কেতাবদের সম্পর্কে মক্কায় থাকাকালে কি মনোভাব পোষণ করতেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আহলে কেতাবদের সাথে সুন্দরভাবে কি আলোচনা করা যায় বা কি যুক্তিতর্ক বিনিময় করা যায়? হাঁ, এর জওয়াব হচ্ছে, কথাটা শুধু তাদের জন্যেই সীমাবদ্ধ যারা যুলুম করেনি এবং আল্লাহর দ্বীন (জীবন বিধান) থেকে সরে যায়নি, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি সেই তাওহীদ (একত্ববাদ) থেকে যা নিয়ে সর্বকালে সব নবীদের কাছে সমস্ত আসমানী পয়গাম এসেছে।

ওদের সম্বোধন করে এরশাদ করা হয়েছে,

'বলো, আমরা ঈমান এনেছি সেই কথার (কেতাবের) ওপর যা নাযিল হয়েছে আমাদের ওপর এবং সেসব কেতাবের ওপরও যা তোমাদের নিকট নাযিল হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের 'ইলাহ' একজনই এবং আমরা (সবাই) তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।'

সুতরাং মতবিরোধ করা বা ঝগড়া ফাসাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই, দরকার নেই কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ করার। যেহেতু সবাই এক ও সর্বশক্তিমান মনিব-মালিকের ওপর ঈমান রাখে আর মুসলমানরা তো ঈমান এনেছে সেই কেতাবের ওপর যা তাদের কাছে এবং তাদের পূর্বে অন্যান্য নবী রসূলদের ওপর নাযিল হয়েছে, বলা হয়েছে যে, সকল কেতাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটিই। আর তাহ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আর জীবন বিধান যা সকল কেতাবের মাধ্যমে এসেছে, তা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

মানবতার মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্পর্কে কিছু কথা

'আর এমনিভাবে আমি মহান আল্লাহ তোমার ওপর এই আল কেতাব (কোরআনুল করীম) নাযিল করেছি....... অতপর, যাদের আমি মহান আল্লাহ দিয়েছি এই আল কেতাব (মহাগ্রন্থ আল কোরআন), যা হচ্ছে সুমহান ও সমুন্নত আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে আরবী ভাষায় লিখিত মূল কেতাব), তারা বিশ্বাস করে এ কেতাবকে (আল্লাহর কেতাব বলে), আর ওদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাস করে, আর কাফের ব্যক্তি ছাড়া এ কেতাব কেউ অস্বীকার করে না।'

'ফা-যালিকা' বলে বুঝানো হচ্ছে, একই পথের সন্ধান নিয়ে এসেছে এসব কেতাব এবং এই কারণে সেগুলো পরস্পর সম্পর্কেযুক্ত আর সেই একই পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে এ পাক কালাম, যার কোনো পরিবর্তন হয় না। এ কেতাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই নিয়মে যে নিয়মে এর আগে অন্যান্য রসূলদের কাছে ওহী এসেছে। এরশাদ হচ্ছে, 'এমনিভাবে আমি মহান আল্লাহ তোমাদের

কাছে কেতাব নাযিল করেছি'......... অতপর দেখুন আল কোরআনের সামনে দু'টি সারিতে মানুষ দাঁড়িয়ে একটি সারিতে দেখা যাচ্ছে সেসব মানুষ যারা আহলে কেতাব ও কোরায়শের লোকদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে, আর অপর সারিতে রয়েছে তারা যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকার করেছে আল কোরআনকে আল্লাহর প্রেরিত কেতাব বলে মানতে, অথচ তারা নিজেদের ঈমানদার মনে করে, মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল বলে সাক্ষ্যও দেয় এবং তাদের কেতাবের মধ্যে উল্লেখিত পরবর্তীতে শেষ কেতাব আসবে বলে সাক্ষ্যও দেয়। এরপর বলা হচ্ছে, 'কাফেররা ছাড়া আমার আয়াতগুলো কেউ অস্বীকার করে না।' অর্থাৎ এ আয়াতগুলো সুদৃঢ়ভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, এ কেতাব তারাই অস্বীকার করতে পারে যাদের আত্মার ওপর এবং চোখের ওপর মোটা পর্দা পড়ে গেছে। যার কারণে ওরা এমন ঝাজ্বল্যমান সত্য দেখো ও গ্রহণ করে না! আর কুফর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আবরণী বা মোটা পর্দা। এই পর্দা অর্থেই এখানে কুফুর ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে সে হঠকারীরা সত্যকে দেখে না। এরশাদ হচ্ছে,

'হে রাসূল, তুমি তো ইতিপূর্বে কখনো কোনো পুস্তক পড়নি, আর তুমি নিজের হাতেও কখনো কিছু লেখনি, তুমি জানলে হয়তো এই মিথ্যুকরা সন্দেহ করতে পারতো।'

এভাবে কোরআনুল করীম তাদের সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলোকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে এবং এমন সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, যেন একটি কিশোর ছেলেও তা বুঝতে পারে। দেখুন না, রসূল (স.) তাদের মধ্যেই তো দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠেছেন এবং তাঁর জীবনের চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় তাদের মধ্যে কেটেছে। যে জীবন যৌবনের উত্তাল তরংগাভিঘাতে বেতাল, আজ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে মিথ্যা কথা বলবেন এটা কিভাবে মনে করা যায়?– এ পর্যন্ত যে বান্দা কোনো পড়া লেখা করেনি আজকে হঠাৎ করে সে এমন এক মহাশ্চর্য ও তুলনাহীন গ্রন্থ রচনা করবে, যার একটি আয়াতের সমকক্ষ কোনো আয়াত কেউ তৈরী করতে পারে না, এ থেকেও কি বুঝা যায় না যে, অবশ্যই এ কেতাবের প্রণেতা কোনো মানুষ হতে পারে না। আরবের ভাষাবিদ পন্ডিতরা– আরবী ভাষায় যাদের এতো ব্যুৎপত্তি, তারা সবাই একত্রিত হয়েও যখন অনুরূপ একটি ছত্র তৈরী করতে পারলো না, তখন কি তাদের চিন্তা করা দরকার নয় যে, তারা অনুরূপ কথা বা গ্রন্থ তৈরী করতে না পারলে দুনিয়ার অন্য কোন মানুষের পক্ষে এতো বড় একটি কেতাব রচনা করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় নিরক্ষর মোহাম্মদ কেমন করে এতো বড় গ্রন্থ তৈরী করবে যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে নিয়ে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পথনির্দেশনা, রয়েছে নিকট ও দূর অতীতের ঘটনাপঞ্জি, রয়েছে সর্বকালের সর্ববিষয়ে তুলনাহীন সমাধান, যারা অনুরূপ কোনো গ্রন্থ আজও পর্যন্ত কোনো পাঠক বা কোনো লেখক– তৈরী করতে পারেনি। এরপরও তাদের সন্দেহের আর কোনো সুযোগ থাকে কি। সুতরাং আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই, আল কোরআন নিজেই নিজের প্রমাণ দিচ্ছে যে, এটা কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। এ কেতাব মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের উর্ধ্বে এক কেতাব। মানুষের সকল প্রকার চেষ্টা সাধনা এমন একটি কেতাব রচনা করতে গিয়ে চিরদিনের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এই গোটা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত যেসব সত্য মানুষকে বরাবর অভিভূত করেছে, সেই একইভাবে আল কোরআনও চরম ও পরম সত্য হিসেবে সত্যসন্ধিৎসু হৃদয়ে চিরদিন বিস্ময় জাগিয়েছে এবং জাগাবে। আল কোরআনের প্রতিটি কথা সত্যপিপাসু অন্তরে এ প্রতীতি জাগায় যে, অবশ্যই এর পেছনে রয়েছে এক মহাশক্তি, যার সাথে তুলনা করার কেউ নেই এ বিশ্ব ভুবনে। কী চমৎকার এর প্রতিটি ছত্র, কী মনোরম এর শব্দ গাঁথুনি, কী মধুময় এর ছন্দ বিচিত্রা, কী

মনোলোভা এর বর্ণনাভংগি, কী সামঞ্জস্যপূর্ণ এর বাক্যশৈলী, আর কত আবেগময় এর কথাগুলো! এর প্রতিটি বাক্যের মধ্যে রয়েছে এক একটি সাম্রাজ্যের প্রশস্ততা। এমন মহাশ্চর্য গ্রন্থ কি কোনো মানুষ রচনা করতে পারে? না, কেউ পারেনি আজ পর্যন্ত, আর কেউ পারবে না কোনো দিন তাই এই কালামের ঘোষণা,

'এ হচ্ছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যা সংরক্ষিত থাকে এলমওয়ালা (জ্ঞানী) লোকদের বুকের মধ্যে। যালেম ব্যক্তিরা ছাড়া আমার আয়াতগুলো কেউ অস্বীকার করে না।'

জ্ঞানান্ধ কাফেররাই শুধু অলৌকিক কিছু দেখতে চায়

যাদের আল্লাহ রব্বুল আলামীন জ্ঞান দান করেছেন, তাদের বুকের মধ্যে একথাগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে হাযির হতে থাকবে। না থাকবে সেখানে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ, আর না থাকবে সেখানে কোনো কিছু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা। এসব হচ্ছে এমন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ, যা তারা তাদের অন্তরের গভীরে অনুভব করে এবং তাদের দিল নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। এরপর তারা আর কোনো দলীল প্রমাণ চায় না, তারা বুঝে, কেতাবই হচ্ছে তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট দলীল। আর যে এলেমের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তা অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়, এলমের দ্বারাই মানুষ সত্যকে চিনতে পারে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং সেই এলেমের দ্বারাই তার সামনে জীবনে চলার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। জীবনের সাফল্যের সরল সোজা পথ পেয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা বলে, কেন নাযিল হয় না তার ওপর এমন কিছু নিদর্শন তার রবের কাছ থেকে? বলো, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর কাছেই আছে, আমি তো শুধু খোলাখুলিভাবে সতর্ককারী মাত্র।' মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে যে অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর দাবী তারা করছিলো, তা দ্বারা তারা বুঝাতে চাইছিলো সেসব ক্ষমতার কথা, যা তাঁর পূর্ববর্তী রসূলদের দান করা হয়েছিলো এবং যা দেখে সেসব যমানার লোকেরা চমৎকৃত হতো, কিন্তু অল্প কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া তারা ঈমান আনতো না। যার কারণে সর্বগ্রাসী গযব নাযিল হয়ে সে কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হতো। সর্বশেষ রসূল মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের ওপর আল্লাহ তায়ালা সে ধরনের আযাব নাযিল করতে চাননি, যেহেতু তিনিই শেষ পথপ্রদর্শক এবং তাঁর উম্মতই পররর্তী সকল মানুষের জন্যে হবে আদর্শ উম্মত ও পথ প্রদর্শক, এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের সরাসরি নিদর্শন না পাঠিয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞান আকর্ষণকারী হিসেবে আল কোরআন নাযিল করলেন এবং এ পবিত্র কালামের প্রতিটি আয়াতকেই বানিয়ে দিলেন এক একটি বিরাট মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন), কিন্তু এসব আয়াত মোযেজা হিসেবে তাদের চোখেই ধরা পড়বে যারা চিন্তা করবে ও বুঝার চেষ্টা করবে। অন্যান্য রসূলদের মোজেযা তো তাদের জীবনের সাথেই জড়িত ছিলো। তাদের ইন্তেকালের সাথে সেগুলো শেষ হয়ে গেছে, আল্লাহর এই মহান কেতাব পরবর্তীকালের সকল যমানার লোকের জন্যেই মোজেযা হিসেবে কাজ করবে। যারা এ কেতাব পড়বে, চিন্তা করবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিতে চাইবে– তাদের সবার জন্যে এ কেতাব আল্লাহর ক্ষমতার বিশেষ নিদর্শন হিসেবে কাজ করবে। আর আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে এ কেতাব সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাফেযদের ও আলেমদের বুকের মধ্যে, যাতে করে সদা-সর্বদা এ কেতাব পঠিত হতে থাকে, অনুসন্ধিৎসু মানুষ এর থেকে হেদায়াতের আলো পেতে থাকে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর হাতে' .... তিনি এ মোজেযা বা তার ক্ষমতার নিদর্শন সেসব ক্ষেত্রে ও সময়ে প্রকাশ করেন যখন তিনি তা প্রকাশ করতে চান। কখন তিনি প্রকাশ

করবেন তা তিনিই জানেন, তাঁকে পরামর্শ দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই। তাই রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলা হচ্ছে, তুমি তাদের বলে দাও। আল্লাহকে পরামর্শ দেয়া আমার কাজ নয়, আমার দায়িত্বও এটা নয়, আর এ সম্পর্কে কিছু বলাটা আমার জন্যে আদবের খেলাফ, 'আমি তো শুধু সুস্পষ্টভাবে ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র।' অর্থাৎ অন্যায় পথে চলার ফলে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে বলে আমি ভয় দেখাই এবং সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে বলে আমি জানাই। আমাকে এ কাজের জন্যেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাই আমি এ দায়িত্ব পালন করি, এতে যে শিক্ষা নেয়ার দরকার মনে করবে সে নেবে, বাকি আল্লাহর হাতেই তাদের সকল পরিণতি নির্ভর করছে।

রসূল (স.)-এর কাজের মধ্যে প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষকে অন্যান্য সব ভুল ও সন্দেহযুক্ত আকীদা বিশ্বাস (অর্থাৎ, এর এই ক্ষমতা, ওর সে ক্ষমতা ইত্যাদি) থেকে মুক্ত করে সবাইকে এক আকীদা- সকল শক্তি ক্ষমতার মালিক এক আল্লাহ তায়ালা, সকলকে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং এই জন্যেই নিষ্ঠার সাথে তাঁর যাবতীয় হুকুম পালন করতে হবে-এই বিশ্বাসের ওপর মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে চেষ্টা করাই তাঁর প্রধান দায়িত্ব। এখানে আরও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে তিনি রসূল হলেও অবশ্যই একজন মানুষ। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে, তাঁর মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণাবলী আসতে পারে না। যখন রসূলদের হাতে অলৌকিক কিছু ক্ষমতা দেয়া হয় তখন সেগুলো যে আল্লাহরই ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সেগুলো দেখানোর যোগ্যতা নবীদের দেয়া হয়েছে- এ হিসাব না করে ভ্রান্ত মানুষ সে ক্ষমতাগুলোকে তাদেরই ক্ষমতা বলে ধরে নিয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল না হয়ে সে রসূলদের ইন্তেকালের পর তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা করতে শুরু করেছে। এ জন্যেই মোহাম্মদ (স.)-কে সাফ সাফ বলতে হুকুম দেয়া হয়েছে, 'আমি পরিষ্কারভাবে শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র।'

মক্কার কাফেররা দাবী করছিলো পূর্ববর্তী নবীদের মতোই তাদেরও অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো হোক। তখন তারা এ হিসাব করতে প্রস্তুত ছিলো না যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআনই সেই মোজেযা এবং আল্লাহর মেহেরবানীর অভূতপূর্ব দান। এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের জন্যে কি এটা যথেষ্ট নয় যে, আমি মহান আল্লাহ, তোমার কাছে এই মহামূল্যবান কেতাব আল কোরআন পাঠিয়েছি যা তাদের সামনে পাঠ করা হয়। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে (আল্লাহর) রহমত ও ঈমানদারদের জন্যে উপদেশ।'

আল্লাহর শোকরগোযারী যদি না করা হয় এবং তাঁর ক্ষমতাকে যদি পরওয়া না করা হয়, তাহলে তাঁর নেয়ামত ও পরিচালনাকে অমান্য করা হবে। তাদের জন্যে কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, এই কোরআন দ্বারা তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানীর মধ্যে বাস করবে? খোদ আকাশের মালিক তাদের ওপর এই কোরআনের মাধ্যমেই এই ধূলার ধরণীতে নেমে আসছেন। তিনি তাদের সাথে তাদের অন্তরের প্রয়োজন সম্পর্কে কথা বলছেন এবং তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয়াদির জ্ঞান তাদের দিচ্ছেন, তাদের এ চেতনা দিচ্ছেন যে, সদা সর্বদা আল্লাহর নযর তাদের ওপর রয়েছে। এমনভাবে তিনি তাদের সাহায্য করছেন যে, তাদের জীবনের প্রতিটি কাজের ব্যাপারে তিনি তাদের সাথে কথা বলছেন। তাদের তিনি জানাচ্ছেন অতীতের ঘটনাবলী এবং সেগুলো থেকে তিনি তাদের ভবিষ্যতের জীবনের জন্যে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই আল কোরআনের মাধ্যমেই তিনি তাদের জানাচ্ছেন, এই বিশাল বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তারা এক তুচ্ছ সৃষ্টি মাত্র। যারা নিজেদের ভালো মন্দ কিছুই না বুঝার কারণে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা আছে তাদের এই পৃথিবীতে। আর তাদের জন্যে রয়েছে এই তেজোদ্দৃপ্ত সূর্য যার চতুর্দিকে ঘুরছে বিশাল এ পৃথিবী।

.... আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা এই মহা শূন্যলোকে নড়নশীল এক গুচ্ছ বিন্দুসম,....... যাদের আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাদের এতো সম্মানিত করেছেন। তিনি তাদের এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখেন না যে, নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে তারা যেতে পারবে না! এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও উপদেশ সেই জাতির জন্যে যারা ঈমান আনে।'

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব, শক্তি ক্ষমতা ও তাঁর পাকড়াও করার ক্ষমতার ওপর, তারাই হচ্ছে এমন সব মানুষ, যারা তাদের অন্তরের মধ্যে রব্বুল আল্লামীনের রহমত অনুভব করে এবং তারা স্মরণ করে এ কেতাবের মাধ্যমে আল্লাহর মেহেরবানী ও মানব জাতির ওপর তাঁর অপার এহসানকে। যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজের দিকে ও তাঁর খাবারের ভান্ডারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, তখন তারা গভীরভাবে অনুভব করে তাঁর মেহেরবানীর কথা আহা, কত মহান তিনি। কতো বড় তিনি মায়াময় প্রভু তিনি। হাঁ, এসব অনুভূতিশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাদেরই তো আল কোরআন উপকার করতে পারে, কারণ এরাই হচ্ছে যিন্দা দিল, এরা প্রকৃতপক্ষে বেঁচে আছে তাদের অন্তরের মধ্যে। এদের জন্যেই তো আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধনভান্ডারের দরজা খুলে রেখেছেন, তাঁর সম্পদ অবারিত করে দিয়েছেন তাদের জন্যে এবং তাদের আত্মাকে তার মহামূল্যবান জ্ঞান ও আলো দ্বারা সমুজ্জ্বল করে দেন।

অতপর যারা এসব কিছু বুঝে না বা বুঝতে চায় না, আল কোরআনের ওপর ঈমান আনার শর্ত হিসেবে পূর্বের মতো কোনো মোজেযা দেখানোর দাবী করে, তারাই হচ্ছে সেসব মানুষ প্রকৃতপক্ষে যারা অন্ধ হয়ে গেছে, যাদের সামনে আল কোরআনের নূর প্রতিভাত হয় না। এহেন হঠকারী ব্যক্তিদের হেদায়াতের দিকে টেনে আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। যেহেতু হেদায়াত পাওয়ার শর্ত হচ্ছে (হেদায়াত লাভ করার জন্যে) আকাংখী হওয়া। আল্লাহর এরশাদে বলা হয়েছে,

'বলো, আমার ও তোমার মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনি জানেন সব কিছু যা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে .... আর যারা বাতিল বা মিথ্যাকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।' (আয়াত ৫২)

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তার মালিক সম্পর্কে সাক্ষ্যদানই হচ্ছে সব থেকে বড় শাহাদাত, কারণ তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি সুনিশ্চিতভাবে জানেন যে, তারা বাতিল ব্যবস্থার ওপর রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

'খাসেরূন'- ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণভাবে সকল সত্য বিরোধীদের বলা হয়েছে অর্থাৎ, এ বিরোধীগোষ্ঠী সব ব্যাপারেই ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সবখানেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, নিজেদের জীবনের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত, হেদায়াত লাভ করার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত, দ্বীনের ওপর টিকে থাকার প্রশ্নে ক্ষতিগ্রস্ত, নিশ্চিন্ততা হাসিলের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সত্য ও নূর লাভ করার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত।

অবশ্যই আল্লাহর ওপর ঈমান আনা- এটা অর্জন করার বিষয়, ব্যক্তিগতভাবে গুণ অর্জন করতে হয় এবং যে ঈমান আনবে সে (ব্যক্তিগতভাবে) এর প্রতিদান পাবে, উপরন্তু সে পাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা। ঈমান আনার পর এই মর্যাদা লাভের অনুভূতি এনে দেবে তার অন্তরের মধ্যে এক অব্যক্ত প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা এবং এরই কারণে সে মযবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে সত্য ও ন্যায়ের পথের ওপর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপদ আপদ, ভাগ্য বিপর্যয় যাই

আসুক না কেন, সর্বাবস্থায় সে দৃঢ়তা অবলম্বনের শক্তি পাবে, তার উপস্থাপিত দলীলের ওপর সে নিজে হবে আস্থাবান, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে হবে নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত এবং শুভ পরিণতি সম্পর্কে তার মধ্যে থাকবে দৃঢ় প্রত্যয়। অবশ্যই এসব অমূল্য নেয়ামত মানুষকে চেষ্টা করেই অর্জন করতে হয়। আর এই জিনিসটা থেকেই কাফেররা বঞ্চিত থাকে। অর্থাৎ এ সব নেয়ামত অর্জন করার জন্যে না থাকে তাদের কোনো নিয়ত, না থাকে তাদের কোনো চেষ্টা, এটাই তাদের বড় ক্ষতির কারণ, এটাই তাদের আসল বঞ্চনা। এরশাদ হচ্ছে, 'তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।'

জাহান্নাম পাপিষ্ঠদের সারাক্ষণ ঘিরে রাখবে

এরপর কথা আসছে ওই সব মোশরেকদের সম্পর্কে, কথা আসছে তাদের প্রতি শীঘ্র আযাব নেমে আসা সম্পর্কে। বলা হচ্ছে, জাহান্নাম তাদের খুব কাছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা জলদি করছে আযাবের ব্যাপারে .... আর (তখন) তিনি বলবেন, স্বাদ গ্রহণ করো এসব কাজের শাস্তির, যা তোমরা (পৃথিবীর জীবনে) করতে থেকেছো।' (আয়াত ৫৩-৫৫)

অর্থাৎ, মোশরেকরা অবশ্যই সতর্ককারীর হুশিয়ারী সংকেত শুনতো। আযাব আসায় বিলম্ব হতে দেখে মনে করতো, এসব ভুয়া কথা বুঝতে পারতো না এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত করার পেছনে কোন মহা হেকমত নিহিত রয়েছে। এ জন্যে তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বার বার দাবী জানাতো জলদি করে আযাব নাযিল করার জন্যে। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটা হয়েছে যে, আযাব পাঠাতে দেরী করা হয়েছে, যাতে করে তাদের অহংকার ও উচ্ছৃংখলতার পেয়ালা পূর্ণ হয়ে যায়, অথবা অনেক সময় মোমেনদের পরীক্ষা করার জন্যে এবং তাদের ঈমান ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়ার জন্যে আযাব নাযিলে দেরী করা হয়েছে। আবার কখনো বা আযাব নাযিলে বিলম্ব করা হয়েছে যে, আল্লাহ আলেমুল গায়ব, তাঁর গায়বী এলেম দ্বারা তিনি জানেন যে, কাফেরদের সারিতে এমন কিছু লোক আছে, যারা দোদুল্যমান অবস্থায় আছে, ইসলামের বিজয় দর্শনে যাদের মন এগিয়ে আসবে বলে তিনি জানেন, তাদের সে শুভ দিন আসার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে বিলম্বিত করা হচ্ছে, যেন তারা এ নেয়ামত গ্রহণ করতে পারে এবং টলটলায়মান অবস্থা পরিহার করে হেদায়াতের ওপর মযবুত হয়ে যেতে পারে। আর এ কারণেও আযাব নাযিল করতে বিলম্ব করা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, সে হঠকারী লোকদের বংশে কিছু নেক লোক জন্ম নেবে, তারা আল্লাহর নেক বান্দারূপে জীবন যাপন করবে, অনাগত ভবিষ্যতে এসব লোকেরা বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করে সত্য দ্বীনের দিকে চলে আসবে, আরও অনেক কারণ আছে যার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আযাব নাযিল করতে বিলম্ব করেন, যা আমরা জানি না।

কিন্তু মোশরেকরা আল্লাহর হেকমত ও তদবীর সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে দাবী করে বলছিলো যেন জলদি করে আযাব নাযিল করা হয়। 'যদি এক নির্দিষ্ট সময়ে আযাব নাযিল হওয়াটা পূর্বে নির্ধারিত না থাকতো তাহলে অবশ্যই সাথে সাথে তাদের ওপর আযাব এসে পড়তো .... এখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে সেই আযাব দান করার ওয়াদা করছেন যার জন্যে ওরা ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলো। আসবেই সে আযাব যথাযথ সময়ে, এমন সময়ে আসবে যখন তারা আর আযাব চাইবে না বা তার জন্যে অপেক্ষাও করবে না। সে সময় হঠাৎ করে আযাব এসে গেলে তারা হতবাক হয়ে যাবে এবং হঠাৎ করেই আসবে সে মহা বিপদ। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই তাদের ওপর আযাব হঠাৎ করে এসে পড়বে, যখন তারা বুঝতেই পারবে না।'

প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীকালে বদর যুদ্ধ উপলক্ষে তাদের ওপর সেই আযাব এসে গিয়েছিলো এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছিলেন। তারা তাদের নিজের

চোখেই দেখে নিয়েছিলো কেমন করে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তবে পূর্বেকার আযাব এবং এই আযাবের মধ্যে পার্থক্য ছিলো এই যে, পূর্বে যেমন সর্বগ্রাসী আযাব নাযিল করে সমগ্র ইসলাম বিরোধী জনপদকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, বর্তমান আযাবে নির্বিচারে সবাইকে ধ্বংস করা হয়নি, বরং তাদের মাথাগুলোকে শুধু শেষ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, তাদের দাবী অনুযায়ী পূর্বের নবী রসূলদের নিকট যে মোযেজা প্রেরণ করা হয়েছিলো, এ রকম বস্তুগত মোযেজা এ সময়ে নাযিল করা হয়নি। যদি সবার দেখা ও বুঝার মতো বস্তুগত কোনো মোজেযা রসূল (স.)-এর আমলে পাঠানো হতো, তাহলে ওই রকমই সর্বগ্রাসী আযাব নাযিল হয়ে যেতো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গায়বী এলেম দ্বারা জানতেন যে, মক্কার অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর হেকমত ও তদবীর বুঝতো না। এ জন্যে তারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে চ্যালেঞ্জ করে জলদী আযাব নিয়ে আসার জন্যে দাবী জানাচ্ছিলো। অথচ জাহান্নাম তাদের লুফে নেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা তোমার কাছে দাবী জানাচ্ছে জলদি আযাব নিয়ে আসার জন্যে, অথচ প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম তো তাদের ঘিরেই রেখেছে।'

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বর্ণনাপদ্ধতি এতই সুন্দর যে, পড়ার সময় মনে হয় বর্ণিত ঘটনাগুলো যেন চোখের সামনে ভাসছে, আর ভবিষ্যতের বিষয়গুলো এমন চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন সেগুলো চর্ম চোখে দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতের ভীতিজনক যেসব দৃশ্যের বর্ণনা দান করা হয়েছে, সেগুলো চোখের অন্তরালে থাকলেও অনুভূতির মধ্যে এক প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করে। এমতাবস্থায় ওরা যখন আযাব নাযিলের ব্যাপারে বেশী ব্যস্ততা দেখায়, তখন তা তাদের পরিণতি আরও মারাত্মক করে তোলে। যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে রেখেছে সে কোন সাহসে এবং কোন আশায় আযাবের ব্যাপারে ব্যস্ততা দেখায়? তার কি চিন্তা করা উচিত নয় যে, তার জীবন এবং জীবনের পরিণতি তো তার হাতের মধ্যে নয়? এটা কি কঠিন চিন্তা নয় যে, সে বে-খবর অবস্থায় মেকি আশার জাল বুনতেই থাকবে এবং অকল্পনীয়ভাবে হঠাৎ করে আযাব এসে যাবে?

আল কোরআনের অনবদ্য বাচনভংগিতে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে জাহান্নামের মধ্যে আযাবে লিপ্ত ব্যক্তিদের পাঠকের মধ্যে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু হায়, সে অর্বাচীনরা সেই আযাবের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'কি অবস্থা হবে সেদিন যেদিন তাদের জাহান্নামের আযাব ঢেকে ফেলবে তাদের ওপর দিক থেকে এবং পায়ের নীচে থেকে, আর তাদের বলবে, স্বাদ গ্রহণ করো (সেই আযাবের) যা তোমাদের কাছে তোমাদের কাজের বিনিময়ে নেমে আসবে।' (আয়াত ৫৫)

আসলে এ ভয়ংকর দৃশ্য নিজেই হবে ভীতিপ্রদ। উপরন্তু এর সাথে যোগ হবে প্রচন্ড তিরস্কারের ওপর তিরস্কার। বলা হবে, স্বাদ গ্রহণ করো সেই কাজের যা তোমরা পৃথিবীর জীবনে করতে থেকেছো।' এটাই হচ্ছে আযাব সম্পর্কে পরিণতি, আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর হুশিয়ারীকে হাল্কাভাবে দেখার ফল।

যারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে অস্বীকার করেছে, তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে এবং তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তাদের সেই কঠিন আযাবের মধ্যে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে যে তাদের ওপর ও নীচের দিক থেকে ঢেকে রাখবে সেই ভয়ংকর আযাব। এক কথায় সব দিক থেকে তারা আযাব দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকবে, আর সে অবস্থার মধ্যে থেকেও তাদের দৃষ্টি

পড়বে, সেসব মোমেনদের অবস্থানের দিকে, যাদের তারা নানাভাবে দুনিয়ার জীবনে নির্যাতন করেছে এবং দ্বীন ইসলাম থেকে তাদের সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। একমাত্র তাদের রবের এবাদাত তারা করুক এটা তারা সহ্য করতে পারেনি, যার জন্যে তারা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে, তাদের দ্বীন ইসলাম থেকে সরিয়ে নেয়ার কুমতলবে নানাভাবে তাদের প্ররোচিত করেছে, কুপামর্শ দিয়েছে যেন তারা তাদের আকীদা পরিত্যাগ করে, আর এই অসৎ উদ্দেশ্যে তারা নানা প্রকার ফিকির ফন্দি এঁটেছে। এহেন কুচক্রীদের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত মহব্বতের সাথে ও অতি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মোমেনদের সত্যের পথে দৃঢ় হয়ে থাকার জন্যে আহ্বান।

ঈমান বাঁচানোর জন্যে হিজরত করা

'হে আমার ঈমানদার বান্দারা, তোমরা ভালোভাবে জেনে নাও যে, আমার যমীন প্রশস্ত, সুতরাং আমারই দাসত্ব করো .... তিনি তাদের রেযেক দেন আর তোমাদেরও রেযেক দেন এবং তিনিই একমাত্র সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন।' (আয়াত ৫৬-৬০)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো, এসব মানুষের অন্তরের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবার অন্তরের মধ্যস্থিত সকল খবর সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং তিনি মনের কন্দরে লুকিয়ে থাকা সব তথ্য জানেন। তিনি জানেন তাদের ওই সব চিন্তা সম্পর্কে যা নিশিদিন তাদের মনের মধ্যে আনাগোনা করে এবং যা গড়ে ওঠে হৃদয়ের গ্রন্থিগুলোর মধ্যে। অবশ্যই এসব হৃদয়ের সৃষ্টিকর্তা ওদের বড় মহব্বতপূর্ণ ভাষা দ্বারা সম্বোধন করছেন। হে আমার ঈমানদার বান্দারা; এভাবে ডাক দিয়ে তিনি তাদের তার নিজের জীবন বিধান নিয়ে হিজরত করার আহ্বান জানাচ্ছেন। যাতে করে একেবারে প্রথম মুহূর্ত থেকে তারা তাদের দ্বীন (আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান)-এর তাৎপর্য বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যেন রবের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা এবং যেন তারা তাঁর কালামের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে। তাই বলা হচ্ছে, 'হে আমার বান্দাহ'। ওপরের বাক্যগুলোর মধ্যে এটাই প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আমার যমীন প্রশস্ত, অর্থাৎ, তোমরা আমার বান্দা, এটা আমারই যমীন– এটা প্রশস্ত, এতোটা প্রশস্ত যে, তোমাদের সবার পদভার সহ্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলো না দেখি কে আছে এমন যে তোমাদের নিজ নিজ সংকীর্ণ অবস্থানে ধরে রাখতে পারে? কে আছে এমন যে তোমাদের এতো কঠিন বিপদে ফেলতে পারে যার কারণে তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে সরে যাবে এবং তোমাদের আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করতে অক্ষম হয়ে যাবে? সত্যই যদি কোনো যমীন এতো সংকীর্ণ ও সংকটপূর্ণ হয়ে যায় তোমাদের জন্যে, যেখানে আল্লাহর হুকুমমতো চলতে পারো না এবং আল্লাহর দরবারে নিজেদের নিবেদন করতে পারো না, তাহলে ছেড়ে দাও সে এলাকা এবং চলে যাও এমন কোনো এলাকার দিকে যেখানে আল্লাহর হুকুম মতো যিন্দেগী যাপন করা সহজ বলে বুঝবে। একবার সেই দেশের দিকে রওয়ানা হয়েই দেখো না, দেখবে, সেখানে আল্লাহর মেহেরবানীতে বহু প্রশস্ততা এবং বিস্তর স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। 'অতএব (হে আমার বান্দারা), আমারই দাসত্ব করো।'

হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে মাতৃভূমির জন্যে দুর্বলতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মাতৃভূমি ছাড়ার কথা মনে আসার সাথে সাথে এমনই এক দুশ্চিন্তা মানুষকে পেয়ে বসে যে, নিজ মাতৃভূমির শিকড় ছিঁড়ে গেলে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও জীবনের সকল আশা ভরসা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তার মনে হয়, আজন্ম যাদের দরদী হিসেবে পেয়েছে তাদের বিচ্ছেদ অন্য কেউ পূরণ করতে পারবে না। এ জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সীমাহীন মর্মস্পর্শী ভাষায় এবং অত্যন্ত মহব্বতের সাথে সে দুটি বিষয় পূরণ করে দেবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছেন।

আবার পৃথিবীর মধ্যে সচ্ছলতা ও প্রশস্তার নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে বলছেন, 'হে আমার বান্দারা', নিশ্চয়ই আমার যমীন প্রশস্ত, অতএব, তোমরা আমারই এবাদাত করো।' অর্থাৎ এই শেষের কথাটির মাধ্যমে এই সরল ও চিরসত্য কথাটাই তুলে ধরছেন যে, গোটা পৃথিবীটা তো তাঁরই রাজ্য; সুতরাং তাঁর কাছে প্রিয়তম সেই এলাকাটি, যেখানে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার জন্যে প্রশস্ততা ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যেখানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা হয় না।

এরপর, দেশ ত্যাগ করলে যেসব ভয়-ভীতি, অসুবিধা, অভাব অভিযোগ ও সংকট-সমস্যা হাযির হয় এবং যেসব বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হয়, সেসবসহ মানুষকে মৃত্যুর বিভীষিকাও পেয়ে বসে, কিন্তু মক্কী যিন্দেগীতে মোমেনদের অবস্থা ছিলো এই যে, মোশরেকরা চাইতো পাখীকে খাঁচায় পুরে রেখেই জব্দ করা হোক। তারা মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে এবং এই পাখীগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, এটা তাদের বরদাশতের বাইরে ছিলো। এ জন্যে যখনই তারা জানতে পেরেছে কেউ হিজরত করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, সংগে সংগে তাকে আটকে ফেলেছে। এরপর দেশত্যাগে ইচ্ছুক লোকদের জন্যে তাদের যাত্রাপথ তারা নানাভাবে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এসব নানাবিধ কারণে হিজরত করাটা ভীষণ কঠিন হয়ে গিয়েছিলো। এই জন্যে দ্বিতীয় কঠিন অবস্থাটার কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, 'সকল ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তারপর আমার কাছেই তো তোমাদের ফিরে আসতে হবে।'

আসলে সকল এলাকার সকল মানুষের জন্যে মৃত্যু হচ্ছে এক চরম ও অমোঘ পরিণতি। সুতরাং কোনো আহ্বানকারী এমন নেই তাদের পক্ষে হিসাব দেয়ার দায়িত্ব নেবে, আর প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ জানে না যে তাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি, জানে না কখন এবং কোন কোন কারণে তাদের মৃত্যু আসবে? তবে অবশেষে তাঁর কাছেই যে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর কাছেই হবে শেষ আশ্রয়, এ বিষয়ে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্যে তাঁর দিকেই তাদের হিজরত করতে হবে, তাহলেই তারা দেখতে পাবে সেখানে তাদের জন্যে মাথা গোঁজার যথেষ্ট প্রশস্ত যমীন রয়েছে এবং একথা তারা অবশ্যই বিশ্বাস করে যে, এ জীবনের সফর শেষে তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তারা জানে ও বিশ্বাস করে, তারা একমাত্র আল্লাহরই সেসব বান্দা যাদের তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে আশ্রয় দান করবেন। সুতরাং কে আছে এমন যে তাদের নানা প্রকার ভয়-ভীতির যিনজীরে আবদ্ধ করে রাখবে? অথবা কে আছে এমন শক্তিমান, যে আল্লাহর এসব সাহায্যের আশ্বাস বাণী শোনানোর পরেও মোমেনদের অন্তরে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী সৃষ্টি করতে পারবে?

এ সব আশ্বাস বাণীর সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মক্কা থেকে আগত মোহাজেরদের প্রত্যেকের জন্যে মদীনা শরীফে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তাই নয়; বরং এই পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে তাদের জন্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুও যোগাড় করে দেয়া হয়েছিলো এবং তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, নিজেদের দেশ পরিত্যাগ করার কারণে তাদের যেসব সংকট সমস্যা ও অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়েছিলো, সেসব ব্যথা-বেদনা দূর করার সাথে সাথে তাদের জীবন যাপনের জন্যে মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার প্রশস্ততা ও সচ্ছলতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এভাবে গৃহহীন হওয়ার সকল অভাব পূরণ করার পর পরওয়ারদেগারে আলম তাদের জন্যে বাড়তি বরাদ্দ হিসেবে বাগ-বাগিচায় ভরা এমন জান্নাত মঞ্জুর করবেন বলে ওয়াদা করছেন, যার নীচ অথবা পাশ দিয়ে স্রোতস্বিনী ছোট ছোট নহর প্রবাহিত হতে থাকবে।

অর্থাৎ এ জীবনে হৃত সম্পদ সম্পত্তি পূরণ করার পর তাদের পরকালীন যিন্দেগীতে অতিরিক্ত আরও অনেক বড় জিনিস পুরস্কার হিসেবে দান করা হবে। আল্লাহর ঘোষণা,

'আর যারা ঈমান আনবে এবং ভালো কাজসমূহ করবে, (তাদের) আমি মহান আল্লাহ প্রদান করব জান্নাতের মধ্যে সুউচ্চ ঘরসমূহ, যেগুলোর তলদেশ বা পাশ দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।' এখানে তাদের কাজ, সবর ও তাওয়াক্কুলের কারণে তাদের অভিনন্দন জানানো হবে। বলা হবে,

'অতি চমৎকার (হবে) সৎ কর্মীদের প্রতিদান, যারা সর্বাবস্থায় সবর করেছে এবং তাদের রবের ওপর সকল বিষয়ে তাওয়াক্কুল করে।'

ওপরের এই ছোট বাক্যটি দ্বারা বিদগ্ধ সেসব হৃদয়গুলোকে কী সুন্দরভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মযবুত বানাচ্ছেন এবং কতো চমৎকারভাবে তাদের উৎসাহিত করছেন, তার একটি অতি উজ্জ্বল ঝলক ফুটে উঠেছে এমনই এক কঠিন সময়ে, যখন তারা গৃহহারা হওয়ার বেদনায় জর্জরিত এবং নানা প্রকার ভয়-ভীতি ও অভাবের চিন্তায় পেরেশান। নিজেদের দেশ, সম্পদ-সম্পত্তি, কর্মক্ষেত্রসমূহ, প্রিয় কর্মস্পৃহা ও বিশেষ বিশেষ কাজের প্রতি অনুরাগ এবং যোগ্যতা বিকাশের সুপরিচিত ক্ষেত্রসমূহ, এসব কিছু ছেড়ে আসার কারণে উদ্ভূত পেরেশানী ও নানাবিধ জীবন সামগ্রীর অভাববোধ তাদের হৃদয় মনকে অতি চুপিসারে দুর্বল করে ফেলছে, এহেন ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিচ্ছেন না; বরং অতি সুন্দর ভাষা ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি দ্বারা তাদের আশ্বাস দিতে গিয়ে বলছেন–

'তাকিয়ে দেখো একবার সে জীবজন্তুগুলোর দিকে ওদের মধ্যে তো অনেকেই আছে যারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের সামগ্রী নিজেরা বহন করে আনে না, তাদের যেমন করে আল্লাহ তায়ালা রেযেক দান করেন তোমাদেরও তো তিনি রেযেক দিয়ে থাকেন।'

-এটা হচ্ছে এমন এক কথা, যা অন্তরকে জাগিয়ে দেয় এবং জীবনের বাস্তবতা তাদের সামনে এক জীবন্ত প্রাণীর মতো ফুটিয়ে তোলে। আল্লাহর দুনিয়ায় কতো প্রাণী এমন আছে যারা নিজেদের খাদ্য খাবার, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা নিজেরা করে না, এসব তারা জমা করেও রাখে না, নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার তারা বহন করে নিয়েও বেড়ায় না বা এ নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনাও করে না, তারা এটাও জানে না যে, এসব কেমন করে বৃদ্ধি পায় এবং এগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায়, জানে না কেমন করে এসব খাদ্য খাবার তাদের কাছে পৌছানো হয় এবং কিভাবে তাদের তিনি হেফাযত করেন। সব কিছুর ওপরে যে চিন্তাটা তাদের করা দরকার তা হচ্ছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের খাওয়াচ্ছেন এবং অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার জন্যে তাদের যে পরিত্যাগ করছেন তা নয়। একইভাবে সকল মানুষের জন্যেও তিনিই রেযেক বরাদ্দ করছেন। যদি কখনো তাদের ধারণায় এমন আসে যে, তাদের রেযেকের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিচ্ছে এবং এ রেযেক আহরণের জন্যে তাদের চেষ্টা-তদবীরকে তারা নিজেরা কাছে লাগাচ্ছে, তাহলে তাদের চিন্তা করা দরকার তাদের জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদান তো তিনিই দিচ্ছেন এবং এসব উৎপাদনের জন্যে তাদের যোগ্যতা ও বুদ্ধি দান করা সব তো তাঁরই মেহেরবানী। কাজেই এসব কিছুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দান তো তাঁরই দেয়া রেযেক। আল্লাহর কাছে পৌছুনোর কোন ক্ষমতা তাদের নেই এবং তাঁরই মেহেরবানী ও ক্ষমতা দান ছাড়া নিজের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের জানানো হচ্ছে যে, হিজরতের সময় রেযেক সম্পর্কে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই।

তারা তো আল্লাহর (অনুগত) বান্দা, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা তাঁর যে রাজ্য, সে রাজ্যেরই তারা নাগরিক। এ রাজ্যের এক অংশ থেকে আর এক অংশে তারা যাচ্ছে। সুতরাং তাঁর নাগরিকদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো এটা তো তাঁরই দায়িত্ব। যেখানেই তারা থাকুক না কেন তাদের তিনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে তাদের এই মহব্বতের সম্পর্ক এটা চূড়ান্ত রূপে নেমে আসবে তখন যখন তারা তাঁর সাথে মিলিত হবে। তখনই প্রকৃতপক্ষে তারা বুঝতে পারবে তাদের প্রতি আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁর পরিচালনার কথা। সুতরাং আজকে তাদের বুঝা দরকার যে, তিনি অবশ্যই তাদের কথা শোনেন ও তাদের অবস্থা জানেন এবং তাদের তিনি কিছুতেই একাকী অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'তিনিই (সকল কিছু) শুনবেওয়ালা জানবেওয়ালা।'

এখানে এই ছোট্ট ভাষণটি শেষ হচ্ছে। ছোট্ট হলেও এর মধ্যে মোহাজেরদের সকল ব্যাকুলতা তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মধ্যে জানানো হয়েছে যে, জন্মভূমি পরিত্যাগের সময় তাদের মনের মধ্যে যতো প্রকার সংকট সমস্যা ও দুশ্চিন্তা এসেছে, সব কিছু পরম করুণাময় আল্লাহ পাক নিজ ক্ষমতা ও মেহেরবানী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সেই মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় ভয় ভীতি ও দুশ্চিন্তাকে পরম প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। পেরেশানী ও অস্থিরতার স্থলে এনে দিয়েছেন অবিচলতা ও স্থিরতা। তাদের সকল ক্লান্তি দূর করে এনে দিয়েছেন আরাম ও তৃপ্তির আনন্দ। আর মহান আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় ধন্য হওয়ার কারণে আত্মীয়স্বজন, জমি-জায়গা, ছাগল-ভেড়া, নিরাপত্তার প্রশ্ন ইত্যাদি সবই তাদের কাছে সেদিন গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছিলো এবং এভাবে তারা আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। সে কঠিন সফরের সময় সান্ত্বনা দান করা হয়েছিলো তাঁরই পক্ষ থেকে, যিনি বিশ্বলোকের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

মোশরেকদের বিশ্বাসের ধরণ

মোমেনদের সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করার পর এ প্রসংগ শেষ হচ্ছে এবং পরবর্তী প্রসংগে মোশরেকদের ভূমিকা ও তাদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। জানানো হচ্ছে যে, তারা অবশ্যই স্বীকার করে, সুউচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সবাই আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিচালনা করছেন সূর্য ও চাঁদকে, আকাশ থেকে তিনিই বর্ষণ করছেন প্রয়োজনীয় বৃষ্টি, যার দ্বারা যমীন মরে যাওয়ার পর আবার যিন্দা করে তুলেছেন। আর এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কখনো তাদের জন্যে জীবন ধারণ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করে দিচ্ছেন, আবার কখনো সংকীর্ণ করছেন এবং এটাও ঠিক যে, যে কোনো কঠিন সংকট ও ভয়ের মুহূর্তে তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে, কিন্তু এরপরও তারা আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কেউ শরীক আছে বলে মনে করে, যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে তাদের কষ্ট দেয়, যে আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই, নেই কোন সন্দেহ– সেই বিষয়েও তারা মোমেনদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়, পবিত্র কাবা গৃহের মোতাওয়াল্লী ও প্রতিবেশী হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা যেসব নেয়ামত তাদের দিয়েছেন, যে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা এই ঘরের কারণেই দিয়েছেন, সেই পবিত্র ঘরেই তারা তার বান্দাদের ভয় দেখায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে সৃষ্টি করেছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং কে নিয়ন্ত্রণ করছে সূর্য ও চাঁদকে, তখন ওরা বলে, আল্লাহ ....?' (আয়াত ৬৩-৬৮)

এ আয়াতগুলোর মধ্যে ছবির মতো ফুটে ওঠছে তৎকালীন আরবদের মধ্যে বিরাজমান আকীদা বিশ্বাসের নমুনা এবং জানানো হচ্ছে যে, তাদের অন্তরের গভীরে এক আল্লাহর অস্তিত্বের কথা প্রোথিত হয়েছিলো, কিন্তু (কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার হীন মানসিকতার কারণে) পরবর্তীতে তাদের এ আকীদার মধ্যে বিভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করে। আর এটা বিচিত্র নয় যে, তাদের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত হলেও আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস বিদ্যমান ছিলো। তা ছিলো এই জন্যে যে, তারা জানতো ও বিশ্বাস করতো যে, তারা ইসমাঈল ইবনে ইববরাহীম (আ.)-এর বংশধর এবং এ জন্যে এই আরব উপদ্বীপের মধ্যে পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও তারা মূসা ও ঈসা (আ)-এর ধর্ম এবং তাদের অনুসারীদের সাথে মিলে মিশে না গিয়ে বরাবর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতো। আর বাস্তবে তারা বিশ্বাসও করতো যে, তারা ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের অনুসারী এবং এ জন্যে তারা গৌরবও বোধ করতো। এ সময়ে স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত পরিচালনায় তারা কোন সময়ে এবং কিভাবে যে এ মূল আকীদা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো তা তারা জানতেও পারেনি।

তাদের যখন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, জিজ্ঞেস করা হতো এ সবের নিয়ন্ত্রণকারী সম্পর্কে, জিজ্ঞেস করা হতো আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী সম্পর্কে এবং এই পানি দিয়ে মুর্দা যমীনকে যিন্দা করনেওয়ালা সম্পর্কে ...... তখন তারা অকপটে স্বীকার করতো যে অবশ্যই এ সব কিছুর নির্মাণকারী আল্লাহ তায়ালা; অথচ এ সব সত্ত্বেও তারা মূর্তি পূজা করতো, পূজা করতো জ্বিনদের, অথবা পূজা করতো ফেরেশতাদের এবং পূজা অর্চনা ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারে তারা আল্লাহর সাথে আরও অনেককে শরীক করে নিতো। যদিও সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এদের কারও কোনো ভূমিকা আছে বলে তারা মনে করতো না। এটা বড়ই বিস্ময়কর বৈপরীত্য। তাদের কাজ ও কথার মধ্যে এই যে অদ্ভুত গরমিল ছিলো, তারই কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীনও আলোচ্য আয়াতগুলোতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, 'তাহলে কোথায় তাদের বিভ্রান্ত করে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে?' অর্থাৎ, এই আজব গরমিলজনক কাজ ও আচরণের মাধ্যমে তাদের কেমন করে সত্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'বরং (আসল ব্যাপার হচ্ছে) তাদের মধ্যে অধিকাংশই বোঝে না (বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই গোলমেলে অবস্থাকে যুক্তিপূর্ণ বলে মেনে নেয় এবং এই ভ্রান্তির মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে সে আসলে কিছু বুঝে না।

কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, কে সূর্য ও চাঁদের নিয়ন্তা, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণকারী এবং যমীন মরে যাওয়ার পর তাকে কে আবার জীবিত করে? মানুষের মনে যখন এ সব প্রশ্ন জাগে, তখন বুঝা যায় সবারই মনের মধ্যে এ কথাটা লুকিয়ে আছে যে, আল্লাহ তায়ালাই যার জন্যে চান, তাঁর নেয়ামতের ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেন এবং যার জন্যে চান, তার রুযি সংকুচিত করে দেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির যে নিয়ম এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৃষ্টি ও তাঁর ক্ষমতার যেসব চিহ্ন চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তার সাথে রুযি রোজগারের ব্যাপারটা ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আর এসব কিছুর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছেই রয়েছে। সে জন্যেই তিনি বলছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।'

আর মানব জীবনের জন্যে যতো প্রকার দ্রব্য সম্ভারের প্রয়োজন, সেসব কিছুই সম্পৃক্ত নভোমন্ডলের আবর্তনের সাথে। শুধু তাই নয়, বরং পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সকল প্রকার জীবজন্তু, পানি, ফসল, গাছপালা, তরুলতা, শাকসবজি সব কিছুরই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে শূন্যলোকে আবর্তনশীল ছায়ালোকের সাথে এবং এর বাড়ানো কমানো একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন-

একথাটাই ওপরে বর্ণিত আয়াতসমূহে বিশেষভাবে ফুটে ওঠেছে। সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, প্রাণী জগতের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা আসে পানি থেকে, যা বৃষ্টি আকারে আকাশ থেকে নেমে আসে, আসে প্রবাহমান নদী নালার পানি থেকে পৃথিবীতে উৎপন্ন গাছ-পালা ও ফসলাদি থেকে, প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে যে জীবজন্তু তার থেকে এবং খনিজদ্রব্য ও পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত অশোধিত ধাতব পদার্থ থেকে, আরও আসছে স্থলভাগ ও পানি ভাগের মধ্যে শিকারযোগ্য নানাবিধ প্রাণী থেকে .... সবশেষে সেই উৎসের কথা চিন্তা করতে হবে যা সকল উৎসের মূল উৎস আর তা হচ্ছে ওই নিয়ম-কানুন, যার অধীনে চলছে আসমানসমূহ ও যমীন। আর এই মহাকাশের মধ্যে যা সরাসরি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে তা হচ্ছে সূর্য ও চাঁদ। যদি কোনো সময় এই আইনের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন হতো তাহলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো গোটা বিশ্বজগতের ওপর। আসলে এটা খেয়াল করার বিষয়, সারা জগতের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে আইন করে দিয়েছেন তা এমনই অমোঘ এবং এমন উপযোগী যে, তার মধ্যে সামান্য কোনো পরিবর্তন হলেই সবখানে এমন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে যা ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই। এতে বুঝা যায়, সৃষ্টির সব কিছু একটি মাত্র সূতায় গাঁথা, যার মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে তার প্রতিক্রিয়া গোটা বিশ্বজগতের জন্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে, এমনকি পৃথিবীর পেটের মধ্যে অবস্থিত কোন গোপন পদার্থও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে না। অবশ্য সৃষ্টির প্রয়োজনে সব কিছু বাস্তবায়িত হওয়া, কোনো স্থানে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া এবং পৃথিবীবাসীর প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়া, সব কিছুই সূর্য ও চাঁদের প্রভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, আর এ সবকিছুই মহান রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও জ্ঞানের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। (১)

মহাগ্রন্থ এই আল কোরআনের সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এর মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় দৃশ্যাবলী। এগুলো সবই এ মহান কেতাবের প্রমাণ হিসেবে আমাদের সবার সামনে ভাসছে। এ পাক কালামের মধ্যে বর্ণিত সকল কিছু যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা জাগায়। যখন মানুষ প্রকৃতির বুকে বিরাজমান রহস্যরাজির মুখোমুখি হয়, এ সব কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করে, এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে চায় এবং তাঁর কুদরতকে তখন দেখতে পায় সবকিছুর মধ্যে একই নিয়ম-কানুন বিরাজমান, দেখে সব কিছুর মধ্যে পূর্ণ নিয়ম শৃংখলা এবং তখন সে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা বুঝার জন্যে আর কোনো বড় জ্ঞান সাধনা করার প্রয়োজন বোধ করে না। তাই মহান রব্বুল আলামীনকে জানা ও বুঝার জন্যে প্রয়োজন শুধু জাগ্রত অনুভূতি ও দৃষ্টিওয়ালা অন্তর। এমনই সজাগ ও যিন্দা-দিল মানুষ যখন সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার কোনো নিদর্শন দেখতে পায় তখন বিমোহিতভাবে গেয়ে ওঠে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা গীতি। তাই এরশাদ হচ্ছে, '(হে রসূল) বলো, যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতিত্ব আল্লাহর, বরং অধিকাংশ মানুষ বোঝে না এবং তার জ্ঞান কাজে লাগায় না।'

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে ইসলামী দর্শন

এখানে প্রধানত চারটি বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে। (১) পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব, (২) তাদের জীবন ধারণ সামগ্রী, (৩) তাদের বিস্তার এবং (৪) জীবন শেষে পৃথিবী থেকে বিদায়ের পরে যেদিন রোজহাশরের ময়দানে বিচারের সূক্ষ্ম মানদন্ড তাদের সামনে রেখে দেয়া হবে সেদিন সে মানদন্ডে ধরা পড়বে, ভালো বা মন্দ যে যা করেছে সব কিছু সঠিকভাবে। সুতরাং আখেরাতের সেই জীবন সম্পর্কে যখন চিন্তা করা হয় তখন দুনিয়ার জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, বিলাসব্যসন এবং খেলাধূলা সব কিছু অসার মনে হয়। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

(১) দেখুন, সূরা ফোরকান-এর মধ্যে, 'ওয়া খালাক্বা কুল্লা শাইইন ফাক্বাদ্দারাহু তাক্বদীরা'-এই আয়াতটির তাফসীর।

'দুনিয়ার এ জীবন এক (সাময়িক) খেল তামাশা বৈ আর কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের বাসস্থানই আসল যিন্দেগী, হায় যদি ওরা বুঝতো!'

আসলে আখেরাতের জীবন সম্পর্কে যদি চিন্তা না করা হয় এবং এ জীবনের সব কিছুর জন্যে রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে এ কথা যদি চিন্তা না করে জীবন যাপন করা হয় তাহলে অবশ্যই এ জীবনের সব কিছুই খেল-তামাশা ও অসার বস্তুতে পরিণত হবে। আর যদি আখেরাতের জীবনের চেতনা থাকে এবং প্রতিটি কাজ, কথা ও চিন্তা সম্পর্কে আদালতে আখেরাতে হিসাব দেয়ার কথা মনে রেখে জীবন যাপন করা হয় তাহলে সকল কাজই দায়িত্বপূর্ণ হবে, অবহেলায় জীবনের অমূল্য সময় ব্যয়িত হবে না। সে মহান দিবসের কথা চিন্তা করেই মানুষ তার জীবনের কর্মকান্ডের পরিকল্পনা তৈরী করবে, তখন সে খুঁজে পাবে তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবনই হচ্ছে আসল জীবন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সেটাই আসল জীবন।' অর্থাৎ আখেরাতের কথা স্মরণ করে যে জীবন পরিচালিত হবে তার মধ্যে থাকবে না কোনো দায়িত্বহীন কাজ ও ব্যবহার, থাকবে না সময় ও সম্পদের অপচয়, হেলায় খেলায় কাটবে না সে জীবন; বরং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে তার জীবন, কাজ ও ব্যবহার পরিচালিত হবে; আর এরই ফলে তার জীবন সার্থকতা ও সফলতায় কানায় কানায় ভরে ওঠবে।

এ কথার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, আল কোরআন মানুষকে দরবেশী জীবন যাপন করতে শেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে দুনিয়ার কোন নেয়ামত ভোগ না করে সেসব কিছু থেকে দূরে থাকতে; বরং এটা ইসলামের শিক্ষা ও মূল সুরের খেলাফ। জীবনকে নীরস নিরানন্দ করে তোলা কখনো ইসলামের লক্ষ্য হতে পারে না। ইসলাম চায়, মানুষ আখেরাতকে সামনে রেখেই জীবনের সব কিছু ভোগ ব্যবহার করুক। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া সীমার মধ্যে থেকে জীবনকে আনন্দময় করায় অবশ্যই কোনো বাধা নেই। এমন রস ও রসিকতা বারণ করা হয়নি যার দ্বারা নিজে বা অন্য কারো কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় এবং আল্লাহর কোনো বিধান সরাসরি লংঘিত না হয়। এভাবে একজন মোমেন দুনিয়া ও আখেরাতকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করে, এমন কিছু করতে সে কখনো প্রস্তুত হয় না যাতে তার আখেরাতের জীবনে কোনো কষ্ট নেমে আসার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে আখেরাতের জীবন ঠিক রেখে একজন মোমেন পার্থিব জীবন সুন্দর, সুখময় ও আনন্দমুখর করতে দ্বিধা করে না এবং এতে আল্লাহ রসূলের পক্ষ থেকেও কোনো বাধা নেই তাই, মোমেনের যিন্দেগী হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও হিসাব-নিকাশ করা এক যিন্দেগী। সে কখনো নিজেকে পুরোপুরি স্বাধীন মনে করে না ও লাগামছাড়া ভাবেও চলে না। আখেরাতের চিন্তা থেকে মুক্ত জীবনই খেল তামাশা এবং আখেরাতমুখী জীবনই নিষ্কলুষ ও সুন্দর জীবন।

শুধু বিপদের সময়েই আল্লাহকে স্মরণ করা

এভাবে মাপঝোক করে চলার জন্যে থমকে যাওয়া, খেয়াল করা– এ মনোভাবই একজন মোমেনকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ ও ব্যবহার থেকে থামিয়ে দেয়, সে মোশরেকদের মতো অকৃতজ্ঞ হয় না। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তারা নৌ-জাহাজে আরোহণ করে তখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ডাকে। তার পর যখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাদের বিপদ থেকে মুক্ত করে স্থলভাগে পৌঁছে দেন তখন তারা শেরেক করতে শুরু করে।'

এই হচ্ছে তাদের কাজ ও ব্যবহারের অসংলগ্নতা এবং কথা ও কাজের বৈপরীত্য। যখন তারা জাহাজে আরোহণ করে এবং উত্তাল তরংগের মধ্যে জাহাজটি প্রচন্ডভাবে দুলতে থাকে, ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে জাহাজটাকে খেলনার মতো নাচাতে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কথা তাদের মনে থাকে না। তারা তখন কায়মনোবাক্যে বিশ্ব পালকের কাছেই কান্নাকাটি করতে থাকে এবং একমনে শুধু তাকেই স্মরণ করতে থাকে। তখন একমাত্র একটি শক্তিই তাদের মন মগয ও গোটা অস্তিত্ব দখল করে রাখে এবং সেটাই আল্লাহর শক্তি। তখন তাদের চেতনায়, মনে মুখে একই শব্দ গুঞ্জরিত হয়, আল্লাহ! আল্লাহ! এই সময়ে তারা সবাই নিজেদের আসল প্রকৃতির দিকে ফিরে যায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব হৃদয় মন দিয়ে অনুভব করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তিনি তাদের সে মহাবিপদ নাজাত দেন এবং ডাংগার দিকে নিয়ে যান তখন তারা (এ উদ্ধার কাজে আরও কারও বাহাদুরী আছে বলে) তাঁর শক্তি-ক্ষমতায় অন্যকে অংশীদার বানায়। অর্থাৎ উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর তারা ভুলে যায় তাদের সঠিক ও সুদৃঢ় প্রকৃতির বার্তাকে, ভুলে যায় সে কথা যে, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করবে বলে তারা একদিন ওয়াদা করেছিলো এবং একাগ্রচিত্তে একমাত্র তাঁকেই তারা বিপদ মুক্তির জন্যে ডেকে ছিলো। এভাবে শুভদিন ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে পেছনের সব কথা ভুলে গিয়ে ওয়াদা ও আত্মসমর্পণের কথা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আর এই সত্য-বিমুখতার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করা। অস্বীকার করা তার দেয়া সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিকে। হায়রে হতভাগা মানুষ। সত্য থেকে এভাবে দূরে সরে যাওয়ার পেছনে তার উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হচ্ছে স্বার্থপরতার সাথে এবং লাগামহীনভাবে দুনিয়াটাকে ভোগ করার প্রবণতা।

এর ফল যা হওয়া দরকার তাই হয়। অর্থাৎ, তাদের ওপর মহাবিপর্যয়, অশান্তি ও অবক্ষয় নেমে আসে। তাদের এ মহাঅন্যায় আচরণ তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'(তাদের সে আচরণ দ্বারা) তারা অস্বীকার করতে চায় এ নেয়ামতকে যা আমি মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছি এবং এভাবে জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ করতে চায়। অতপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।' এ কথা দ্বারা ইংগিতে তাদের জানিয়ে দেয়া হল যে, অচিরেই তাদের ওপর কঠিন আযাব নেমে আসবে।

এরপর তাদের জানানো হচ্ছে যে, হারাম শরীফকে তাদের জন্যে পরম নিরাপদ এলাকা বানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের মহাসম্মান রূপ নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করছে, কিন্তু তারা আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী করতে রাযি নয়, প্রস্তুত নয় একমাত্র তারই কাছে নতিস্বীকার করতে এবং এবাদাত করতে, বরং তারা মোমেনদেরও সে শেরেকের মধ্যে লিপ্ত করে ফেলতে চায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি দেখছে না যে, আমি মহান আল্লাহ হারাম শরীফকে নিরাপদ স্থান বানিয়েছি, অথচ তার আশপাশ থেকে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ওরা কি মিথ্যার ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে?'

অবশ্যই এটা বাস্তব সত্য কথা যে, মক্কা নগরীতে অবস্থিত হারাম শরীফের অধিবাসীরা পরম নিরাপত্তার মধ্যে বাস করতো। তাদের আল্লাহ রব্বুল আলামীন বায়তুল্লাহর কারণেই সম্মানিত করেছিলেন। অথচ এই মর্যাদাপূর্ণ এলাকার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার লোকেরা সদা-সর্বদা

লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতো এবং তারা একে অপরকে নিরন্তর ভয়ভীতির মধ্যে নিপতিত রাখতো। এর ফলে সেই পবিত্র ঘরের ছায়াতলে আসা ছাড়া তারা কোনোই নিরাপত্তা বোধ করতো না, যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজে নিরাপদ রেখেছিলেন। এতদসত্তেও বড়ই আজব ব্যাপার যে, আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সেই ঘরের মধ্যেই তারা বানিয়ে রেখেছিলো প্রতিমার মঞ্চ। আর এর থেকে বিচিত্র ব্যাপার আর কি হতে পারে। যে সেই ঘরকেই অন্যের পূজার জন্যে বেদী বানালো অবশ্যই সে মহাপাপাচারী ও বড় যালেম, তা সে যে-ইই হোক না কেন!

'তাহলে তারা কি বাতিল বা মিথ্যার ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে?' আরও এরশাদ হচ্ছে,

'আর তার থেকে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে এবং সত্য এসে যাওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করবে? (তাহলে) জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফেরদের বাসস্থান নয়? এসব মোশরেকেরা আল্লাহর সাথে জেনে বুঝে অন্যকে শরীক করে মিথ্যা ও অন্যায় কাজ করেছে। তারা সত্য সমাগত হওয়ার পর তা অস্বীকার করেছে এবং বেয়াদবী করেছে সত্যের সাথে। তাহলে জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফেরদের বাসস্থান নির্ধারিত হবে না? অবশ্যই এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবেই তাদের স্থান হবে জাহান্নামের মধ্যে।

অন্য আর একটি দলের উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে। যারা আল্লাহর পথে টিকে থাকতে গিয়ে এবং তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জেহাদ করে, জেহাদ করে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে, যারা তাঁর পথে চলতে গিয়ে মাল-সামান সংগ্রহ ও বহন করে, এরপর আর পেছনের দিকে তাকায় না বা হতাশও হয় না, যারা অন্তরের মধ্য থেকে আগত বাধা-বিপত্তির মধ্যে এবং বাইরে থেকে আসা বিপদের মধ্যে অবস্থান করার সময়ে সবর করে, যারা চাদর গায়ে দিয়ে রওয়ানা হয় সে অজানা, কষ্টকর, দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথে .... তারাই হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরিত্যাগ করবেন না, এই বিপদসংকুল রাস্তায় অসহায় ও একাকী অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, তাদের ঈমান এবং তাদের জেহাদ তিনি ভুলে যাবেন না। তিনি তাঁর মহাসম্মানজনক অবস্থান থেকে তাদের কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন, দেখছেন ও মূল্যায়ন করছেন তাদের জেহাদ এবং তিনিই দেখাবেন তাদের প্রকৃত সঠিক পথ। সত্যের পথে নিবেদিত লোকদের তিনি অবশ্যই দেখছেন এবং দেখছেন তাদের কঠোর সংগ্রামী জীবন। তিনি আরও দেখছেন, এ পথে কাজ করতে গিয়ে তারা আলিংগন করে নিয়েছে এবং সকল দুঃখ জ্বালা ও দুঃসহ কষ্টের মধ্যে সবর করে চলেছেন। তিনি আরও দেখে যাচ্ছেন তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা এবং সত্যের খাতিরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ বিনিময়কে, এ জন্যে অবশ্যই তিনি তাদের উপযুক্ত পুরস্কার ও মর্যাদা দান করবেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা আমার পথে টিকে থাকতে গিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ তাদের বহু পথ দেখাব। আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এহসানকারীদের সাথে রয়েছেন।'

সূরা আর রোম

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরার প্রথম আয়াতগুলো একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটা ছিলো এই যে, আরব উপদ্বীপে রোম সাম্রাজ্যের যে অংশটুকু ছিলো, সেই অংশটি। রোম সাম্রাজের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তার ওপর পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ী হয়। এ ঘটনাটা ঘটে তখন, যখন হিজরতের পূর্বে মক্কার মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক তুংগে উঠেছিলো। রোম সাম্রাজ্য ছিলো খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। খৃষ্টান সম্প্রদায় যে আল্লাহর কেতাব ইনজীল ও আল্লাহর নবী হযরত ঈসার অনুসারী, সে কথা সুবিদিত। পক্ষান্তরে পারসিকরা মোশরেক এবং অগ্নি উপাসক। তাই এই ঘটনায় মক্কার মোশরেকরা খুব খুশী হয়। তারা পারস্যের অগ্নি উপাসকদের বিজয়কে তওহীদের ওপর পৌত্তলিকতার বিজয়ের সমার্থক এবং মোমেনদের ওপর কাফেরদের বিজয়ের সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে।

এ কারণে এই সূরার প্রথম আয়াত ক'টাতে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকরা পুনরায় বিজয় ছিনিয়ে আনবে এবং তখন মুসলমানরা আনন্দিত হবে। কেননা মুসলমানরা মোশরেকদের ওপর আহলে কেতাবের বিজয় হোক এটাই পছন্দ করে।

কিন্তু কোরআন শুধু এই ওয়াদা ও এই ঘটনাতেই নিজের আলোচনা সীমিত রাখেনি। বরং সে নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে শুরু করে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বক্তব্য পেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে এটা ছিলো একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষকে সামনে রেখে কোরআন মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির সাথে একীভূত করে, আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহর যে চিরন্তন ঐতিহ্য ও নীতি রয়েছে, তার সাথে সেই মহা সত্যের সংযোগ সাধন করে যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর সংযোগ সাধন করে মানব জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝেও। তারপর ইহকালীন জীবনের পর পরকালীন জীবনের বিষয়েও আলোচনা করে। তাদেরকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করায়। আরো পর্যবেক্ষণ করায় মানব সত্তার আভ্যন্তরীণ ও সামগ্রিক অবস্থা এবং সৃষ্ট জগতের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী। এই পর্যবেক্ষণের ফলে তারা এমন সব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, যা তাদের জীবনকে উন্নত করে, মুক্ত করে, উদার ও প্রশস্ত করে, তাদেরকে স্থান কাল ও পরিস্থিতির সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে। অতপর তাকে টেনে নিয়ে যায় সৃষ্টি জগতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুপ্রশস্ত বিশালতার দিকে এবং প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যোগসূত্রসমূহের দিকে।

এ জন্যে এই মহাবিশ্বে যাবতীয় সংযোগ ও সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে তাদের ক্ষমতার মান উন্নত হয়। তারা বুঝতে পারে যে, মহাবিশ্বকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানব স্বভাব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী বিধানসমূহ কত বড়। তারা আরো বুঝতে পারে মানব জীবন ও তার ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী এবং জয় পরাজয়ের স্থান নির্ণয়কারী, আল্লাহর বিধিসমূহ কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। তারা আরো উপলব্ধি করতে পারে বিশ্ববাসীর কর্মকান্ডের ফলাফল ও মান নির্ণয়কারী, তাদের পার্থিব তৎপরতার মূল্যায়নকারী ও তার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মফল নির্ধারণকারী দাঁড়িপাল্লা কেমন সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে।

এই উন্নততর, ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর চিন্তা ও উপলব্ধির আলোকে এটা স্পট হয়ে ওঠে যে, ইসলামের এ দাওয়াত আসলে একটা বিশ্বজনীন দাওয়াত এবং তা সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত, যদিও এ দাওয়াত এক সময় মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলো এবং তার পাহাড়

পর্বত ও উপত্যকাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। এ দাওয়াতের ক্ষেত্র এতো ব্যাপক বিস্তৃত যে, তা শুধু এই পৃথিবীর সাথেই যুক্ত নয়, বরং তা সমগ্র সৃষ্টি জগত ও তার প্রধান নিয়মাবলীর সাথে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এবং মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সাথেও যুক্ত। এটা শুধু দৃশ্যমান এই পৃথিবী জুড়েই বিস্তৃত নয়, বরং আখেরাত পর্যন্তও বিস্তৃত।

অনুরূপভাবে এর সাথে প্রত্যেক মুসলমানের মনও জড়িত। এর ভিত্তিতে জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তার অনুভূতি ও ধ্যান ধারণাও গঠিত। এরই আলোকে তার দৃষ্টি পরিচালিত হয় আকাশ ও আখেরাতের দিকে, তার চার পাশের বিস্ময়কর ও রহস্যময় জগতের দিকে এবং তার সামনে ও পেছনে সংঘটিত ঘটনাবলী ও তার ফলাফলের দিকে। এরই আলোকে সে তার ও তার জাতির অবস্থা উপলব্ধি করে এবং মানুষের বিবেচনায় ও আল্লাহর বিবেচনায় নিজের ও নিজের আকীদা বিশ্বাসের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করে। অতপর সে সচেতনভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করে।

সূরাটা সে সব সম্পর্ক ও সম্বন্ধের ওপর আলোকপাত করে এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে ও মানব মনে তার নিদর্শনাবলীকে চিহ্নিত করে। সূরাটা দুটো পর্বে বিভক্ত, প্রথম পর্বে মুসলমানদের বিজয় এবং আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর যে সত্যের সাথে ইহকাল ও পরকালের সমগ্র ব্যবস্থা জড়িত। সেই সত্যের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। আর মানুষের মনকে পূর্ববর্তী মানুষদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পরকালীন জীবনটাও যে অবিকল তদ্রূপ, সে কথাও জানানো হয়েছে। এ কারণে তাদের সামনে কেয়ামতের একটা দৃশ্য এবং কাফের ও মোমেনরা সেখানে কেমন কর্মফল পাবে তা দেখানো হয়েছে। অতপর পুনরায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, নিদর্শনাবলী ও তার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। অতপর মানুষের নিজের ও তার দাসদাসীর উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, শেরেক কত নিকৃষ্ট ধরনের মতবাদ এবং কোনো সত্যের ওপর বা নির্ভুল জ্ঞানের ওপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নয়। এই পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে রসূল (স.)-কে সত্যের তথা আল্লাহ তায়ালা যে স্বাভাবিক অবস্থার ওপর (ফেতরাত) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই পথ ও সেই অবস্থার অনুসরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে। এই পথ কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং তা কখনো কারো খেয়ালখুশীর অনুসারী হয় না। তাই এই পথের অনুসারীরা কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এখানে তেমন কিছু ঘটেনা প্রবৃত্তির অনুসারীরা।

দ্বিতীয় পর্বে দেখানো হয়েছে যে, পরিবর্তন ও স্থীতিহীনতা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কাজেই মানুষ যতোক্ষণ কোনো অটল ও অপরিবর্তনীয় বিধানের অনুসারী না হবে, ততোক্ষণ তার ওপর ভিত্তি করে কোনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এই পর্বে সুখে দুঃখে, অভাবে ও প্রাচুর্যে মানুষের কী অবস্থা হয়, তাও দেখানো হয়েছে। এই প্রসংগে সম্পদের ব্যয় বন্টন ও উন্নয়নের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। অতপর পুনরায় শেরেক ও যাদেরকে শরীক মানা হয় তারা কোন সম্পদ সৃষ্টি করতে বা দিতেও পারে না, কাউকে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না। জলে ও স্থলে দুর্যোগ ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার জন্যে মানুষের অপকর্মকে দায়ী করা হয়েছে এবং মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে মোশরেকদের কী পরিণতি হয়েছে তা দেখতে বলা হয়েছে। এ জন্যে রসূল (স.)-কে কেয়ামত আসার আগেই স্বভাব ধর্ম ইসলামকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শনালী পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে প্রথম পর্বের মতোই। আর এরপর এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ যে

পথ নির্দেশিকা দেন, সেটাই প্রকৃত পথ নির্দেশিকা। আর রসূল (স.)-এর কাজ প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। যারা আল্লাহর নিদর্শন চোখ দিয়ে দেখতে ও আল্লাহর বিধান কান দিয়ে শুনতে চায় না, সেই সব সেচ্ছাকৃত অন্ধ ও বধিরদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেন না। এরপর মানুষের নিজের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে শৈশবের দুর্বলতম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামত পর্যন্ত ধাপে ধাপে অগ্রসর করেন। অতপর কেয়ামতের একটা দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এই সাথেই এই পর্ব শেষ ও সূরার সমাপ্তি হয়েছে। সমাপ্তির সময় রসূল (স.)-কে নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্য অবলম্বন করা, মানুষের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার সহ্য করা। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হবে-একথা বিশ্বাস করা এবং কোনোভাবেই যেন তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হন ও অবিশ্বাসীরা যেন তাকে হীনমন্যতায় আক্রান্ত করতে না পারে-সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুরার সার্বিক পটভূমি ও ভাষা একত্রে মিলিত হয়ে এর প্রধান আলোচ্য বিষয়কে চিহ্নিত ও চিত্রিত করতে সহায়তা করেছে। সেই কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের বিভিন্ন অবস্থা, জীবনের বিভিন্ন ঘটনা মানব জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং প্রাকৃতিক জগতের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত আল্লাহর বিধানের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উদঘাটন। এই সম্পর্ক উদঘাটন করতে গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, এ বিশ্ব জগতের প্রতিটি স্পন্দন ও প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি অবস্থা, প্রতিটি সূচনা ও প্রতিটি সমাপ্তি, প্রতিটি জয় ও প্রতিটি পরাজয়- পরস্পর একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে ও অটুট বন্ধনে আবদ্ধ এবং প্রত্যেকটা একটা সূক্ষ্ম ও নিখুঁত আইন দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। এর সব কিছুরই আদি অন্ত আল্লাহর হাতে। 'প্রথমে ও শেষে সব কিছুই আল্লাহর হাতে।' এই বিষয়টার ওপরই সমগ্র কোরআনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একেই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এই মূলতত্ত্ব থেকেই যাবতীয় ইসলামের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, মূল্যায়ন ও মতাদর্শ আহরিত হয়েছে। এবং এই মূলতত্ত্ব ছাড়া কোন চিন্তাধারা ও কোনো মতাদর্শই নির্ভুল হতে পারে না।

সূরা আর রোম

আয়াত ৬০ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمٓ (১) غُلِبَتِ الرُّوْمُ (২) فِیْٓ اَدْنَی الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ

سَيَغْلِبُوْنَ (৩) فِیْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ

يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ (৪) بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (৫)

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (৬)

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (৭)

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ ۫ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ

لَكٰفِرُوْنَ (৮) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ লা-ম-মী-ম, ২. রোম (জাতি) পরাজিত হয়ে গেছে, ৩. (পরাজিত হয়েছে) ভূমন্ডলের সবচাইতে নিচু অঞ্চলে, তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা (আবার) বিজয় লাভ করবে, ৪. (তিন থেকে নয়- এ) বিজোড় বছরের মাঝেই (এ ঘটনা ঘটবে), এর আগেও (চূড়ান্ত) ক্ষমতা ছিলো আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং (এ ঘটনার) পরেও (সে চাবিকাঠি থাকবে) তাঁরই হাতে; (রোমকদের বিজয়ে) সেদিন ঈমানদার ব্যক্তিরা ভীষণ খুশী হবে, ৫. আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই (এটা ঘটবে), তিনি (যখন) যাকে চান তাকেই (বিজয়ে) সাহায্য দান করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু, ৬. (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালারই ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা (কখনো) তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। ৭. তারা তো পার্থিব জীবনের (শুধু) বাইরের দিকটি (সম্পর্কেই) জানে, কিন্তু আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা (সম্পূর্ণই) গাফেল। ৮. এ মানুষগুলো কি নিজেদের মনে এ কথা চিন্তা করে না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমানসমূহ, যমীন ও অন্য সব কিছু যথাযথভাবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে পয়দা করেছেন; কিন্তু মানুষদের মাঝে অধিকাংশই (এসব কিছুর শেষে) তাদের মালিকের সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করে। ৯. এরা কি (আমার) যমীনে ভ্রমণ করে না এবং তাদের আগের লোকদের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না?

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ

اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ، فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا

السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ

كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

অথচ তারা শক্তিতে এদের চাইতে ছিলো অনেক প্রবল, তারা এ যমীনে অনেক চাষবাস করেছে, (আজ) এরা যেমন একে আবাদ করছে, তাদের চাইতে (বরং) তারা বেশী পরিমাণেই একে আবাদ করেছিলো, (অতপর) তাদের কাছে তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে হাযির হয়েছিলো (কিন্তু তারা রসূলদের মানতে অস্বীকার করায় আমার গযব আবাদ করা সেই শখের যমীন থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলো); আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর (গযব পাঠিয়ে) কোনো যুলুম করেননি, বরং (কুফরী করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ১০. অতপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দই হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপও করেছে!

রুকু ২

১১. আল্লাহ তায়ালা (নিজেই তাঁর) সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, আবার তিনিই তাকে তার (মূলের) দিকে ফিরিয়ে নেন, অতপর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে। ১২. যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন (এর ভয়াবহতা দেখে) অপরাধী ব্যক্তিরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। ১৩. (সেদিন) তাদের শরীকদের কেউই তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো থাকবে না, বরং তারা তাদের এ শরীক করার ঘটনাই (তখন) অস্বীকার করবে। ১৪. যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষরা (ঈমান ও কুফুরের ভিত্তিতে) আলাদা হয়ে পড়বে। ১৫. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং (সাথে সাথে) নেক কাজ করেছে, তারা (জান্নাতের) বাগিচায় থাকবে, তাদের (সেখানে প্রাচুর্যপূর্ণ) মেহমানদারী করা হবে। ১৬. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, (অস্বীকার করেছে) শেষ (বিচারের দিনে আমার) সামনাসামনি হওয়ার ঘটনাকে, তাদের (ভয়াবহ) আযাবের সম্মুখীন করা হবে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

১৭. অতএব (দিবাশেষে) যখন তোমরা সন্ধ্যা করো তখন আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, (ঘোষণা করো) যখন সকাল (বেলার মাধ্যমে দিনের শুরু) করো তখনও। ১৮. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই জন্যে, (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো) যখন তোমরা (দিনের) দ্বিতীয় প্রহর (শুরু) করো, আবার যখন (দিনের) তৃতীয় প্রহর (শুরু) করো (তখনো তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)। ১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবন্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটান, একইভাবে জীবন্ত কিছু থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই (সেই সত্তা, যিনি এ) যমীনকে তার নির্জীব অবস্থার পর পুনরায় জীবন দান করেন; (ঠিক) এভাবেই তোমাদেরও (আবার) পুনরুত্থিত করা হবে।

রুকু ৩

২০. আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে (একটি নিদর্শন) এই যে, (শুরুতে) তিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তোমরা মানুষ হিসেবে যমীনে (সর্বত্র) ছড়িয়ে পড়লে। ২১. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের (মাঝে) এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সংগী সংগিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও (পারস্পরিক) সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ২২. আকাশমালা ও যমীনের সৃষ্টি, তোমাদের পারস্পরিক ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র (নিসন্দেহে) তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে (এক একটি বড়ো নিদর্শন); অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ২৩. তোমাদের রাত ও দিনের ঘুম, তোমাদের তাঁর দেয়া রেযেক তালাশ করাও তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত (একটি); অবশ্য এসব কিছুর মাঝে যে জাতি (আল্লাহর কথা) শোনে তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ

২৪. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে এও একটি যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ (ও তার আলো) দেখান ভয় এবং আশা সঞ্চারের মাঝ দিয়ে (তা প্রতিভাত হয়), তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তা দিয়ে যমীন একবার নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্যে (আল্লাহকে চেনার) অনেক নিদর্শন রয়েছে। ২৫. তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তাঁর আদেশেই আসমান যমীন (নিজ নিজ অবস্থানের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে; (তোমরা এক সময় মাটির ভেতরে চলে যাবে) অতপর যখন তিনি তোমাদের (সে) মাটির (ভেতর) থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ডাক দেবেন, তখন (সে ডাক শোনামাত্রই) তোমরা বেরিয়ে আসবে। ২৬. (এ) আকাশমালা ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে তা তো (একান্তভাবে) তাঁর জন্যেই; সবকিছু তাঁর (আদেশেরই) অনুগত। ২৭. (তিনিই সেই মহান সত্তা) যিনি (গোটা) সৃষ্টি (জগত)-কে প্রথমবার পয়দা করেছেন, অতপর (কেয়ামতের দিন) তাকে আবার আবর্তিত করবেন, সৃষ্টির (প্রক্রিয়ায়) সে (কাজ)-টি তাঁর জন্যে খুবই সহজ; (কেননা) আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তাঁর জন্যেই নির্ধারিত এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকু ৪

২৮. (হে মানুষরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বুঝার) জন্যে তোমাদের (নিত্যদিনের ঘটনা) থেকে উদাহরণ পেশ করছেন; (সে উদাহরণটির জিজ্ঞাস্য হচ্ছে,) আমি তোমাদের যে রেযেক দান করেছি তাতে কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা সমভাবে অংশীদার? (এমন অংশীদার)– যাতে করে তোমরা (এবং তারা) সমান হয়ে যেতে পারো– (বলতে পারো), তোমরা কি তাদের (ব্যাপারে) ততোটুকু ভয় করো, যতোটুকু ভয় নিজেদের ব্যাপারে করো; (বস্তুত) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে (আমার

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٢٨ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝٢٩ فَأَقِمْ وَجْهَكَ

لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٠

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝٣١ مِنَ

الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝٣٢

কথাগুলো) খুলে খুলে বর্ণনা করি। ২৯. কিন্তু যারা সীমালংঘনকারী, তারা অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে রেখেছে, সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে কে হেদায়াতের পথ দেখাতে পারে? এমন সব লোকদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। ৩০. অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে (সঠিক) দ্বীনের ওপর কায়েম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির ওপর (নিজেকে দাঁড় করাও), যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন (মনে রেখো); আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ (সরল) জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না, ৩১. তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী হও এবং শুধু তাঁকেই ভয় করো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত হয়ো না, ৩২. (তাদের মাঝে এমনও আছে) যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফের্কায়ও পরিণত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে মত্ত আছে।

তাফসীর

আয়াত ১-৩২

আসুন, এবার আমরা বিশদভাবে সূরার তাফসীর আলোচনা করি। 'আলিফ-লাম-মীম, নিকটতম ভূমিতেই রোমকরা পরাজিত হলো। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পুনরায় বিজয়ী হবে। .... *(আয়াত ১-৬)*

সূরাটা 'হুরুফে মোকাত্তায়াত' অর্থাৎ কয়েকটা বিচ্ছিন্ন আরবী বর্ণমালা দিয়ে শুরু হয়েছে। এর তাফসীরের আমরা এই মতটাই গ্রহণ করেছি যে, এই কোরআন এই ধরনের কিছু সংখ্যক আরবী বর্ণমালা দিয়েই শুরু হয়েছে, যা আরবদের কাছে সুবিদিত। তথাপি তারা এ ধরনের কোনো পুস্তক রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এই বর্ণমালা দিয়েই তাদের ভাষা তৈরী হয়েছে। কিন্তু এই ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করা তাদের সাধ্যে কুলায়নি।

বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার পরই এসেছে এই অকাট্য সত্য ভবিষ্যদ্বাণী যে, রোমকরা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। ইমাম ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের ওপর বিজয়ী হয়েছিলো। পারসিকরা রোমকদের

ওপর বিজয়ী হোক-এটা আরবের মোশরেকদেরও কাংখিত ছিলো। পক্ষান্তরে মুসলমানরা পছন্দ করতো রোমকরা পারসিকদের ওপর বিজয়ী হোক। কেননা তারা আহলে কেতাব এবং তারা মুসলমানদের ধর্মের নিকটতম। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী নাযিল হলো, তখন তারা হযরত আবু বকরকে বললো, 'ওহে আবু বকর, তোমার সাথী তো বলছে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই নাকি রোম পারস্যের ওপর বিজয়ী হবে।' হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তিনি সত্যই বলেছেন। তারা বললো, এ ব্যাপারে আমরা তোমার সাথে বাজি ধরতে চাই। তুমি রাজী আছ? হযরত আবু বকর (রা.) সম্মতি দিলেন এবং তারা বাজি ধরলো যে, সাত বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হলে হযরত আবু বকর মোশরেকদেরকে ৪টা উট এবং বিজয়ী হলে মোশরেকরা ৪টা উট দেবে। এরপর সাত বছর কেটে গেলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। এতে মোশরেকরা আনন্দিত হলো। আর মুসলমানরা বিব্রত বোধ করতে লাগলো। কেউ কেউ গিয়ে ব্যাপারটা রসূল (স.)-এর কাছে উল্লেখ করলো। রসূল (স.) বললেন, তোমরা 'বেদয়ে সিনীন' (কয়েক বছর) বলতে কী বোঝ? তারা বললো, দশের কম। রসূল (স.) বললেন, 'তাহলে যাও, উটের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দাও।' এরপর দু'বছর অতিবাহিত না হতেই ঘোড় সওয়ার সৈনিকরা এসে পারস্যের ওপর রোমের বিজয়ের খবর জানালো। এতে মুসলমানরা খুশী হলো।

এই ঘটনা সম্পর্কে অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে আমি তন্মধ্যে থেকে ইমাম ইবনে জরীরের বর্ণনাটা গ্রহণ করেছি। এই ঘটনার পর যে সব উপদেশ এই সূরায় বিবৃত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে এই ঘটনার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরতে চাই।

প্রথম শিক্ষা এই যে, তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াতের বিপরীতে শেরেক ও কুফরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সকল যুগে ও সকল স্থানেই সক্রিয় থাকে। যদিও তৎকালে দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক বর্তমান কালের মত ঘনিষ্ঠ ও জোরদার ছিলো না, তথাপি মক্কার মোশরেকরা অনুভব করতো যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আসমানী কেতাবধারীদের ওপর পৌত্তিলিকদের বিজয় তাদেরই বিজয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও অনুভব করতো যে, আসমানী কেতাবধারী ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। পৌত্তলিকরা পৃথিবীর কোথাও জয়লাভ করুক-এটা তারা পছন্দ করতো না। তারা উপলব্ধি করতো নিয়ে, তাদের চারপাশে পৃথিবীর যেখানে যা কিছুই ঘটছে, তা থেকে তারা ও তাদের আন্দোলন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং তা ঈমান ও কুফরের বিরোধকে কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করে।

কিন্তু আমাদের যুগের অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা সম্পর্কে উদাসীন। রসূল (স.)-এর যুগের মুসলমান ও পৌত্তলিকদের মত তাদের অনুভূতি এ বিষয়ে তেমন তীব্র নয়। বিগত চৌদ্দ শতাব্দী ধরেই এই পরিস্থিতি চলে আসছে। তাই তারা ভৌগোলিক ও বংশগত গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা বুঝতে পারে না যে, বিরোধটা মূলত ঈমান ও কুফরের বিরোধ এবং সংঘাত-সংঘর্ষ যা কিছুই ঘটে, তা প্রকৃতপক্ষে 'হেযবুল্লাহ' (আল্লাহর দল) এবং 'যেহবুশ শয়তান' (শয়তানের দল) এর সংঘাত-সংঘর্ষ।

সারা পৃথিবীর মুসলমানদের আজ এই সংঘাতের প্রকৃতি ও এই বিরোধের স্বরূপ উপলব্ধি করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এসেছে। কাফের ও পৌত্তলিক শক্তিগুলো ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে এসব বিরোধ লড়াই এর যতরকম নামই দিক, তাতে মুসলমানদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা বিরোধের যতো কারণ বা উপলক্ষ থাক না কেন, অমুসলিমরা মুসলমানদের সাথে একমাত্র আকীদা বিশ্বাস নিয়েই লড়াই করে থাকে।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো, আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস থাকতে হবে। হযরত আবু বকরের দ্বিধাহীন উক্তিতে এই অবিচল বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। মোশরেকেরা যখন রসর (স.)-এর কথা শুনে তার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করলো, তখন তিনি নিসংকোচে বললেন, 'তিনি সত্য বলেছেন।' তারা বাজি ধরলে তিনিও বাজি ধরলেন পূর্ণ আস্থার সাথে। এরপর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পূর্ণ হলো। মুসলমানদের সামনে যতো বিদপ মুসিবতই আসুক না কেন এমন চমকপ্রদ পন্থায় এরূপ পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক আস্থা প্রকাশের কারণেই তাদের আস্থা, মনোবল ও শক্তি সব সময় অটুট থেকেছে। ফরে শেষ পর্যন্ত তাদের সাফল্য এসেছে এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা যখনই এবং যে দেশেই যতো দীর্ঘ ও কষ্টকর জেহাদ-সংগ্রামে লিপ্ত হোক না কেন, আল্লাহর এই ওয়াদা তাদের বেলায়ও কার্যকর থাকবে।

তৃতীয় শিক্ষাটা হলো, সকল ঘটনা-দুর্ঘটনায় শেষ ফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, জয়-পরাজয়, কোনো দেশের স্বাধীনতা লাভ বা স্বাধীনতা হারানো,শক্তিশালী হওয়া বা দুর্বল হওয়া-সবই এ বিশ্বজগতের অন্য সকল ঘটনা ও অবস্থার মতই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন এবং নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারেই করেন। সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছার প্রতীক। তাঁর এই স্বাধীন ইচ্ছার ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন ঘটনার পশ্চাতে কোনো মঙ্গল-চিন্তা এবং কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এবং কোনো ঘটনার কারণ ও উৎস কি, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। সুতরাং সকল অবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর ফয়সালার সামনে সর্বাত্মক নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণই মানুষের একমাত্র ও সর্বশেষ করণীয় কাজ।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মৌলিক দৃষ্টিভংগি

'আলিফ-লাম-মীম .... (আয়াত ১-৫)

প্রথমে ও পরে সব কিছুর ফয়সালা মূলত আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান বিজয়ী করেন। তার ইচ্ছাকে শৃংখলিত করার ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহর যে ইচ্ছা কোনো ঘটনার নির্দিষ্ট ফলাফল আকাংখা করে, সে ইচ্ছাই ঘটনার কারণ সংঘটিত করে। কাজেই বিজয়কে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করা ও তার বাস্তব কারণ পাওয়ার ভেতরে কোনো বিরোধ নেই, যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি অনুসারে এই বিশ্বজগত পরিচালিত হয়, তা আল্লাহর সর্বময় স্বাধীন ইচ্ছা থেকেই উদ্ভূত। আল্লাহর এই সর্বময় স্বাধীন ইচ্ছার কাজ ছিলো বিশ্ব প্রকৃতির জন্যে কতকগুলো অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নীতি এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা, আর জয় পরাজয় এমনি দুটো অবস্থা। যা আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা কর্তৃক মনোনীত প্রাকৃতিক নীতিমালা অনুসারেই আবির্ভূত হয়।

এ ব্যাপারে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত। এই আকীদা বিশ্বাসের মূল কথা এই যে, সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ঘটে থাকে। তবে তার অর্থ এটা নয় যে, মানুষকে সেসব স্বাভাবিক উপায় উপকরণ অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, যা তার চেষ্টা সাধনার ফলাফল বাস্তব জগতে প্রকাশ করে দিয়ে থাকে।

অবশ্য সেসব ফলাফল কার্যত প্রকাশ পাওয়া বা না পাওয়া মানুষের দায় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা চূড়ান্ত পর্যায়ে এর পরিণতি আল্লাহর হাতে সোপর্দ রয়েছে। জনৈক বেদুঈন মসজিদে নববীর দরজার কাছে তার উষ্ট্রীটা ছেড়ে রেখে রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করতে গেলো এবং বললো, 'উষ্ট্রীর ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম।' রসূল (স.) বললেন, 'আগে ওটাকে বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।' (তিরমিযী)

সুতরাং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের আলোকে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার আগে স্বাভাবিক উপায় উপকরণ অবলম্বন করা অপরিহার্য। এ কাজটা করার পরই সব কিছু আল্লাহর হাতে সোপর্দ করতে হয়।

'তিনি যাকে চান বিজয়ী করেন, তিনিই মহাশক্তিশালী ও দয়ালু।'

অর্থাৎ এই বিজয় মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর দয়ার ফলেই মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তব রূপ লাভ করে থাকে। আর এভাবে তা বিজয়ী ও পরাজিত– উভয় দলের জন্যে রহমতে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা যদি এক দল মানুষকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তা হলে পৃথিবী অশান্তিময় হয়ে যেতো।' বস্তুত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৃথিবীর শান্তি ও কল্যাণ, বিজয়ী ও পরাজিত উভয়ের জন্যে কল্যাণকর। 'এ হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদার খেলাপ করেন না .... '

অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয় সূচিত হবে– এটা আল্লাহর ওয়াদা, যা বাস্তবায়িত না হয়ে পারে না।

'তিনি নিজের ওয়াদার খেলাপ করেন না।'

অর্থাৎ তাঁর ওয়াদা যেহেতু তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে এবং তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞার আলোকেই হয়েছে, তাই তিনি তার বাস্তবায়নে সক্ষম, কেউ তাতে তাঁকে বাধা দিতে পারে না এবং মহাবিশ্বে তিনি যা চান তা ছাড়া আর কিছুই সংঘটিত হয় না।

এই ওয়াদা পালিত হওয়া আল্লাহর অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মেরই একটা অংশ। 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' অর্থাৎ যদিও মনে হয় তারা খুবই জ্ঞানী এবং অনেক কিছুই জানে, কিন্তু তারা আসলে অত্যন্ত স্থূল ও ভাসা ভাসা জ্ঞানের অধিকারী। পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অংশটাই শুধু জানে, কিন্তু পৃথিবীর চিরস্থায়ী ও প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক বিধান জানে না, আর বাহ্যিক অংশের অন্তরালে কী আছে, তাও তারা জানে না।

পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অংশটা আসলে খুবই ক্ষুদ্র ও সীমিত, যদিও তা সাধারণ মানুষের চোখে বিরাট ও বিশাল মনে হয়। মানুষ স্বীয় চেষ্টা-সাধনা দ্বারা পার্থিব জীবনের একটা অংশমাত্র জয় করতে পারে, সম্পূর্ণটা পারে না। কেননা তার জীবনই সীমিত, আর সমগ্র জীবজগতই গোটা সৃষ্টি জগতের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। এই সৃষ্টিজগতে আল্লাহর যে প্রাকৃতিক নীতিমালা ও বিধান কার্যকর রয়েছে। সেগুলোই এই জীব জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে।

যে ব্যক্তি এই সৃষ্টি জগতের রীতি-নীতি ও প্রাকৃতিক বিধান মন দিয়ে উপলব্ধি করে না এবং চেতনা দিয়ে অনুভব করে না, সে প্রকৃতির দিকে এমনভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে যেন দেখতেই পায় না। সে শুধু সৃষ্টির বাহ্যিক আকৃতি ও গতিবিধিই দেখে, এর নিগূঢ় রহস্য ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে না। অধিকাংশ মানুষই এ রকম। কেননা একমাত্র খাঁটি ও বিশুদ্ধ ঈমানই বাহ্যিক জীবনকে সৃষ্টি রহস্যের সাথে একাত্ম ও একীভূত করে। আর এই ঈমানই মানবীয় জ্ঞানকে সৃষ্টি রহস্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করে। অথচ এ ধরনের বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী মোমেনদের সংখ্যা খুবই অল্প। তাই অধিকাংশ মোমেন প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়।

'আর তারা আখেরাত সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন।'

কেননা আখেরাতও সৃষ্টিরই একটা ধারাবাহিকতা এবং এর অসংখ্য স্তরের মধ্য থেকে একটা অন্যতম স্তর। যারা সৃষ্টির রহস্য ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা আখেরাত সম্পর্কেও অজ্ঞ উদাসীন। আখেরাতের প্রকৃত গুরুত্ব তারা অনুধাবন করে না। তারা বোঝে না যে, আখেরাত জীবনেরই একটা অংশ এবং তার আগমন অবধারিত। আখেরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের যাবতীয়

মানদন্ড ও মূল্যবোধই এলোমেলো করে দেয়। জীবন, জীবনের ঘটনাবলী ও মূল্যবোধগুলোর সঠিক মূল্যায়ন এবং এগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। জীবন সম্পর্কে তাদের জ্ঞানও হয়ে থাকে স্থুল অসম্পূর্ণ। কেননা মানুষের বিবেক বুদ্ধি আখেরাত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে তার ধারণা বদলে দেয়। পৃথিবীতে সে যে জীবন যাপন করে, তা মহাবিশ্বে তার দীর্ঘ সফরের একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায় মাত্র। এই পৃথিবীতে জীবনের যে অংশটুকু সে কাটায়, তা তার বিশাল জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশ। আর এই পৃথিবীতে যে ঘটনাবলী ঘটে এবং যেসব অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বিশাল গ্রন্থের একটা ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ মাত্র, বড় ও দীর্ঘ সফরের একটা সংক্ষিপ্ত স্তর। এতো বড় জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশ এবং এতো বড় গ্রন্থের একটা ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের উচিত নয়।

এ কারণেই যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে ও সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করে, সে এমন কোনো ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক রাখতে সক্ষম হয় না, যে শুধু ইহকালের জন্যেই বেঁচে থাকে এবং পরকালের কোনো কিছুতে আস্থা রাখে না। পার্থিব জীবনের কোনো ব্যাপারেই এই দু'ব্যক্তির বিচার-বিবেচনা, ধ্যান ধারণা, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত এক রকম হয় না। উভয়ের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভংগি, পৃথক পৃথক মানদন্ড ও ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ হয়ে থাকে এবং তার আলোকে উভয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা ও পরিস্থিতির ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন করে থাকে। একজন শুধু পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটাই দেখে আর অপরজন বাহ্যিক আকৃতির আড়ালে যে যোগসূত্র, যে রীতিনীতি, গোপন ও প্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্য, দুনিয়া ও আখেরাত, জীবন ও মৃত্যু, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত, মানবজগত এবং জীব-জড় নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বজগত সম্পর্ক যে নিয়ম ও বিধান রয়েছে তা জানে ও বোঝে। এই সর্বব্যাপী, সর্বোচ্চ ও বিশালতম জগতের দিকেই ইসলাম মানুষকে নিয়ে যায় এবং এখানে তাকে তার উপযুক্ত সম্মানের আসনে বসায়। তার আসন পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধির আসন। তার সত্ত্বায় আল্লাহর রূহের যে প্রভাব ও প্রেরণা সক্রিয় রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই সে খলীফার আসনে সমাসীন।

আর যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিজয়ের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সেই বৃহত্তম সত্যের সাথে যুক্ত যার ওপর এই সৃষ্টি জগত প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু আখেরাতের ব্যাপারটাও এই মহাসত্যের সাথে যুক্ত, সেহেতু পরবর্তী আয়াতে এই বিশ্বজগতের প্রতি আরেকবার মানুষের পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মানুষকে আরো একবার আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং তার নিজের সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যাতে সে সেই বৃহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করে। কেননা তারা আখেরাত ও রসূল প্রদত্ত দাওয়াতের প্রতি যখন উদাসীন হয়, তখন এই মহাসত্যকেও অবজ্ঞা অবহেলা করে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা কি তাদের নিজেদের সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না ....' (আয়াত -৮)

অর্থাৎ তারা স্বয়ং এবং তাদের চারপাশের অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টি যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এই বিশ্বজগত প্রাকৃতিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবহমানকাল ধরে তা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে চলছে। কখনো তাতে কোনো গোলযোগ ঘটে না। কখনো তার নিয়মে পরিবর্তন আসে না। কখনো তার আগমন নির্গমনের সময় পিছিয়ে যায় না। কখনো একটার সাথে অন্যটার সংঘর্ষ হয় না। সব সময় সূক্ষ্মভাবে, সঠিকভাবে ও পরিকল্পিতভাবে তার ব্যবস্থা চলে। বিশ্বজগত যে মহাসত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও চলছে, তার স্বাভাবিক দাবী

এই যে, পরবর্তী এমন একটা জগত ও জীবন থাকা অপরিহার্য, যেখানে কর্মফল দেয়া হবে এবং সৎ ও অসৎ কাজের পূর্ণ ফল বা প্রতিদান পাওয়া যাবে। বস্তুত এ বিশ্বের প্রতিটা জিনিসের সুনির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে, প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল সুপরিকল্পিত ও মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে সব কিছুই নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে। এক মুহূর্তও আগে বা পিছে ঘটে না। আর মানুষ যদি নাও জানে কবে কেয়ামত হবে, তবু তার অর্থ এ নয় যে, কেয়ামত কখনো হবে না।

যারা দুনিয়ার বাহ্যিক দিক সম্পর্কেই শুধু জানে এবং তা নিয়েই বিভোর থাকে, কেয়ামতের ও আখেরাতের অনির্দিষ্টতা তাদের প্রতারিত করে এবং তারা মনে করে, তাদের কখনো আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে না।

উপরোক্ত আয়াতে (৮ নং) আকাশ, পৃথিবী ও এই দু'য়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মহাবিশ্ব, তার ভেতরকার রকমারি সৃষ্টি, বস্তু ও প্রাণী, আকাশ ও জ্যোতিষ্কমন্ডলী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ, বড় ও ছোট, গোপন ও প্রকাশ্য এবং জানা অজানা অসংখ্য সৃষ্টি এ পর্যবেক্ষণের আওতায় এসে যায়। এই ব্যাপকতা পর্যবেক্ষণের পর পরবর্তী আয়াতে (৯ নং) ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এসব অধ্যায়ে আল্লাহর চিরাচরিত প্রাকৃতিক বিধানের কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই বিধান কখনো একবারের জন্যেও নিষ্ক্রিয় হয় না, কার্যকারিতার সময় পিছিয়ে যায় না কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হয় না।

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে তো দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণতি হয়েছিলো ....' (আয়াত ৯ ও ১০)

অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে এ আয়াতে। তারা তো অতীতের অন্যান্য মানুষের মতোই। তাদের পরিণতি থেকেই জানা যায় তাদের উত্তরাধিকারীদের পরিণাম কী হতে পারে। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এ বিধান একটা চিরস্থায়ী সত্য এবং এর ওপরই মহাবিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ সত্য মানব জাতির কোনো বিশেষ প্রজন্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না, কিংবা কারো প্রতি অযথা এমন ভাবাবেগও প্রদর্শন করে না যা স্বতই পরিবর্তনশীল। সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের এমন কোনো পক্ষপাতদুষ্ট বা বৈষম্যমূলক আচরণ করার কথা কল্পনাও করা যায় না।

এ দুটো আয়াতে পার্থিব জীবনের প্রকৃত স্বরূপ, যুগ যুগ ধরে তার সাথে সংযুক্ত অন্যান্য বিষয় এবং সর্বকালের মানুষের উৎস ও পরিণতি যে একই হয়ে থাকে, সে কথা উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির কোনো প্রজন্ম যেন নিজের জীবন, ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে একপেশে বিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ না করে এবং এ কথা ভুলে না যায় যে, মানব জাতির সকল প্রজন্মের সাথে তার সংযোগ সম্পর্ক রয়েছে, এই সকল মানব প্রজন্মগুলোর ভাগ্য যে প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে নির্ধারিত হয়, সেই প্রাকৃতিক বিধান এক ও অভিন্ন এবং সকল প্রজন্মের জীবনে কার্যকর স্থায়ী মূল্যবোধগুলোও এক অভিন্ন।

'এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো রসূল (স.)-এর সময়কার মোশরেকদের পূর্বে মক্কায় বসবাস করতো। 'তারা ওদের চেয়েও শক্তিশালী ছিলো', 'আর তারা যমীন চাষ করতো।' অর্থাৎ যমীন চাষ করে তার ভেতর থেকে সম্পদ আহরণ করতো। 'তারা পৃথিবীকে ওদের চেয়ে বেশী গড়েছিলো।' অর্থাৎ আরবদের চেয়েও তারা অধিকতর সভ্য ছিলো এবং তাদের চেয়েও বেশী গঠনমূলক কাজ করতে সক্ষম ছিলো। এর পর তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট

রইলো এবং আখেরাত সম্পর্কে জানতে চাইলো না। 'তাদের কাছে রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলো।' অর্থাৎ তারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন গ্রাহ্য করলো না এবং ঈমানও আনলো না। ফলে তাদের বিবেক সেই আলোর অধিকারী হলো না, যা দিয়ে সঠিক পথ দেখা ও চেনা যায়। তাই আল্লাহ তায়ালা নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর যে শাশ্বত বিধান কার্যকরি হয়ে থাকে, তাদের ওপরও তাই হলো। তাদের এতো শক্তি ও সহায় সম্পদ কোনো কাজে লাগলো না, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সবই বিফলে গেলো। তারা তাদের আচরণের সমুচিত ফল পেলো, 'তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা কোনো অত্যাচার করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিলো।' 'অতপর অসৎ কর্মকারীদের পরিণাম হলো খুবই খারাপ।'...... এই খারাপ পরিণাম অসৎ কর্মকারীদের সমুচিত ও সুযোগ্য শাস্তি। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতগুলো অমান্য করেছে এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করেছে।

আল্লাহর আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যানকারী ও আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনাকারীদের পৃথিবীর নানা জায়গায় ভ্রমণ করার জন্যে কোরআন আহ্বান জানায়, যাতে তারা নিজ নিজ স্থানে কচ্ছপের মতো অবরুদ্ধ হয়ে না যায় এবং পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম দেখে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর নীতি ও বিধান এক, তিনি কাউকে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব দেখান না। কোরআন এ আহ্বান জানায় এ জন্যে, যেন তারা বুঝতে পারে যে, মানব জাতি জন্মগতভাবে এক জাতি, আল্লাহর নবীদের দাওয়াত চিরকাল এক ও অভিন্ন এবং মানব জাতির সকল প্রজন্মের একই পরিণতি। এই চিন্তাধারাই ইসলাম মুসলমানদের বিবেকে বদ্ধমূল করে দিতে চায় এবং কোরআন এ বিষয়ে বার বার আহ্বান জানায়।

বিশ্বজগত ও বিশ্ব ইতিহাস পর্যবেক্ষণের এই দুটো আহ্বান জানানোর পর মানুষকে সেই মূল তত্ত্বের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, যা সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন। সেই মূলতত্ত্ব হলো আখেরাত বা পরকাল। এটা হলো মহাবিশ্ব যে মহাসত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তারই একটা অংশ।

'আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সূচনা করেন, পুনরায় তার পুনরাবৃত্তি করেন, পুনরায় তোমরা তার দিকে ফিরে যাবে।' ..... এটা একটা সহজ সরল তত্ত্ব। এর উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ বা সমন্বয়ও সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা প্রথম বারের সৃষ্টির মতোই। এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। এ দুটো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়। আল্লাহই প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং দ্বিতীয় বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন। প্রথম সৃষ্টির উদ্দেশ্য বান্দাদের শিক্ষা দেয়া ও লালন পালন করা, আর দ্বিতীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য বান্দাদের কর্মফল দান।

পরকালের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে কেয়ামতের মাঠে একত্রিত হবার পর কাফের ও মোমেনদের শেষ পরিণতি দেখানো হয়েছে এবং শরীক গ্রহণ ও মোশরেকদের ধ্যান ধারণা যে কত হাস্যকর, কলংকজনক তা তুলে ধরা হয়েছে।

'যেদিন কেয়ামত হবে, অপরাধীরা হতাশ হবে ....।' (আয়াত ১২-১৬)

এই সেই কেয়ামত, যার কথা অনেকেই ভুলে থাকে। আবার অনেকে অস্বীকারও করে। অথচ তা একদিন সংঘটিত হবেই। অপরাধীরা সেদিন হতভম্ব ও হতাশ হয়ে যাবে। মুক্তির কোনো আশা তাদের থাকবে না। পৃথিবীতে যাদের তারা সুপারিশকারী মনে করতো, তারাও কিছু করবে না। ফলে তারা নিরুপায় হয়ে যাবে। কেউ তাদের উদ্ধারকারী থাকবে না। যাদেরকে তারা পৃথিবীতে উপাসনা করতো এবং বিশ্ব প্রভুর সাথে যাদের শরীক করতো, তাদের সেদিন অস্বীকার করবে।

সেদিন মোমেন ও কাফেরদের পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তারা বাগানে আনন্দে মেতে থাকবে।' সেখানে কেবল সুখ, শান্তি ও আনন্দের সামগ্রীই পাবে।

পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলো ও আখেরাতের সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছে, তাদের আযাবে উপস্থিত করা হবে।' ওটাই চূড়ান্ত ফলাফল সৎকর্মশীল ও অসৎ কর্মশীলদের জন্যে।

জীবনের বাঁকে বাঁকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন

এবার কেয়ামতের সেই দৃশ্য থেকে ও আখেরাত থেকে পুনরায় ফিরে আসা হচ্ছে ইহকালীন জীবনে, ইহকালীন দৃশ্যাবলীতে, বিচিত্র সৃষ্টি ও মানব সত্ত্বার রহস্য প্রসংগে, অলৌকিক ঘটনাবলীতে ও অলৌকিক সৃষ্টিতে। এ অধ্যায়টা শুরু হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান দিয়ে।

'মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো সকালে ও সন্ধ্যায়।' .... (আয়াত ১৭-২৭)

এ আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মনোজ্ঞ, গভীর, সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী, যা মানুষের মনকে সকাল সন্ধ্যা, আসমান যমীন ও দুপুর সন্ধ্যার দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে, জীবন-মৃত্যু ও সৃষ্টি-প্রলয় সংক্রান্ত চিরাচরিত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করতে এবং তা নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। অতপর মানুষের প্রথম সৃষ্টি, তার স্বভাবগত আকর্ষণ ও অনুরাগ, শক্তি ও দাম্পত্য সম্পর্ক বন্ধন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার আহ্বান জানায়। অতপর আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী, ভাষার বৈচিত্র্য, পরিবেশ ও স্থানের বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিন্তা করতে আহ্বান জানায় মানুষের শ্রম, বিশ্রাম, ঘুম ও জাগরণ, বজ্র, লোভ, ভীতি এবং জীবন ও সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে। এই চমকপ্রদ আলোচনার শেষ পর্যায়ে মানুষের মন মগযে এ কথা বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, আল্লাহর নির্দেশেই হয়, আকাশ ও পৃথিবীর সবাই মহান আল্লাহর অনুগত থাকে। সবার শেষে এই সহজ সত্যটা তুলে ধরে যে, আল্লাহ তায়ালাই প্রথম স্রষ্টা ও পুনঃস্রষ্টা। পুনসৃষ্টিই তাঁর কাছেঁ অধিকতর সহজ কাজ। আর আকাশ ও পৃথিবীতে সবচেয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত আল্লাহরই।

'অতএব, সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো। দুপুরে ও রাতে, আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই জন্যে প্রশংসা।' (আয়াত ১২, ১৩)

পূর্ববর্তী প্যারায় কেয়ামতের যে দৃশ্যটা তুলে ধরা হয়েছে, তার উপসংহার হিসেবেই এখানে এই তাসবীহ ও হাম্‌দ এসেছে। মোমেনদের বাগানে আমোদ ফুর্তি করা, কাফেরদের মহা আযাবে পতিত হওয়া, আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যের এই পর্যালোচনা, আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টির বিবরণে সব কিছুরই উক্ত দৃশ্য ও ভূমিকার সাথে পূর্ণ সমন্বয় বিদ্যমান।

এখানে আয়াতে হাম্‌দ ও তাসবীহকে সময়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা, দুপুর ও রাতের সাথে। অনুরূপভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সাথেও যুক্ত করা হয়েছে। স্থান ও কালকে গুটিয়ে এনে মানুষের মনকে সর্বত্র ও সকল সময় আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আর সৃষ্টিজগতের অবকাঠামো, মহাকাশের গতিবিধি, দিনরাত ও সকাল সন্ধ্যার আবর্তনের সাথে মহান স্রষ্টার সম্পর্কের ব্যাপারেও এ আলোচনা পাঠককে সচেতন করে তোলে। এ কারণে মানুষের মন উন্মুক্ত, জাগ্রত, সচেতন ও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। আর তার চারপাশের যাবতীয় জিনিস এবং সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি তাকে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাকে তার ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার ঘনিষ্ঠ বানিয়ে দেয়।

'তিনি জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে নির্গত করেন এবং পৃথিবী নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।' এ হচ্ছে প্রকৃতির সেই নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীর সর্বত্র, মহাশূন্যের প্রতিটি স্তরে ও সাগরের গভীরতম প্রকোষ্ঠে সারাদিন ও সারা রাত চালু রয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে এই বিবর্তন চলতে থাকে। এটাকে শুধু বিবর্তন না বলে বলা উচিত অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু দীর্ঘ পরিচিতি ও বার বার সংঘটিত হওয়ার কারণে এগুলোকে আমরা গুরুত্ব দেই না। প্রতি মুহূর্তেই মৃত থেকে একটা জীবিত এবং জীবিত থেকে একটা মৃত নির্গত হয়। আর প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো নিশ্চল জিনিস কোনো বীজের ভেতর থেকে সচল হয়ে ওঠে। এ সময় ওই বীজটা ফেটে যায় এবং তা নতুন সজীব গাছ জন্মানোর জন্যে এগিয়ে যায়। আবার প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো গাছের আয়ু ফুরিয়ে যায় এবং তা শুকিয়ে জ্বালানী কাঠে পরিণত হয়। এই জ্বালানী কাঠের ভেতর থেকেই উদ্ভব ঘটে সেই নতুন বীজের, যা নতুন সজীব উদ্ভিদ জন্ম দিতে প্রস্তুত থাকে। এর ভেতর থেকে গ্যাসও পাওয়া যায়, যা শূন্যে চলাচল করে, অথবা যা থেকে মাটি খাদ্য ও পুষ্টি আহরণ করে এবং উর্বর হয়। প্রতি মুহূর্তে জীবন নিশব্দে যাতায়াত করে থাকে কোনো মানুষ, পশু বা পাখির ভ্রূণে। আর যে মৃতদেহ মাটিতে পচে গলে মিশে যায় এবং মাটিতে গ্যাস সঞ্চালিত করে, তা জীবনের নতুন উপাদানরূপে গড়ে ওঠে এবং উদ্ভিদের জন্যে, অতপর পশু ও মানুষের জন্যে নতুন খাদ্যে পর্যবসিত হয়। এই ধরনের প্রক্রিয়া সমুদ্রতলে ও মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরেও চলতে থাকে।

এটা একটা বিস্ময়কর ও চিরন্তন প্রক্রিয়া। সচেতন স্নায়ুতন্ত্রী ও জাগ্রত বিবেক নিয়ে যদি কেউ এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং কোরআনের পথনির্দেশ নিয়ে ও আল্লাহর আলোকে আলোকিত হয়ে এটা দেখে, তাহলে সে এ থেকে বহু মূল্যবান শিক্ষা পাবে।

'এভাবেই তোমাদের বের করা হবে।'

অর্থাৎ কেয়ামতের প্রাক্কালে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বাস্তব। প্রকৃতিতে দিনে ও রাতে সর্বত্র যেসব ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে, তা থেকে এটা নতুন কিছু নয়।

'আল্লাহ তায়ালা যে তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, ... এটা তার একটা নিদর্শন।'

মাটি একটা নিশ্চল নিথর জড় পদার্থ। অথচ এই পদার্থ থেকেই আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদামাটি থেকে।'

এ থেকে জানা গেলো, কাদামাটিই মানুষের দূরবর্তী উৎস, এখানে এই উৎস উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এর পর পরই তাকে চলন্ত মানুষ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শুধু এটা দেখানো যে, নিশ্চল জড় পদার্থ মাটি ও জীবন্ত চলন্ত মানুষের মাঝে কতো ব্যবধান। তথাপি এই মাটিই এই মানুষের সৃষ্টির মূল উপাদান। এই উক্তির পর 'জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। এই কথাটা বলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এটাই কোরআনের বিশেষ উপস্থাপন পদ্ধতি।

এই অলৌকিক ব্যাপার স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের অন্যতম নিদর্শন এবং মানুষ ও তার আবাসস্থল পৃথিবীর মাঝে গভীর সম্পর্কের ইংগিত। এখানে এসে মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান এবং এর নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক বিধান উভয়ে একত্রিত হয়।

নিশ্চল পদার্থ মাটির আকৃতি থেকে মর্যাদাবান চলন্ত মানুষের আকৃতিতে রূপান্তর এক অকল্পনীয় বিরাট ঘটনা। এটা মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিবেককে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানে অনুপ্রাণিত করে এবং তার মনকে মহান স্রষ্টার গৌরব বর্ণনায় উদ্দীপিত করে।

মানুষের প্রথম সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর এবার মানুষের দুই জাতি সৃষ্টির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে,

'এটাও তার অন্যতম দৃষ্টান্ত যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের ভেতর থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন ....'

মানুষ বিপরীত লিংগের প্রতি কি রকম আবেগপ্রবণ, তা সুবিদিত। উভয় লিংগের মধ্যে বিরাজমান এই সম্পর্কই তাদের অনুভূতিকে সক্রিয় করে তোলে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যকার রকমারি তৎপরতা সংগঠিত করে, কিন্তু মানুষ খুব কমই এ কথা স্মরণ করে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের পরস্পরের জোড়া ও পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের হৃদয়ে এই সব আবেগ অনুভূতি সঞ্চিত করে রেখেছেন এবং উভয়ের মধ্যকার এই সম্পর্কের মধ্যে উভয়ের প্রবৃত্তি ও স্নায়ুতন্ত্রীর পরিতৃপ্তি, দেহ ও মনের শান্তি, জীবন ও জীবিকার স্থিতি, আত্মা ও অন্তরের সম্প্রীতি এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রশান্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

কোরআনের চমকপ্রদ বর্ণনাভংগি, এই সম্পর্কটাকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ রূপ দিয়ে চিত্রিত করেছে, যেন তোমরা তোমাদের জোড়ার কাছে অবস্থান করতে পারো এবং 'তোমাদের মাঝে মমত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করেছেন,' এই কথা দুটো যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে উচ্চারিত করা হয়েছে।

'নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়কে পরস্পরের অনুকূল উপযোগী ও পরস্পরের স্বাভাবিক মানসিক, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পূরণকারী হিসেবে বানানোতে স্রষ্টার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা তারা উপলব্ধি করবে। এতে মানুষ শান্তি, স্থিতি ও তৃপ্তি লাভ করবে। বিশেষত নরনারী তাদের মিলনের ফলে পরস্পরের কাছে থেকে লাভ করে অনাবিল সুখ, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। আর উভয়ে হয়ে দাঁড়ায় উভয়ের পরিপূরক। কেননা উভয়ের দৈহিক ও মানসিক গঠন এমন যে, একজনের ভেতর রয়েছে অপরজনের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার ব্যবস্থা। উভয়ের মিলনে চূড়ান্ত পর্যায়ে আগমন ঘটে নতুন জীবনের, নতুন প্রজন্মের।

'আল্লাহর আরো নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা ....'

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি যে একটা নিদর্শন, সে কথা কোরআনে বহুবার বলা হয়েছে। আমরা এ ধরনের বক্তব্যের ওপর দিয়ে দ্রুত চলে যাই এবং তা নিয়ে দীর্ঘ সময় চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন বোধ করি না। অথচ এ জাতীয় বক্তব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির অর্থ হলো, এই বিশাল ও প্রকান্ড স্থাপনা দুটোর প্রতিষ্ঠা, যাদের সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। আকাশ বলতে অনেকগুলো সৃষ্টির সমাবেশ বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন, আকাশ, কক্ষপথ, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, ছায়াপথ ইত্যাদি। এ সব বস্তুর ভেতরে আমাদের এই পৃথিবী একটা নগণ্য বিন্দুর চেয়ে বেশী কিছু নয় এবং হয়তো এর কোনো ভারত্ব বা ছায়াও নেই। মহাকাশের এসব বস্তু আকৃতিতে এতো বিশাল ও প্রকান্ড হওয়া সত্তেও এগুলোর অবস্থানে, কক্ষপথ প্রদক্ষিণে ও চলাচলে চমৎকার ভারসাম্য এবং সমন্বয় বহাল রয়েছে। এগুলোর পরস্পরের মাঝে এতো বিশাল দুরত্ব ও ব্যবধান রাখা হয়েছে যে, কোনো রকমের সংঘর্ষ, গোলযোগ, বিশৃংখলা ও ওলট-পালট হওয়ার কোনোই আশংকা নেই। এখানে সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখা হয়েছে।

এতো গেলো মহাকাশের জ্যোতিষ্কমন্ডলী ও অন্যান্য বস্তুর সাধারণ আকৃতি এবং এগুলোর মাঝে বিদ্যমান শৃংখলার কথা। এ সব বিশাল বিশাল বস্তু বা জ্যোতিষ্কের অন্তর্নিহিত রহস্য, স্বভাব প্রকৃতি, গোপন ও প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? যেসব প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় সেগুলো কী কী? এ সব প্রশ্নের জবাব মানুষ এখন পর্যন্ত খুব কমই উদ্ধার করতে পেরেছে। এমনকি যে গ্রহটার ওপর মানুষ বসবাস করছে, তার সম্পর্কেও সে খুবই কম তথ্য জানতে পেরেছে।

এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সেই নিদর্শনাবলী নিয়ে সংক্ষিপ্ত কটা কথা বললাম, যা নিয়ে আমরা সাধারণত চিন্তা ভাবনা করি না এবং এগুলোর কাছ দিয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই। অথচ বিজ্ঞানী ও মনীষীদের তৈরী করা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা যন্ত্র নিয়ে আমরা সুদীর্ঘ চিন্তা গবেষণা চালাতে অভ্যস্ত। এ ধরনের একটা ক্ষুদ্র যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তারা অত্যন্ত যত্নের সাথে সমন্বয় রক্ষা করেন, যাতে অন্তত কিছুকালের জন্যে হলেও তা সুচারুভাবে কাজ করে। এরপর তাদের মধ্য থেকে দু'একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি দাবী করে বসেন, এই বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ বিশাল বিশ্বজগত কোনো স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক-পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরী হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এসব তথাকথিত বিজ্ঞানীর এসব বাজে বক্তব্য শোনার জন্যেও লোকের অভাব হয় না।

আকাশ ও পৃথিবীর এই নিদর্শনের সাথে সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বিস্ময়কর বিভিন্নতা। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে এর একটা সম্পর্ক থাকারই কথা। ভূ-পৃষ্ঠে আবহাওয়ার বিভিন্নতা এবং মহাশূন্যের নিম্নস্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা মানব জাতির মূল স্বভাবের অভিন্নতা ও ঐক্য বজায় রাখা সত্তেও তার বর্ণ ও ভাষায় বিভিন্নতা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

এ যুগের বিজ্ঞানীরা ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করলেও তাতে যে আল্লাহর হাত আছে সেটা দেখতে পান না। দেখতে পান না বলেই অবলীলাক্রমে সামনে এগিয়ে যান। আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর কোনো লক্ষণ বা চিহ্নও তাদের চোখে পড়ে না। অথচ ভাষা ও বর্ণের এই বিভিন্নতা তারা নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের এই পর্যবেক্ষণে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় সৃষ্টির সুনিপুণ স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে তারা বিন্দুমাত্রও তাগিদ

অনুভব করেন না এবং সেটা তারা বিবেচনায়ও আনেন না। কেননা অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। 'তারা কেবল পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য অংশই জানে।' পক্ষান্তরে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতাজনিত নিদর্শন কেবল জ্ঞানী লোকদেরই চোখে পড়ার কথা। 'এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

'আল্লাহর আরো নিদর্শন হলো দিনে ও রাতে তোমাদের ঘুম এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ। যারা শ্রবণ করে তাদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে।'

এটাও এমন এক নিদর্শন, যাতে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মানবীয় অবস্থাসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। উভয়ের মধ্যে সংযোগ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং মহাবিশ্বের সার্বিক প্রেক্ষাপটে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এখানে রাত, দিন এবং মানুষের ঘুম ও জীবিকা উপার্জনের কাজকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। জীবিকাকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলা হয়েছে। কারণ মানুষ জীবিকার অন্বেষণে চেষ্টা সাধনা করার পর আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক তাকে এটা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই মহাবিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্য বানিয়েছেন। কেননা সে এই বিশ্বেরই অধিবাসী। এখানে কাজ করার যে চাহিদা ও প্রয়োজন তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে, তা পূরণ হয় দিন ও তার আলো দ্বারা। আর ঘুম ও বিশ্রামের যে চাহিদা এবং প্রয়োজন সৃষ্টি করেছেন তা পূরণ হয় রাত ও তার অন্ধকার দ্বারা। পৃথিবী নামক গ্রহের অধিবাসী অন্য সমুদয় প্রাণীর সাথে এই চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষের যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তবে সেটা শুধু পরিমাণ ও মাত্রার দিক দিয়ে, অন্য কোনো দিক দিয়ে নয়। মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি এখানে তাদের যাবতীয় স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে জীবন ধারণে কিছু দরকার, মহাবিশ্বের সাধারণ ব্যবস্থার আওতায় তা পেয়ে থাকে।

'নিশ্চয়ই এতে শ্রবণকারীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

ঘুম হচ্ছে বিশ্রাম, আর কাজ হচ্ছে ব্যস্ততা। এই উভয়টা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করা যায়। তাই আয়াতের শেষাংশের এই মন্তব্য প্রাকৃতিক নিদর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়েছে। এখানে পবিত্র কোরআনের বিশিষ্ট বর্ণনাভংগি অনুসৃত হয়েছে।

'এটাও তাঁর অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের বিজলী দেখিয়ে ভয় ও আশা জাগিয়ে তোলেন ....' বিজলী চমকানো প্রাকৃতিক নিয়ম বিধির আওতাধীন। কেউ কেউ এর কারণ দর্শিয়েছেন এই যে, বিদ্যুতবাহী দুটো মেঘের মধ্যে অথবা একটা মেঘ ও আরেকটা পার্থিব বস্তু যথা পর্বতচূড়া ইত্যাদির মাঝে সংঘর্ষ ও বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণের ফলে বাতাসে শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে থাকে. এই বিদ্যুত বিচ্ছুরণের ফলে বাতাসে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটাই বজ্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, যা বিজলী চমকানোর পর পরই সংঘটিত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই দুটো ঘটনা বৃষ্টিপাতের সাথেই সংঘটিত হয়, আর সেই বৃষ্টিপাত হয় উক্ত সংঘর্ষেরই ফল হিসেবে। কারণ যেটাই হোক না কেন, বিদ্যুত প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থা থেকেই সৃষ্ট এবং মহান স্রষ্টাই তা এরূপ পরিকল্পিতভাবে তৈরী করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কোরআন তার স্বভাবসুলভ নিয়মেই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খুব বেশী বিশদ ব্যাখ্যা দেয় না। প্রাকৃতিক নিয়মকে সে শুধু মানুষের মন সৃষ্টি জগতের সাথে ও স্রষ্টার সাথে যুক্ত করার জন্যে ব্যবহার করে। এ জন্যে সে এখানে বলেছে যে, মেঘের বিজলী চমকানো, তা দেখিয়ে মানুষের

মনে ভীতি ও আশা জন্মানো আল্লাহর একটা নিদর্শন। এই ভীতি ও আশা দুটো স্বাভাবিক অনুভূতি, যা ওই প্রাকৃতিক নিদর্শনটা দেখামাত্রই মানুষের হৃদয়ে জন্ম লাভ করে। ভীতির অনুভূতি জন্মে বজ্রপাতের প্রচন্ড শব্দে। কেননা মেঘে বিদ্যুৎ চমকালে কখনো কখনো মানুষ ও সহায় সম্পদ জ্বালিয়ে ভস্মীভূতকারী ভয়াবহ বজ্রপাত ঘটে। আবার কখনো কখনো বিদ্যুৎ দেখার কারণেই মনে অজানা ভীতির সঞ্চার হয়। বিদ্যুত দেখার পাশাপাশি এই বিশাল প্রকৃতির সম্ভাব্য শক্তির ভয়াবহতার যে ধারণা মানুষের অন্তরে জন্মে, তাও এই ভীতি সঞ্চারে সহায়তা করে। আর বিদ্যুতের সাথে সাথে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, তার সুফলের আশা মানুষকে আশান্বিতও করে। আয়াতে বিদ্যুতের উল্লেখের পরেই এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে 'এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়ে মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন।'

পৃথিবীকে কখনো জীবিত ও কখনো মৃত বলা দ্বারা এরূপ ধারণা জন্মে যে, পৃথিবী যেন একটা জীবিত প্রাণী, যা কখনো বাঁচে, কখনো মরে। কোরআনের বর্ণনা অনুসারে পৃথিবী আসলেই তদ্রূপ। শুধু পৃথিবী নয়, সমগ্র সৃষ্টিজগতই এমন এক জীবন্ত প্রাণী, যার অনুভূতিও আছে, প্রতিক্রিয়াও আছে, যা নিজ প্রতিপালকের অনুগত, ভীত ও বিনীত, তাঁর আদেশ মেনে চলে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে ও এবাদাত করে। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষও আল্লাহর সৃষ্টিরই দলভুক্ত এবং একই আল্লাহর অনুগত।

তা ছাড়া পৃথিবীতে যখন বৃষ্টি হয়, তখন তা উর্বরতা লাভ করে, তাতে জীবন্ত ও বিকাশমান ফসল জন্মে, এই ফসলের মধ্যে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত জীবনের প্রভাবে গোটা পৃথিবী সজীব হয়ে নেচে ওঠে। পানি হলো জীবনের দূত। যেখানেই পানি থাকবে, সেখানে অনিবার্যভাবেই জীবন থাকবে।

'এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

কেননা এখানে বিবেক বুদ্ধির জন্যে কিছু চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিবেচনার সুযোগ এবং অবকাশ রয়েছে।

'এটাও আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। ....'

বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীর সুশৃংখলভাবে, সুষ্ঠুভাবে, পরিকল্পিতভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে থাকা আল্লাহর ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া হতে পারে না। কোনো সৃষ্টিই দাবী করতে পারে না যে, সে বা অন্য কেউ এ কাজ করতে সক্ষম। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এ কথাও বলতে পারে না যে, কোনো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই এসব চলছে। সুতরাং এটা আল্লাহর একটা নিদর্শন যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক চলছে, তার আদেশের অনুগত রয়েছে এবং কখনো বিপথগামী, উচ্ছৃংখল ও অবাধ্য হয় না।

'অতপর যখনই পৃথিবীর ভেতর থেকে তোমাদের ডাকবেন অমনি তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'

বিশ্বজগতের পরিচালনা ব্যবস্থায় এই অটুট শৃংখলা ও এই দৃঢ়তা যিনি দেখতে পান, তিনি কখনো সন্দেহ করতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ যেদিন কবর থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাবেন সেদিন দুর্বল মানুষেরা নির্দ্ধিধায় বেরিয়ে আসবে।

এরপর এই প্রতিবেদনের শেষে কথা আসছে। সেটা এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সেদিন আল্লাহর অনুগত হবে।

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর, সবাই তাঁর অনুগত।'

এ কথা সত্য যে, আমরা বহু মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যও দেখি। আসলে এখানে যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, আকাশ ও পৃথিবীর সবাই, সব কিছু আল্লাহর অটুট ও অমোঘ প্রাকৃতিক বিধানের অনুগত। তারা নাফরমান বা কাফের হলেও প্রাকৃতিক বিধানের শাসনাধীন। তাদের বিবেক ও মন যতোই আল্লাহকে অস্বীকার অমান্য করুক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তারা প্রাকৃতিক বিধির অনুগত। মহান স্রষ্টা এই বিধান দ্বারা নিজের ইচ্ছামত সকল বান্দার সাথে আচরণ করেন। কেউ এর বিরোধিতা বা অবাধ্যতা করতে পারে না।

সবার শেষে কেয়ামত ও আখেরাতের প্রসংগে বলা হয়েছে, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, পুন সৃষ্টি করেন।...........'

এ সূরায় ইতিপূর্বে এই প্রথম সৃষ্টি ও দ্বিতীয় সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে নতুন যে কথাটা বলা হয়েছে তা হলো, 'পুন সৃষ্টি তাঁর কাছে অধিকতর সহজ। বস্তুত আল্লাহর কাছে কোনো কাজই অধিকতর সহজ বা কঠিন নয়। কেননা তিনি কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু বলেন, 'হয়ে যাও' আর তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়, কিন্তু তিনি যখন মানুষের সাথে কথা বলেন তখন তাদের বোধশক্তি অনুপাতে বলেন। মানুষের ধারণা এই যে, প্রথম বার সৃষ্টি করা দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন। সেটা যদি মেনেও নেয়া হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে, আখেরাতে মানুষের পুনরুজ্জীবনকে কিভাবে আল্লাহর অসাধ্য মনে করা হয়? অথচ সেই দ্বিতীয় সৃষ্টি তো অপেক্ষাকৃত সহজ।

'আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যে রয়েছে সর্বোচ্চ নমুনা।' বস্তুত মহান আল্লাহর গুণাবলী অতুলনীয় ও অনন্য। কেউ তাঁর সাথে এ গুণাবলীতে শরীক নয়। তাঁর মতো কোথাও কেউ বা কিছু নেই। তিনি অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।' তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ তিনি মহা পরাক্রান্ত, তাই তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। আর তিনি মহাবিজ্ঞানী বিধায় তার সৃষ্টি হয়ে থাকে নিখুঁত, নিষ্কলংক, অটুট ও সুশৃংখল।

মোশরেকদের স্ববিরোধিতা

পূর্ববর্তী আলোচনায় মহান আল্লাহর অতুলনীয় সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিবরণ দেয়ার পর এবার নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে,

'আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই একটা উদাহরণ দিয়েছেন। ....' (আয়াত ২৮)

আল্লাহ তায়ালাও উদাহরণটা দিয়েছেন মোশরেকদের বুঝানোর জন্যে, যারা জ্বিন, ফেরেশতা, মূর্তি, গাছ, ইত্যাকার কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, অথচ তারা তাদের যে সব দাসদাসী আছে, তাদের কাউকে তাদের ধন সম্পদে শরীক করতে রাযি হবে না এবং কোনো ব্যাপারেই তারা তাদের গোলাম বাঁদীকে নিজেদের সমপর্যায়ে আনতে প্রস্তুত হবে না। তাদের আচরণের এই অসংগতি বিস্ময়কর। আল্লাহ তায়ালা একক স্রষ্টা ও একক রেযেকদাতা হওয়া সত্তেও মোশরেকরা তাঁর সাথে তাঁর দাসদের শরীক বানাতে চায়। অথচ তাদের নিজেদের কোনো সম্পদে এ দাসদাসীদের কাউকে শরীক বানাতে প্রস্তুত নয়। তাদের এই সম্পদও তো তাদের নিজেদের সৃষ্টি করা নয়। বরং আল্লাহর দেয়া। বস্তুত এটা এক আশ্চর্য রকমের স্ববিরোধিতা।

এই উদাহরণটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এভাবে। 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটা উদাহরণ দিয়েছেন।' অর্থাৎ এমন একটা উদাহরণ দিয়েছেন, যা তোমাদের কাছ থেকে দূরের নয় যে, তা দেখতে তোমাদের দূরে কোথাও যেতে হবে বা কাউকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে হবে। 'তোমাদের কি পছন্দ হবে যে, আমি যে সম্পদ তোমাদেরকে দিয়েছি, তার কোনো কিছুতে তোমাদের কোনো দাসদাসী শরীক হোক এবং তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও?' জানা কথা যে, তোমরা তাদের নিজেদের সমান করা তো দূরের কথা, তাদের তোমাদের সামান্যতম সম্পদের শরীক বানাতেও রাযি হবে না। 'তোমরা নিজেদের যেমন ভয়ংকর, তেমনি তাদেরও ভয় করো।' অর্থাৎ স্বাধীন লোকদের শরীক করলে তাদের সম্পর্কে যেমন বিচার-বিবেচনা করো, দাসদাসীদের শরীক করেও তেমনি করতে রাযি হবে কি? তারা তোমাদের সমকক্ষ হয়ে তোমাদের ওপর জোর যুলুম চালাক, তা বরদাশত করবে কি? তোমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ মহলে এরূপ করতে কি তোমরা প্রস্তুত হবে? তা যখন হবে না, তখন সেই অতুলনীয় মর্যাদাসম্পন্ন মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কেন এমন ধৃষ্টতা তোমাদের।

এটা এমন একটা সুস্পষ্ট উদাহরণ, যা নিয়ে বিতর্কের কোনোই অবকাশ নেই। এটা সাধারণ যুক্তি ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি দ্বারাই বুঝা যায়। 'আমি এভাবেই বুদ্ধিমানদের কাছে বিশদভাবে আয়াতগুলো তুলে ধরি।'

শেরেকের তুচ্ছ দাবীর ক্ষেত্রে তাদের এই স্ববিরোধিতা তুলে ধরার পর এই স্ববিরোধিতার আসল কারণ উদঘাটন করা হচ্ছে,

'আসলে অত্যাচারীরা না জেনে শুনে নিজেদের প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ করছে।' (আয়াত ২৯)

বস্তুত প্রবৃত্তি এমন এক জিনিস, যার কোনো নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রণকারী থাকে না। একে পরিচালনা করার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট ছকও নেই, মাপকাঠিও নেই। প্রবৃত্তি যখন যা খুশী তাই করে এবং তাই চায়। তার ইচ্ছা, আকাংখা, কামনা বাসনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, কোনো ভালোমন্দের বাছ বিচার নেই, এবং কোনো ন্যায় অন্যায় নেই। এটা এমন এক গোমরাহীর উৎস, এমন এক বিদ্রোহের উস্কানিদাতা, যার উপস্থিতিতে হেদায়াতের এবং আনুগত্যের পথে ফেরার আর কোনো আশা থাকে না। 'অতএব যাকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী করেছেন, তাকে কে সৎপথে চালাবে?' অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে যাকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী করেছেন, তাকে আর কে হেদায়াত করবে? 'তার কোনো সাহায্যকারী নেই।' অর্থাৎ তাকে তার খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ নেই।

এই পর্যায়ে এসে প্রবৃত্তির দাসদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তিনি যেন আল্লাহর প্রামাণ্য দ্বীনের ওপর অবিচল থাকেন, যা আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ। বস্তুত এটা হচ্ছে একটা মাত্র একক আকীদা ও আদর্শ। মোশরেকদের ধর্ম যেমন তাদের বহু দলে-উপদলে এবং জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত করেছে, আল্লাহর দ্বীন তেমন নয়। এতে কোনো দল-উপদল সৃষ্টির অবকাশ নেই।

'অতএব তুমি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি একাগ্র হও।' (আয়াত ৩০, ৩১ ও ৩২)

বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য ও নিদর্শন দেখানোর পর যখন নির্ভুল প্রকৃতি এবং নিখুঁত স্বভাবের ধর্ম ইসলামের প্রতি পাঠকের মন আকৃষ্ট হয়েছে, যখন বিপথগামীরা তাদের বিপথগামিতার সমস্ত

যুক্তি প্রমাণ হারিয়ে ফেলেছে, সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতছাড়া হয়েছে, তখনই আল্লাহর দ্বীনের অনুগত হবার ও তা গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশ সঠিক সময়েই দেয়া হয়েছে। আর কোরআন এভাবে ইসলামের জন্যে সবচেয়ে মযবুত যুক্তি পেশ করেছে, যা কেউ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখে না।

'অতএব তুমি একাগ্র হয়ে দ্বীনের অনুগত হও।'

অর্থাৎ সোজাসুজিভাবে এই সরল সঠিক ধর্মের অনুগত হও। কেননা এই দ্বীন মানুষকে সমস্ত ভ্রান্ত, অসত্য ও অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, সমস্ত অজ্ঞতা, প্রবৃত্তি পূজা ও অযৌক্তিক পথ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহর এই নির্ভুল দ্বীনের অনুসারী হয়ে অন্য সব মতবাদ ও মতাদর্শ পরিত্যাগ করো।

'আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।' এ কথা দ্বারা মানবীয় স্বভাব ও ইসলামের প্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। উভয়টাই আল্লাহর সৃষ্টি। উভয়টাই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ। উভয়টাই পরস্পরের সাথে সুসমন্বিত। যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মন সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার জন্যে এই দ্বীন নাযিল করেছেন, যাতে করে এ দ্বীন তাকে সঠিক পথে চালিত করে, সকল ব্যাধি থেকে মুক্ত করে এবং সকল গোমরাহী থেকে পরিশুদ্ধ করে। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে নিজেই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। আল্লাহর সৃষ্টি করা স্বভাব প্রকৃতি যেমন অপরিবর্তনীয় ও স্থিতিশীল, তেমনি তাঁর নাযিল করা দ্বীনও স্থিতিশীল ও চিরঞ্জীব। 'আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই।' মানুষের মন যখন সুস্থতা, স্বভাবিকতা থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী হয়, তখন ইসলাম ছাড়া আর কোনো জিনিস তাকে সুস্থতা স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। কেননা ইসলাম নিজেই স্বভাব ধর্ম। মানুষের স্বভাব ও বিশ্বজগতের স্বভাব প্রকৃতির সাথে তা সম্পূর্ণরূপে সুসমন্বিত।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ

رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ

يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ

ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ

وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي

أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

৩৩. মানুষদের যখন কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা (আল্লাহর) দিকে বিনয়ের সাথে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে তাদের মালিককে ডাকতে থাকে, অতপর যখন তিনি তাদের তাঁর দয়া (নেয়ামতের স্বাদ) উপভোগ করান, তখন সাথে সাথে তাদের একদল লোক তাদের মালিকের সাথে (অন্যদের) শরীক করতে শুরু করে, ৩৪. উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা কিছু (অনুগ্রহ) আমি তাদের দান করেছি তার (প্রতি) যেন অকৃতজ্ঞতা (-জনিত আচরণ) করতে পারে, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অতপর অচিরেই তোমরা (তোমাদের কুফরীর ফলাফল) জানতে পারবে। ৩৫. কিংবা আমি কি তাদের ওপর এমন কোনো দলীল প্রমাণ পাঠিয়েছি যে, যে শেরেক এরা করে চলেছে তা (তাদের) এমন কথা বলে। ৩৬. আমি যখন মানুষদের অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (ভীষণ) খুশী হয়; আবার যখন তাদেরই (মন্দ) কাজের কারণে তাদের ওপর কোনো মসিবত পতিত হয় তখন তারা সাথে সাথেই নিরাশ হয়ে পড়ে। ৩৭. এরা কি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে চান তার রেযেক প্রসারিত করে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন; নিসন্দেহে যারা ঈমানদার, এতে (তাদের জন্যে) অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৩৮. অতএব (হে ঈমানদার ব্যক্তি), তুমি আত্মীয় স্বজনকে তার অধিকার আদায় করে দাও, অভাবগ্রস্ত মোসাফেরদেরও (নিজ নিজ পাওনা বুঝিয়ে দাও), এ (বিষয়টি) তাদের জন্যে ভালো যারা (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করে, (আর সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সফলকাম। ৩৯. যা (কিছু ধন সম্পদ) তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যেই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু মোটেই) বাড়ে না, অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে দান করো,

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ

شَىْءٍ ۖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا

كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ

يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ

عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

তাই বরং বৃদ্ধি পায়, জেনে রেখো, এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর দরবারে নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়। ৪০. আল্লাহ তায়ালা (সেই পরাক্রমশালী সত্তা)– যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের রেযেক দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতপর (কেয়ামতের দিন) তিনি তোমাদের (আবার) জীবন দেবেন; তোমরা যাদের (আল্লাহর সাথে) শরীক করে নিয়েছো তাদের কেউ কি এমন আছে, যে এর কোনো একটি কাজও করতে পারবে? (মূলত) তারা (আল্লাহর সাথে) যাদের শরীক বানায়, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে অনেক পবিত্র, অনেক মহান।

রুকু ৫

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে (সর্বত্র আজ) বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কতিপয় কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, সম্ভবত তারা (সেসব কাজ থেকে) ফিরে আসবে। ৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে ভ্রমণ করো এবং যারা আগে (এখানে মজুদ) ছিলো, (আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করায়) তাদের কি (পরিণতি) হয়েছিলো তা অবলোকন করো; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো মোশরেক। ৪৩. অতএব (হে নবী), তুমি তোমার নিজেকে সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (ভয়াবহ) দিনটি আসার আগে (পর্যন্ত), যা কেউই ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, আর সেদিন যখন আসবে তখন (মোমেন ও কাফের) সবাই আলাদা হয়ে যাবে। ৪৪. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করলো, তার (এ) কুফরী (আযাব হিসেবে) তার ওপরই (এসে পড়বে, অপর দিকে) যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, তারা (যেন এর মাধ্যমে) নিজেদের জন্যে (সুখ) শয্যা রচনা করলো, ৪৫. (মূলত) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল

الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ

الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۚ وَكَانَ

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا

فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ

كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ

رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ

করবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের (যথোপযুক্ত) বিনিময় দান করবেন; আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কখনো পছন্দ করেন না। ৪৬. তাঁর (মহান কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন, যাতে করে তিনি তোমাদের তাঁর অনুগ্রহের (স্বাদ) আস্বাদন করাতে পারেন, (উপরন্তু) তাঁর আদেশে (সমুদ্রে) জলযানগুলো যেন চলতে পারে এবং তোমরাও (এর মাধ্যমে) তাঁর (কাছ থেকে) রেযেক তালাশ করতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা (এসব কিছুর জন্যে) তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। ৪৭. (হে রসূল,) আমি তোমার আগে আরো রসূল তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (নবুওতের) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়েও এসেছিলো (কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে), অতপর যারা অপরাধ করেছে আমি তাদের কাছ থেকে (মর্মান্তিক) প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি; (কেননা, তাদের মোকাবেলায়) ঈমানদারদের সাহায্য করা ছিলো আমার ওপর কর্তব্য। ৪৮. আল্লাহ তায়ালা (সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা (এক সময়) মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, (এক পর্যায়ে) তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই চান তার ওপরই তা পৌঁছে দেন, তখন তারা (এটা দেখে) ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়, ৪৯. অথচ এরাই (একটু আগে) তাদের ওপর (বৃষ্টি) নাযিলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলো! ৫০. তাকিয়ে দেখো আল্লাহ তায়ালার (অফুরন্ত) রহমতের প্রভাবের দিকে, কিভাবে তিনি যমীনকে একবার মরে যাওয়ার পর পুনরায় (শ্যামল ও) জীবন্ত করে তোলেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এভাবে কেয়ামতের দিন) সব মৃতকে জীবন দান করবেন,

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا
مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ
تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ
ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا
وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ
يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ
الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا

কেননা তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান। ৫১. যদি আমি কখনো এমন বায়ু পাঠাতে শুরু করি, (যার ফলে) মানুষ ফসলকে হলুদ রঙের দেখতে পায়, তখন তারা আমার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শুরু করে। ৫২. (হে নবী,) মৃতকে তো তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, (বিশেষ করে) যখন ওরা (তোমাকে দেখেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৫৩. তুমি অন্ধদের তাদের গোমরাহী থেকে (বের করে) সঠিক পথ দেখাতে পারবে না, তুমি তো কেবল এমন লোকদেরই (আমার কথা) শোনাতে পারবে যে আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, কেননা এরাই হচ্ছে (নিবেদিত) মুসলমান।

রুকু ৬

৫৪. আল্লাহ তায়ালাই (হচ্ছেন সেই মহান সত্তা)– যিনি তোমাদের দুর্বল করে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি (এ) দুর্বলতার পর (দেহে) শক্তি সৃষ্টি করেছেন, আবার (তিনি এ) শক্তির পর (পুনরায়) দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞ। ৫৫. যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন অপরাধী ব্যক্তিরা কসম খেয়ে বলবে, তারা তো (কবরে) মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি; (আসলে) এরা এভাবেই সত্যবিমুখ থেকেছে (এবং দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়েছে)। ৫৬. কিন্তু সেসব লোক, যাদের যথার্থ জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে (না), তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার হিসাবমতো (কবরে) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই অবস্থান করে এসেছো, আর আজকের দিনই হচ্ছে (সেই প্রতিশ্রুত) পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিনটাকে সঠিক বলে) জানতে না। ৫৭. সেদিন যালেমদের ওযর

يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝٥٧ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝٥٨ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٩ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝٦٠

আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, না তাদের আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে। ৫৮. (হে নবী,) আমি মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে এ কোরআনে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি; (তারপরও) যদি তুমি এদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে হাযির হও, তবুও এ কাফেররা বলবে, তোমরা (তো কতিপয়) বাতিলপন্থী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নও। ৫৯. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যারা (সত্য সম্পর্কে কিছুই) জানে না। ৬০. অতএব (হে নবী), তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যাদের (শেষ বিচার দিনের ওপর) আস্থা নেই, তারা যেন তোমাকে কখনোই (সত্য দ্বীন থেকে) বিচলিত করতে না পারে।

তাফসীর

আয়াত ৩৩-৬০

'এটাই হচ্ছে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।' .... এর ফলে (এই না জানার কারণে) তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সেই মযবুত ও সঠিক পথ থেকে দূরে সরে (চলে) যায় যা তাদেরকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্যে নিবেদিত ছিলো।

যদিও রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে রুজু করার জন্যে এখানে দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো, তবুও সত্য সঠিক মযবুত ইসলামী জীবন বিধানের দিকে মুখ ফেরানোর কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল যমানার সকল মানুষ যেন কোরআন হাদীসে বর্ণিত ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন-বিধানের অনুসারী হয়ে যায়। যতো দিন রসূল (স.) বেঁচে ছিলেন ততোদিন তাঁকে দেখে তাঁর সাহাবায়ে কেরামরা শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর, তাঁর প্রদত্ত যাবতীয় শিক্ষা কোরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করতে হবে। আর এ জন্যেই সদা সর্বদা আল কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে।

মতভেদ ও দলাদলিই হচ্ছে মোশরেকদের চরিত্র

'একাগ্রচিত্তে তার দিকে ঝুঁকে থাকো, তাঁকেই ভয় করো এবং নামায কায়েম করো; আর খবরদার, সেসব মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেয়ো না যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং এইভাবে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। ওদের প্রত্যেক দল নিজ নিজ মত নিয়ে উল্লসিত হয়ে রয়েছে।'

এভাবেই আল্লাহকেন্দ্রিক হয়ে থাকা যাবে এবং প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে। এটাই তাকওয়া-পরহেযগারীর উপযোগী পদ্ধতি, এটাই বিবেকসম্মত কাজ এবং

গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্যে সতর্কতা অবলম্বনের নিয়ম। জীবন পথে এভাবে অগ্রসর হলে তবে আশা করা যায়, যাই করা হোক না কেন এবং যেখানেই থাকা হোক না কেন, সত্য-সচেতন হয়ে থাকা সম্ভব হবে। আবারও স্মরণ করানো হচ্ছে যে, আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ বান্দা হতে হলে এবং তাঁর বান্দা হিসেবে দয়িত্ব পালন করতে গেলে সর্বপ্রথম সালাত কায়েম করতে হবে। সময় হওয়ার সাথে সাথে এক আল্লাহর দরবারে হাযিরা দেয়ার মাধ্যমে ঈমানের বাস্তব প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং এই সালাতই তাকে মোশরেকদের থেকে ভিন্ন এক জাতি হিসেবে চিহ্নিত এবং প্রমাণিত করবে।

স্মরণ রাখতে হবে, মোশরেকদের পরিচয় দিতে গিয়ে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআন জানাচ্ছে যে, তারা দ্বীন ইসলামের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং নিজেরাও বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।' .... তারা সমাজের বুকে বহু রংয়ের এবং বহু ধরনের শেরেক মিশ্রিত ধর্ম চালু করেছে, কেউ জ্বিনদের পূজা করে, কেউ পূজা করে ফেরেশতাদের, কেউ বাপ-দাদাদের আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে তাদের পূজা করে, কেউ পূজা করে রাজা বাদশাদের, কেউ বা পূজা করে জ্যোতির্বিদ ও ধর্মযাজকদের। ওদের মধ্যে কেউ পূজা করে গাছপালার? কেউ পূজা করে গ্রহ-নক্ষত্রের, কেউ আগুনের পূজা করে, আবার কেউ পূজা করে রাত ও দিনের এবং কেউ পূজা করে মিথ্যা যৌনাভূতি ও ভোগ-লালসার– আর এতো সব করেও তাদের শেরেকের ধরন ও প্রকারের শেষ নেই .... তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর প্রত্যেক দল যে যেটা নিয়ে আছে তাতেই তারা খুশী।'

এমনই এক অবস্থার মধ্যে এমন মযবুত ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে যার কোনো পরিবর্তন নেই এবং যা কোনো সময়ে মতভেদের দ্বারা খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে না, আল্লাহর দিকে ছাড়া মানুষকে অন্য কোনো দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। এ ব্যবস্থা মানুষের গতি ফিরিয়ে দেবে সেই আল্লাহর দিকে, যার হুকুমে চলছে আকাশমন্ডলী ও বিশাল এ ধরনী, আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মানুষ ছাড়া) সবাই ও সব কিছু যাঁর অনুগত হয়ে রয়েছে।

'আর যখন মানুষকে কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা তাদের রবের দিকে রুজু হয়ে তাঁকে কাতর কণ্ঠে ডাকতে থাকে......... এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মোহর মেরে বন্ধ করে দিয়েছেন তাদের অন্তর যারা তাদের জ্ঞান কাজে লাগায় না। অতএব, সবর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর হে রসূল, তোমাকে যেন সেসব লোকেরা ব্যতিব্যস্ত করে না ফেলে যারা সত্যিকারে বিশ্বাস করে না।'

আরব জাহেলিয়াতের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে মনগড়া দেব-দেবীর পূজা অর্চনা চলে আসছিলো, শেরেক ও মূর্তি-পূজা এবং মূর্খতা ও হঠকারিতা গোটা সমাজকে যে ভীষণভাবে গ্রাস করে রেখেছিলো, ইসলামের আলোকে সেই কঠিন অবস্থা থেকে তারা কিভাবে মুক্তি পেলো, বর্তমান ভাষণে অতি সুন্দরভাবে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। ইসলামের সুমহান ও সম্মোহনী আলোকে আঁধারের ঘোর কেটে গিয়ে উদিত হয়েছে সত্যের সূর্য।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ছোঁয়াচ পেয়ে সুখে দুঃখে এবং সংকটে সচ্ছলতায় ফুটে ওঠেছে মানবতার আসল রূপ। সাধারণভাবে মানুষ তার শক্তি ক্ষমতা ও চিন্তা ভাবনা দ্বারা তার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় না, বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিচার ও সিদ্ধান্তের ওপর যখন নিজেকে সোপর্দ করে তখন সে আর কখনও পেরেশান হয় না। তার জীবনের সকল সমস্যার জন্যে আল্লাহ পরওয়ারদেগারের ওপর যখন সে পুরোপুরি তাওয়াক্কুল করে, তখনই তার অস্থিরতা

দূর হয়ে যায়। যেহেতু তিনিই সব কিছুর মালিক এবং তিনিই প্রশস্ত করেন রুজি রোজগারের ভান্ডার আর যার জন্যে ইচ্ছা তার জন্যে এ ভান্ডার তিনিই সংকীর্ণ করেন। আর মানুষের মধ্যে যার জন্যে যে পরিমাণ রেযেক তিনি বরাদ্দ করেছেন সেই পরিমাণ সামনে রেখে তিনি তাদের শিখিয়েছেন সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে তারা বাড়াতে পারে তাদের আয়-রোজগার এবং এভাবেই মহান আল্লাহ তাদের অন্যায় পন্থা গ্রহণ করা থেকে পবিত্র করেন। এমনই নিপুণ ও মযবুত এই পদ্ধতি, যার যথার্থতা সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না এবং এ পদ্ধতি তাকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে এগিয়ে দেয়। এসব নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনেই মানুষ তার মহান সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে, যিনি সবারই জীবন-মৃত্যুর মালিক। এখন সে মোশরেকরা যেসব শরীকদের আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করে, তারা একটুও চিন্তা করে না যে, বাস্তবে ওই কল্পিত অংশীদাররা কি কাজটা করে বা করতে পারে? ওদের ওই হঠকারী চিন্তা ও নির্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাদের সাবধান করে বলছেন যে, তাদের কাছে সত্য সমাগত হওয়ার পরে তারা যদি সাবধান না হয় এবং এখনও শেরেকের ওপর টিকে থাকে, তাহলে তাদের জীবনে সকল দিক থেকে নেমে আসবে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা। এই বিষয়টিই আল আমীন মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) তাদের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন এবং এই মহা সত্যই মুসলমানদের এগিয়ে দিয়েছে দ্বীন ইসলামের সকল বিধান মযবুতভাবে ধারণ করার দিকে। যারা ইসলামের যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য জেনে বুঝে মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে, তারা এ বিষয়ে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত যে, তারা সেই কঠিন দিন আসার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সরল সঠিক ও সুন্দরতম জীবন বিধান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, যেদিন কেউ কোনো কাজ করতে পারবে না এবং কোনো কিছু কেউ অর্জনও করতে পারবে না। সেদিন থাকবে শুধু হিসাব নিকাশ ও সেই কাজের প্রতিদান, যা পার্থিব জীবনে তারা করেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা রেযেকের কথা বলতে গিয়ে, রেযেকের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এক প্রকার রেযেক হচ্ছে তাই যার সম্পর্ক হচ্ছে সেসব জিনিসের সাথে, যা মানুষের বস্তুগত জীবনের সাথে জড়িত, যেমন বৃষ্টির পানি। যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং মরে যাওয়া যমীনকে পুনরায় যিন্দা করে তোলে। এই পানিতেই নৌ-জাহাজগুলো আল্লাহর হুকুমে দেশ থেকে দেশ-দেশান্তরে নানা প্রকার পণ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে যায়। আর এক প্রকার রেযেক হচ্ছে মানুষের আত্মার খোরাক, যা মৃত অন্তরসমূহকে জীবিত করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার সুস্পষ্ট নিদর্শন আকারে নাযিল হয়; কিন্তু হায়, এতো পরিষ্কার ও দৃষ্টি আকর্ষণী কথা এবং যুক্তি থাকা ওই কথাগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আত্মপূজারী ব্যক্তিরা, স্বার্থান্বেষী মহল ও দুনিয়াদার লোকেরা, তারা এসব সত্য সঠিক ও বিবেকগ্রাহ্য কথাগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে না এবং খেয়াল করে শোনেও না। এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সামনে তাদের জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরছেন, জানাচ্ছেন তারা কিভাবে সৃষ্টি হলো, বেড়ে ওঠলো, অবশেষে কিভাবে তারা আপন সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যাবে। সেদিন যালেমদের ওযর অজুহাত তাদের কোনো প্রকার সাহায্য করবে না এবং সেদিন তাদের কোনো তাওবাও কবুল করা হবে না। আলোচ্য ভাষণটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃঢ়তা এবং তাঁর কাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কে জানানোর সাথে শেষ হচ্ছে। জানানো হচ্ছে, এ মিশন পরিপূর্ণ করতে গিয়ে তিনি আল্লাহর ওপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল করেছেন এবং সর্বাবস্থায় সবর করেছেন। কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার মধ্যেও তিনি বিচলিত হননি, যার ফলে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা নিশ্চিতভাবে সত্য প্রতিষ্ঠার ওয়াদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

'আর যখন মানুষকে কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে কায়মনোবাক্যে তাদের রবের দিকে রুজু করে........ নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে মোমেনদের জন্যে অবশ্য অবশ্যই বহু নিদর্শন।'

ওপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানব জীবনের সাধারণ অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে, মানুষ হিসেবে তার কোনো কিছুরই কোনো স্থায়িত্ব নেই, নেই তার মতামতের কোনো স্থিরতা। সে আজকে এক পথে চলছে তো কালকে আর এক পথে চলে, কোনো সময়ে এক মত গ্রহণ করছে, আবার কোনো সময়ে অন্য মতের দিকে চলে যাচ্ছে, সত্যিকারে বলতে গেলে কি সুস্পষ্টভাবে কোনো জীবন বিধান তার কাছে নেই, যার ওপর সে স্থির হয়ে টিকে থাকতে পারে। তার জীবনের নিরন্তর পথপরিক্রমায় সে সর্বদাই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে, যে অবস্থাটা তার সামনে আসে তার ওপর ভিত্তি করে সে কিছু আন্দাজ-অনুমান করে ভবিষ্যত পথ রচনা করে। আবার কিছুদিন পরে তা যখন ভুল প্রমাণিত হয় তখন সে আবার আর এক পথ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে বার বার ঠোকর খেয়ে খেয়ে এবং নানাভাবে কষ্ট পাওয়ার পর অবশেষে সে ফিরে আসে তার (প্রকৃত) রব প্রতিপালকের কাছে এবং আশ্রয়প্রার্থী হয় সেই মহাশক্তিধরের কাছে, যার কোনো লয় নেই, কোনো ক্ষয় নেই, যিনি ছাড়া বাঁচানেওয়ালাও কেউ নেই, তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া ব্যতীত দুঃখ কষ্ট এবং শেষ পরিণতির কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ারও কোনো উপায় নেই, কিন্তু এরপর যখন বিপদ কেটে যায়, দুঃখ কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত নেমে আসে, তখন 'তাদেরই মধ্যে একটি দল তাদের রবের সাথে শরীক করতে শুরু করে দেয়।'

ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে শেরেকে লিপ্ত হওয়া

এখানে মোশরেকদের মধ্য থেকে সেই দলটিকে সম্বোধন করা হচ্ছে, যারা মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতকে দেখেছে, বুঝার চেষ্টা করেছে এবং অনেকাংশে আকৃষ্টও হয়েছে, কিন্তু পার্থিব স্বার্থ, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ও তাদের বিরোধিতার ভয় তাদেরকে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দিচ্ছে না। তাই তাদের শক্তভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সত্য ও মিথ্যা, সার ও অসার, পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা ও পরকালীন জীবনের স্থায়িত্বের কথা জানা বুঝা সত্ত্বেও যখন উপস্থিত আনন্দ-অভিলাষ ও সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণ থেকে তারা মুক্ত হতে পারছে না, তখন তারাও ওই পথভ্রষ্ট লোকদের দলভুক্ত বলেই গণ্য হবে, যারা জেনে বুঝে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই বলা হচ্ছে,

'ঠিক আছে, খেয়ে পরে নাও, ফুর্তি করে প্রাণ ভরে দুনিয়ার মজা লুটে নাও এবং কানায় কানায় ভরে ফেলো তোমাদের আনন্দের পেয়ালা; অবশ্যই শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে (এর পরিণতি কি)!'

এ এক সাংঘাতিক রকমের ধমক, এক ধমকের মধ্যে রয়েছে ভয় ও কঠিন শাস্তির ইংগিত। কোনো কর্তৃপক্ষ বা শাসনকর্তার পক্ষ থেকে যখন এ রকম ভয় দেখানো হয় তখন মানুষ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়, অথচ এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে যখন এ কঠিন শাস্তি নেমে আসবে বলে ভয় দেখানো হয়, তখন এই হঠকারী শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যাচ্ছে না। এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়! মহান আল্লাহ কোনো কিছু করতে চাইলে শুধু বলেন, হয়ে যাও (আর অমনি তা হয়ে যায়)। তিনিই আজ বলছেন, খেয়ে পরে নাও, ফুর্তি করো, দুনিয়ার মজা লুটে নাও। অর্থাৎ ফাঁসির আসামীকে যেমন বলা হয়, কি খাবে বলো, যা তোমার পরানে চায় তোমাকে তা-ই দেয়া হবে, কারণ এর পরেই আসছে মৃত্যুর ভয়ানক ছোবল রূপ

যন্ত্রণা। অনুরূপভাবে যা খুশী দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণের অর্থ হচ্ছে, পরকালে তো তোমাদের ভাগ্য লিখনে রয়েছে শাস্তিই শাস্তি, যে শাস্তির কোনো সীমা বা শেষ থাকবে না।

এই ভয়ানক আযাব আসার ব্যাপারে ব্যস্ততা দেখানোর পরে আবারও তারা ফিরে আসে এবং আতংকভরা মন নিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জানতে চায়, যে শেরেকের ওপর তারা টিকে আছে, এর পক্ষে কোনো কথা পাওয়া যায় কিনা। কারণ তারা তো মনে করে, আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত পাওয়ার পথে এ শেরেক কোনো অন্তরায়ই নয় এবং যে কুফরী কাজে তারা লিপ্ত রয়েছে, এটাও তাদের আল্লাহর রহমত পাওয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করছে না। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'আমি, মহান আল্লাহ, এমন কোনো দলীল প্রমাণ কি নাযিল করেছি যা তাদের শেরেকের কাজকে সমর্থন দিচ্ছে বলে মনে হয়?'

অবশ্যই আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আমি কি ওদের শেরেকের কাজকে সমর্থন করতে গিয়ে কোনো শক্তিশালী যুক্তি বা দলীল প্রমাণ নাযিল করেছি? এ প্রশ্ন দ্বারা সে জঘন্য অপরাধের প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা প্রদর্শনই করা হয়েছে এবং তাদের কটাক্ষ করে তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাদের সেসব বাজে কথাকে। এভাবে ওপরে বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে তাদের শেরেকের আকীদাকে এক নির্জলা মিথ্যা ও নির্বুদ্ধিতা বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, প্রমাণ করা হয়েছে তাদের বেওকুফী। আসলে তারা নিজেরাও জানে, এসব কাজের পেছনে কোনো যুক্তি নেই; তবুও তারা এই অন্ধত্বের মধ্যে ডুবে রয়েছে নিছক সাময়িক আবেগ উচ্ছ্বাস, আনন্দ অভিলাষ এবং উপস্থিত স্বার্থের কারণে। এরপর চিন্তা করতে গেলে আর একটি মৌলিক এবং সিদ্ধান্তকর কথা সামনে এসে যায়, আর তা হচ্ছে, দুনিয়ায় যে কোনো বিশ্বাসের পেছনে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তি নেই, আর এই কারণে অন্য কোনো বিশ্বাসের কোনো স্থায়িত্বও নেই। অতএব, কোনো মত ও পথের পক্ষে অন্য যেসব দলীল-প্রমাণ, যুক্তি যা-ই পেশ করা হোক না কেন, তা আপেক্ষিক, তুচ্ছ ও দুর্বল– এটা যে কতো বড়ো সত্য কথা তা যতো বেশী চিন্তা করা হবে ততো বেশী অনুধাবন করা যাবে।

এরপর মানব জীবনের পাতাগুলোর মধ্য থেকে আর একটি পাতা ওল্টানো হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, মানুষ যখন সুখে থাকে এবং আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকে, তখন তার প্রাণবন্ততা, দেহ সৌষ্ঠব এবং আন্তরিকতা তাকে বেশী দূরের জিনিস চিন্তা করতে দেয় না। কিন্তু যখন অচিরেই এসব আবেগ উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে আসে, তখন চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে নানা প্রকার সংকট-সমস্যা। এভাবে, জীবন সায়াহ্নে বা রোগব্যাধি ও সংকট সমস্যায় ভরা কঠিন দিনের সংস্পর্শে এসে সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন সে কষ্ট পেতে থাকে দারুণ আত্মশ্লাঘায়, তখন পরম করুণাময় আল্লাহর রহমত পাবে বলে আর কিছুতেই মনে করতে পারে না। তাই, এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন আমি মহান আল্লাহ মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায়। যখন তাদের আচরণের কারণে তারা বিপদগ্রস্ত হয় তখন তারা চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে যায়।'

এ আয়াত এমন এক ব্যক্তির ছবি তুলে ধরেছে যার জীবনের কোনো স্থায়িত্ব নেই। যে এমন কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির হয়ে থাকে না যে, সকল কাজ তার সেই অবস্থানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। সে মানে না এমন কোনো সূক্ষ্ম মানদন্ড, যা নানা প্রকার বিপদ আপদের মধ্যে পরিবর্তন হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করবে। আর এখানে যেসব মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলা

হয়েছে তারা ঈমানের মানদন্ডের ওপর টিকে থাকে না এবং ঈমানের মাপকাঠিতে নিজেদের পরিমাপও করে না। তারা আল্লাহর রহমত লাভ করে কৃতজ্ঞ হয় না; বরং সুখের দিনে চরম অহংকারী কোনো ব্যক্তির মতো তারা এমন খুশী হয়ে যায় যা তাদের কর্তব্য কাজ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, ভুলিয়ে দেয় তাদের অস্তিত্বের কথা, ভুলিয়ে দেয় তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তখন তারা একেবারে আনন্দ ফুর্তির মধ্যে ডুবে যায় এবং আনুগত্য দানের মাধ্যমে নেয়ামতদাতার কোনো শোকরগোযারী তারা করে না। এমতাবস্থায় তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, এসব নেয়ামতের মধ্যে রেখে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। তারপর যে কোনো সময়ে তিনি চাইবেন, তাদের লাগাম ছাড়া চালচলন এবং অনিয়ন্ত্রিত কাজের কারণে তাদের পাকড়াও করবেন। অবশ্য কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করাটা আল্লাহর এক মহা হেকমত। তারা হতাশ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা দূর করবেন না, যেহেতু তারা আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী করে না এবং আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। আসলে এরা আল্লাহর নিয়ম জানে না এবং তাঁর হেকমতও বুঝে না, এরা হচ্ছে সেই জাতি যাদের কাছে সঠিক কোনো জ্ঞান নেই। তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকটাই শুধু জানে।

সুখ দুঃখ, সচ্ছলতা অসচ্ছলতা সবই আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে

এরপর আসছে অত্যন্ত অপ্রিয় এক প্রশ্ন। যার মাধ্যমে ওদের কাজের প্রতি ভীষণ বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে। বিস্ময় প্রকাশ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভংগির প্রতি তারা সংকীর্ণতা, দূরদৃষ্টির অভাব নিজেরা নাফরমান হওয়ার এবং ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হওয়ার কারণে তারা বড় কোনো আশা করতে পারে না। কিন্তু সুখে দুঃখে, সুদিন দুর্দিনে, সচ্ছলতা ও অভাবের দিনে যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের হৃদয়ের মধ্যে তাদের অজান্তেই এমন এক দাবী সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাদের আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমা ও পুরস্কারের নেয়ামত দান করবেন, যেহেতু মহা দয়াময় আল্লাহর এটাই চিরন্তন নিয়ম। তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে রুজু হয়ে থাকে, এ জন্যে তাদের অন্তর তাঁর রহমত লাভের আশায় সর্বদা ভরপুর থাকে। তারা বিশ্বাস করে, যতো কঠিন পরীক্ষাই তাদের জীবনে আসুক না কেন, একদিন না একদিন তাদের এ পরীক্ষার অবসান হবেই এবং তখনই তাদের ওপর মহান আল্লাহর অপার করুণারাশি নেমে আসবে। তারা আরও বিশ্বাস করে, রেযেক প্রশস্ত করা ও সংকীর্ণ করা– এটা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের চিরন্তন এক নিয়ম ও হেকমত অনুযায়ী চক্রাকারে আসে, সব সময়ে হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে না বলেই বুঝে না।

'ওরা কি দেখছে না যে, আল্লাহ তায়ালা রেযেক প্রশস্ত করেন এবং তিনিই সংকীর্ণ করেন।'

সুতরাং সচ্ছলতা ও প্রশস্ততার সময়ে লাগাম ছাড়া ফুর্তি করা বা অহংকার করা তার কাজ নয়, আর অভাব অভিযোগের সময় হতাশ হয়ে যেতে হবে এবং হাল ছেড়ে দেয়া হবে– এটাও কোনো বুদ্ধিমানের জন্যে উপযোগী হতে পারে না। এটা করা হলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হেকমতের একটি দিকই দেখা হবে মাত্র। অন্য দিকটি নযরের বাইরে থেকে যাবে। একজন মোমেন অবশ্যই একথা জানে ও বুঝে যে, সব কিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া, আর এ অবস্থার মধ্যে যতো পরিবর্তনই আসুক না কেন, অবশেষে আল্লাহর নিয়মই টিকে থাকবে এবং তারই ব্যবস্থা বিরাজ করবে সর্বত্র। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই রয়েছে এর মধ্যে বহু নিদর্শন সে জাতির জন্যে যারা ঈমান রাখে।'

আর যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীনই রেযেকের দুয়ার খুলে দেন এবং তিনিই বন্ধ করেন, তখন এটাও বুঝা সহজ হয় যে, তাঁর নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী তিনিই দান করেন এবং (যার জন্যে

ইচ্ছা, তার জন্যে) তিনি রেযেকের ভান্ডার সংকুচিত করে দেন। তিনি মানুষকে জানান তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধির উপায়সমূহ সম্পর্কে এবং কিভাবে তারা লাভবান হবে সে পন্থাও তিনিই তাদের জানিয়ে দেন। এটা তাদের খেয়াল খুশীমতো হবার নয়; বরং যেভাবে আল্লাহ তায়ালা চাইবেন ও তাদের পরিচালনা করবেন সেভাবেই তা হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং আত্মীয় পরিজনের হক, সর্বহারা ব্যক্তির হক আদায় করো......... তারাই হবে এমন ব্যক্তি, যাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে।'

যতো সম্পদ পৃথিবীতে আছে সব কিছুর মালিক এক আল্লাহ তায়ালা, তিনি এ সম্পদ তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে (পর্যাপ্ত পরিমাণে) দেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মালিক হিসেবে সম্পদের ব্যবহারকারী প্রথম পক্ষ তিনি। কাজেই তিনি এসব কিছু বিভিন্নভাবে বন্টন করতে গিয়ে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের জন্যে কিছু হিস্‌সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সেই হিসসার নাম রেখেছেন হক বা অধিকার। অতপর সে পাওনাদারদের অভিহিত করেছেন, 'যাল-কোরবা, মিসকীন ও ইবনে সাবীল বলে।' এর পর যাকাতদান নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক (সম্পদশালী) লোকের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হতো না আর তার পাওনাদারদেরও সীমিত করে দেয়া হতো না, যদি না প্রথম ও মূল সত্যটা প্রকাশ করা হতো যে, সম্পদ সম্পত্তি সব কিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা। এই মালিকানা থেকেই তো তিনি সবার জন্যে রেযেক সরবরাহ করেন। অপরদিকে অভাবগ্রস্ত দলটিকে মূল মালিকের কাছ থেকে তিনি হকদার বা পাওনাদার বানিয়েছেন। সত্যিকারের সেই সম্পদ তিনি অন্য কারো হাত দিয়ে ওদের কাছে পৌঁছে দেন। এই সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে ইসলামী মূলনীতি রয়েছে। এই মূলনীতি সামনে রেখেই ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনের শাখা-প্রশাখাগত আইনগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। অতপর যতোদিন সম্পদের মালিক আল্লাহ তায়ালা আছেন, ততোদিন এভাবেই তিনি প্রথম পক্ষ হিসেবে সম্পদ তাঁর বান্দাদের মধ্যে বন্টনের কাজ চালু রাখবেন। কখনও তাদের দেবেন নতুন নতুন সম্পদ এবং কখনও বর্তমান সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেবেন, অথবা কখনও তাদের দ্বারা খরচ করাবেন, কিন্তু এমন কখনও হবে না যে, তারা স্বাধীনভাবে এবং নিজেদের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তা করতে পারবে।

বর্তমান প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা সম্পদশালীদের তাদের সম্পদ বাড়ানোর এবং সফলতা লাভ করার জন্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি জানাচ্ছেন, যাতে করে তাদের দেয়া আমানতের হক তারা সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে, আর সেই পদ্ধতিটি হচ্ছে, আত্মীয়স্বজন, মেসকীন ও মোসাফেরদের দান করা, আর খরচ করা আল্লাহর পথে তথা এক সার্বজনীন খাতে। এরশাদ হচ্ছে,

এটাই হচ্ছে সেসব লোকদের জন্যে উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এবং প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত। ওদের মধ্যে অনেকে আছে যারা তেলা মাথায় তেল দিয়ে তাদের সম্পদ বাড়াতে চায়, অর্থাৎ তারা সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে সচ্ছল লোকদের উপহার উপঢৌকন দান করে, এভাবে বিত্তশালীদের সম্পদ আরো বহুগুণ বাড়তে থাকে। এর ফলে সত্যিকারে কোনো অগ্রগতি লাভ করা যায় না। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'আর যা কিছু সূদ মানুষের সম্পদ আরো বাড়ানোর জন্যে তোমরা দিয়েছো, তার দ্বারা কিছু বাড়লেও বাড়তে পারে, কিন্তু তার দ্বারা আল্লাহর কাছে কিছুই বাড়বে না।'

আসলে এই মূল কথাটাই বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি যখন কারো সম্পদ বাড়াতে চান তখনই তা বাড়ে। মানুষ তার বিধানের বাইরে অন্য যে কোনো পদ্ধতিতেই সম্পদ বাড়াতে চাক না কেন তা পারবে না। মানুষ তো মনে করে, সূদভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে সম্পদ বাড়ে, কিন্তু সে এটা চিন্তা করতে

পারে না যে, সম্পদ বাড়ানোর বহু পদ্ধতির মধ্যে এটা একটা পদ্ধতি হতে পারে, এটাকেই একমাত্র পদ্ধতি মনে করাটা এক মারাত্মক ভুল ও শয়তানী অসঅসা। আর এ পদ্ধতি হারাম বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে তাদের সামনে সম্পদ বৃদ্ধির সঠিক ও সুন্দর পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত তোমরা দাও, তোমাদের মধ্যে এসব লোকেরাই সম্পদ বৃদ্ধিকারী হয়।'

সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পন্থা জানিয়েছেন তা হচ্ছে, কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা চান, নিছক তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সম্পদ খরচ করা বা কাউকে দান করা হোক। এখন চিন্তা করার বিষয়, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর রেযামন্দি হাসিল করার উদ্দেশ্যেই সম্পদ ব্যবহার করবে, তার সম্পদ বৃদ্ধি করতে কি মহান পরওয়ারদেগার সক্ষম নন? তিনিই সকল মানুষকে দান করেন না, আর কারও থেকে সম্পদের দরজা বন্ধ করতে চাইলে তিনি কি তা পারেন না? অবশ্যই তিনি তা করতে পারেন। সুতরাং সহজেই আমরা এটা বুঝতে পারি যে, তিনি তাদের সম্পদ সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারেন ও করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। যেসব সূদখোর মানুষের সন্তুষ্টি চায় তাদের সম্পদ আল্লাহ তায়ালা (শেষ পর্যন্ত) কমিয়ে দেন।

এ তো গেলো দুনিয়ার পরিণতি, তারপর তো রয়েছে আখেরাতের শাস্তি। সেখানে এ শাস্তি বহু বহু গুণে বাড়িয়ে তাদের কষ্ট দেয়া হবে। এই হচ্ছে এখানে ও ওখানে তাদের লাভজনক ব্যবসা।

কিভাবে মানুষ রেযেক লাভ করে এবং কিভাবে মানুষ উপার্জন করে, সে বিষয় থেকে বুঝা যায় তাদের শেরেকের দৃষ্টিভংগি কি। এই শেরেকের প্রভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসে কি দুঃখ দুর্দশা ও অশান্তি, তা তাদের দিকে ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের দিকে তাকালে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। ইতিপূর্বে মোশরেকদের পরিণতি যা হয়েছে তার দিকে তাকালে বুঝা যায় তাদের ভবিষ্যৎ কতো কঠিন। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের, তারপর তোমাদের রেযেক দিয়েছেন, এরপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তারপর তিনিই তোমাদের যিন্দা করবেন......... বলো, পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করো, অতপর দেখো, কেমন হয়েছে পরিণতি সেসব লোকের, যারা ইতিপূর্বে গুজরে গেছে। তাদের অধিকাংশ মোশরেক ছিলো।'

তিনি পূর্বেকার সেসব অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের কথা পেশ করছেন এবং তাদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে হাল যমানার মোশরেকদের সম্বোধন করছেন, যেহেতু তারা জানে না, বুঝে না এবং চিন্তাও করে না যে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের বাস্তবে অস্তিত্ব দান করেছেন, অথবা একথাও তারা ধারণা করতে পারে না যে, তাদের দাবী করা মাবুদদের ক্ষমতায় আর কারও অংশ আছে। এ জন্যে তাদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রুযির ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। তিনিই তাদের মৃত্যু দেবেন এবং তিনিই তাদের পুনরায় যিন্দা করবেন। গোটা সৃষ্টি জগতের সবাই একথা স্বীকার করে যে, তাদের রেযেক দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো হাতে নেই। আর সম্পদ সম্পত্তি যা মানুষ পেয়েছে এসব তো আল্লাহর দেয়া অমানত। এ ব্যাপারে কোরআনের দলীল ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ তারা হাযির করতে পারে না। এখন রইলো মৃত্যুর পরে আবার তাদের যিন্দা করে তোলার কথা। এ বিষয়ে

তারা চিন্তা করে যে, এটা সংঘটিত হতেও পারে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মরণ পারের যিন্দেগীকে তাদের দিকে টেনে আনছেন বলে তারা বুঝতে পারে। তাদের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে চেতনা দান করেছেন তাতে তারা বুঝতে পারে যে, সকল কিছুরই প্রতিক্রিয়া আছে। দুনিয়ায় যা কিছু তারা করছে তার পূর্ণ প্রতিক্রিয়া এখানে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এ প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজনেই মৃত্যুর পর আর একটি যিন্দেগী দরকার।

তারপর তাদের তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'এসব কাজ করার মতো কেউ কি আছে তোমাদের সে কাল্পনিক মাবুদদের মধ্যে?'

এ কথার কোনো জওয়াব আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে চান না। কারণ, এক. তাদের কোনো জওয়াব নেই। দুই. তাদের এই যুক্তিহীন কাজের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার জন্যেই তাদের এসব বলা হচ্ছে। এরপর যাবতীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করছেন, 'মহান আল্লাহ পবিত্র সেসব ব্যক্তির সাহায্য নেয়ার দুর্বলতা থেকে, যাদের ওরা তাঁর সাথে শরীক বানায়।'

বিপর্যয়ের সময় মোমেনের করণীয়

তারপর তিনি তাদের সামনে তুলে ধরছেন জীবনে বেঁচে থাকার কাজ কর্ম ও আয় রোজগার করার নিয়ম কানুনগুলো। তাদের অন্তরের মধ্যে আগত বিশৃংখলা এবং তাদের আকীদাসমূহের ভ্রান্তি সম্পর্কে জানাচ্ছেন, জানাচ্ছেন তাদেরকে তাদের সেসব কাজ সম্পর্কে যা পৃথিবীতে অশান্তি ডেকে আনে এবং পৃথিবীর স্থল ও পানি ভাগের সর্বত্র অশান্তি বিশৃংখলায় ভরে দেয়, তারা মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতা ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী বানায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর স্থলভাগ ও পানিভাগের সবখানে অশান্তি বিশৃংখলা তখন, যখন মানুষ নিজেকে তার ভালো মন্দের মালিক বানিয়ে নেবে এবং নিজের হাতেই নিজের সকল কল্যাণের ব্যবস্থা করে নিতে চাইবে।'

অতপর এসব বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং এ অশান্তি হঠাৎ করে আসবে তা নয়, বরং এটা তো আল্লাহর নিয়ম ও ব্যবস্থা অনুসারে হবে .... 'যাতে করে তিনি তাদের স্বাদ গ্রহণ করান ওই সব অপকর্মের যা ওরা করেছে।' তখন তারা সে অশান্তি ও বিশৃংখলা ঠেকানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু তখন তাদের আগুনের সেঁক দেয়া হতে থাকবে এবং এই আগুনের আযাবের কঠিন কষ্টের মধ্যে তারা থাকবে 'যেন তারা ফিরে আসে।' অর্থাৎ, তখন তারা আযাব ঠেকানোর জন্যে দৃঢ়ভাবে মনস্থ করবে ভালো কাজের দিকে এবং মযবুত পথের দিকে। ফিরে যেতে চাইবে আল্লাহর কাছে।

এ ভাষণের শেষের দিকে সে নাফরমানদের সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তাদের সেই একই বিপদ-আপদ স্পর্শ করবে যা মোশরেকদেরও তাদের পূর্বে স্পর্শ করেছে, আর তারা তাদের অনেকের বাড়ীঘরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, ভ্রমণ করো পৃথিবীর বুকে, তারপর দেখো পূর্ববর্তীদের পরিণতি কি হয়েছিলো, তাদের অধিকাংশই মোশরেক ছিলো।'

পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করার সময় পূর্ববর্তীদের ওপর শাস্তির এতোসব চিহ্ন তাদের নযরে পড়ে যা দেখে আবার সে পথে চলার মতো আর তাদের কোনো সাহস থাকে না।

এই অধ্যায়ের মধ্যে আর একটি পথের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যে পথটি তার পথিকদের কখনও বিভ্রান্ত করে না, সে পথ দেখায় এমন একটি দিগন্ত, যা তার আকাংখীকে কখনও বিমুখ করে না। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং সেই মযবুত দ্বীনের ওপর দাঁড়িয়ে যাও সে কঠিন দিনটি আসার আগে, যা এসে গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে আর কেউ ফেরাতে পারবে না। সেদিন মানুষ সবাই বিভক্ত হয়ে

(ছুটোছুটি করতে) থাকবে। যে কুফরী করবে তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে ভালো কাজ করবে সে তার নিজের জন্যে আরামের বিছানাই তৈরী করে নেবে।'

মহান আল্লাহর সরল সঠিক দ্বীনের আনুগত্য অনুসরণের বিষয়টা প্রকাশ করার জন্যে এখানে যে ভাষা ও ভংগি অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, এই আনুগত্য হতে হবে পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক, একনিষ্ঠ ও আপোষহীন, স্থায়ী ও টেকসই। বলা হয়েছে, 'অতপর তুমি নিজেকে সরল সত্য দ্বীনের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখো।' ....আল্লাহর এই উক্তিতে পরিপূর্ণ আনুগত্যকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, আনুগত্য যাতে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং সর্বাত্মক ও সঠিক আনুগত্যের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ার জন্যে অভিলাষী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় এ নির্দেশ ইতিপূর্বেও একবার এসেছে। সেখানে মানুষের রকমারি খেয়ালখুশী এবং রকমারি দল ও শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোশরেকেরা আল্লাহর সাথে যাদের শরীক করে তাদের জীবিকা ও তার বহুগুণ বৃদ্ধি প্রসংগে, শেরেকের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও বিকৃতি প্রসংগে, পৃথিবীতে মোশরেকদের শোচনীয় পরিণতি প্রসংগে এবং পৃথিবীতে মানুষ যে তার নিজ কর্মদোষেই বিপর্যয়ের শিকার হয় সেই প্রসংগে এখানে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে আখেরাতে মোমেন ও কাফেররা কি ধরনের কর্মফল ভোগ করবে সে কথাও আলোচিত হয়েছে। আর তাদের কেয়ামতের দিন সম্পর্কেও সাবধান করে বলা হয়েছে যে, সমগ্র মানব জাতি সেদিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং সেদিন আল্লাহর প্রদেয় কর্মফল থেকে কেউ রেহাই পাবে না। বলা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি কুফরী করবে তার দায় দায়িত্ব তার ওপরই পড়বে, আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে সে নিজের কল্যাণের পথই সুগম করবে।' (আয়াত ৪৪)

এখানে 'ইয়ামহাদু' শব্দটা 'মাহদুন' থেকে এসেছে। মাহদুন অর্থ বিছানা। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম, যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে সে নিজের শান্তির পথ সুগম করবে, যে বিছানায় সে আরামে শয়ন করতে পারবে, তার পথই উন্মুক্ত করবে। এভাবে সৎকাজের প্রকৃতি ও তার ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বস্তুত যে ব্যক্তি সৎকাজ করে সে ঠিক সৎকাজ করার মুহূর্তেই নিজের সুখ শান্তির পথ প্রশস্ত করে, তার পরে নয়। আয়াতের মর্মার্থও এটাই। আর এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী ৪৫ নং আয়াতে।

'যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ বলে সৎকর্মশীল মোমেনদের প্রতিদান দেন.......।' 'নিজ অনুগ্রহ বলে'- এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কোনো মানুষ নিছক নিজের সৎকর্মের জোরে বেহেশতের অধিকারী হতে পারবে না। সে যতো সৎকাজই করুক না কেন, তাতে আল্লাহর অনুগ্রহের একটা অংশেরও শোকর আদায় হবে না।

সৃষ্টিজগতের চারিদিকে আল্লাহর নিদর্শন

এরপর শুরু হয়েছে আরেকটা অধ্যায়। এতে আল্লাহর কতিপয় নিদর্শন, তাঁর অনুগ্রহ অনুদান, বিশেষত তাঁর দেয়া জীবিকা ও ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা ইসলামী বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামতের কিছু অংশ মানুষ জানে এবং কিছু অংশ জানে না। ফলে তারা শোকর করে না ও হেদায়াত লাভ করে না। (আয়াত ৪৬, ৫১)

এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ কয়েকটি বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বিষয়গুলো হলো, বাতাসকে সুসংবাদবাহক করে পাঠানো, রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহকারে প্রেরণ করা, মোমেনদের রসূলদের দ্বারা সাহায্য করা, মৃত মাটিকে জীবনদানকারী বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করা। এ জিনিসগুলোর সমাবেশ খুবই তাৎপর্যবহ। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ

সব কটা জিনিসই আল্লাহর অনুগ্রহের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের আওতাভুক্ত। যে প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে মহাবিশ্ব চলে, যে জীবন বিধান নিয়ে রসূলরা আগমন করেন এবং মোমেনদের সাহায্য করার যে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, এ সব কটার পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, এ সব কটা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও নেয়ামতের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। এগুলোর ওপর মানুষের বাঁচা মরা নির্ভরশীল এবং সর্বোপরি মূল প্রাকৃতিক বিধানের সাথে এগুলোর যোগসূত্র বিদ্যমান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি বাতাসকে সুসংবাদবাহী করে পাঠান।' অর্থাৎ বৃষ্টির সুসংবাদবাহী। উল্লেখ্য যে, আরবরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোন মেঘ বৃষ্টি দেবে তা জানতো এবং সে ধরনের মেঘ দেখেই বৃষ্টির ব্যাপারে আশ্বস্ত হতো। 'যাতে তোমাদের নিজের রহমতের স্বাদ উপভোগ করান।' অর্থাৎ উৎপাদন ও ভূমির উর্বরতার আকারে বৃষ্টির সুফল ভোগ করান। 'আর যাতে তার আদেশে নৌকা চলাচল করতে পারে।'

এটা দু'ভাবে হতে পারে। নৌকায় বাদাম লাগিয়ে তাতে বাতাসের শক্তি প্রয়োগ করা, অথবা বৃষ্টির পানিতে নদী নালা সৃষ্টি হয়ে তাতে নৌকা চলাচল করা। এ সব সত্তেও নৌকার চলাচল অনুসারে হয়ে থাকে, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং যার ফলে তিনি বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন নৌকাকে এরূপ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, তা হালকা হওয়ায় পানির ওপর ভাসে ও চলে এবং বাতাস তাকে ধাক্কা দিয়ে স্রোতের সাথে ও বিপরীতে চালাতে পারে। তিনি সকল জিনিসকেই এভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

'যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো' .... অর্থাৎ বাণিজ্যিক সফর, কৃষি কাজ ও লেনদেনের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতে পার। এই সমস্ত উপার্জনই আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা শোকর করো।' অর্থাৎ এই সমস্ত রকমারি উপার্জনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর যে নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করছো, তার শোকর করো। এ কথার মধ্য দিয়ে মহান দাতা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের বিনিময়ে বান্দাদের কী করা উচিত, সে ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে আভাস দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সুসংবাদ সহকারে মেঘমালা প্রেরণ করার মতোই আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহকারে নবীদের প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

'আমি তোমার পূর্বে বহু রসূলকে পাঠিয়েছি তাদের নিজ নিজ জাতির কাছে।' (আয়াত ৪৭)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ বৃষ্টিবাহী মেঘমালাকে যেভাবে স্বাগত জানায় এবং যেভাবে বৃষ্টি ও পানি দ্বারা উপকৃত হয়, তার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকতর উপকারী রসূলদের সেভাবে স্বাগত জানায়নি এবং সেভাবে তা দ্বারা উপকৃত হয়নি। তারা রসূলদের সাথে আচরণে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটা দল তাদের প্রতি ঈমান তো আনেইনি, উপরন্তু তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে এবং অন্যদের তাদের ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছে। আরেক দল তাদের ওপর ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করেছে, তাঁর রহমত ও নেয়ামতের শোকর আদায় করেছে, তাঁর ওয়াদায় আস্থা স্থাপন করেছে এবং অবিশ্বাসীদের হাতে নির্যাতন সহ্য করেছে। তারপর আল্লাহর ন্যায়বিচার ও তাঁর অলংঘনীয় ওয়াদা মোতাবেক ফলাফল লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য ছিলো।'

মহান আল্লাহ মোমেনদের সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সাহায্য করাকে মোমেনদের অধিকার ও নিজের অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এর চেয়ে বিস্ময়কর

ব্যাপার আর কী থাকতে পারে? তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, সন্দেহাতীতভাবে এ সাহায্যের আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এ আশ্বাস স্বয়ং সেই আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন, যিনি সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর, মহাপরাক্রমশালী, যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এবং মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। তাঁর এ আশ্বাস তাঁর নিজের সেই সিদ্ধান্তেরই প্রতীক যা কখনো রদ হয় না, তার সেই শাশ্বত নীতিরই পরিচায়ক যা কখনো লংঘিত হয় না এবং তাঁর সেই প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রতিফলক, যা সমগ্র বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের বিবেচনায় এই সাহায্য ও বিজয় কখনো কখনো বিলম্বিত মনে হয়। কেননা তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর হিসাব নিকাশ থেকে আলাদা এবং তাদের বিচার বিবেচনা আল্লাহর বিচার বিবেচনা থেকে ভিন্ন। তিনি হচ্ছেন মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি যে সময়ে বাস্তবায়িত করা তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ম নীতি অনুযায়ী ভালো বলে মনে করেন, ঠিক সে সময়ই তা বাস্তবায়িত করেন। তাঁর বিচার-বিবেচনা ও সময় নির্ণয়ের নিগূঢ় রহস্য মানুষ কখনো উপলব্ধি করতে পারে আবার কখনো পারে না, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই কল্যাণকর এবং তাঁর নির্ধারিত সময়ই সঠিক। তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত এবং ধৈর্যশীলরা নিশ্চিত বিশ্বাসে তার অপেক্ষায় থাকে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই বাতাসকে চালিত করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, নির্জীব মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সেভাবেই মৃতদের আখেরাতে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সকল ক্ষেত্রে একই নিয়ম এবং একই পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে একই ধারাবাহিকতা চলছে।

'মহান আল্লাহ বাতাসকে চালিত করেন।' এটাই বিশ্বজগত ও সৃষ্টির পরিচালনায় তাঁর নীতির দাবী। 'অতপর সেই বাতাস মেঘমালাকে চালিত করে।' এই মেঘমালা পৃথিবীর জলভাগ থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে উত্থিত পানিকে ধারণ করে।

'অতপর আকাশে সেই মেঘমালা যেভাবে ইচ্ছা করেন ছড়িয়ে দেন।' অর্থাৎ মেঘমালাকে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত করেন।

'এবং তাকে টুকরো টুকরো করেন।' কিছু মেঘকে ঘনীভূত ও একত্রিত করে একটার ওপর আরেকটা স্তূপ করে রাখেন, অথবা কিছু মেঘের সাথে অপর কিছু মেঘের সংঘর্ষ ঘটান, অথবা কোনো কোনো মেঘের ভেতর থেকে বিদ্যুত বিচ্ছুরিত করেন।

'অতপর তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে পানি বেরিয়ে আসছে।' এখানে 'ওয়াদ্‌ক' শব্দের অর্থ হলো, মেঘমালার ভেতর থেকে নেমে আসা বৃষ্টি।

'অতপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষাতে চান বর্ষাণ, তখন তারা আনন্দিত হয়।'

যেসব অঞ্চলের মানুষ জীবন ধারণের জন্যে বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল তারা এই আনন্দের সাথে যতোটা পরিচিত, অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ ততোটা নয়। আরবরা এই আনন্দের সাথে সর্বাধিক পরিচিত। কেননা তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে আকাশের পানির ওপর নির্ভরশীল। তাদের কবিতা ও ইতিহাসে এর যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

'বৃষ্টির পানি আসার আগে তারা থাকে হতাশাগ্রস্ত।'

এই হচ্ছে বৃষ্টি নামার আগে তাদের অবস্থার অর্থাৎ তাদের হতাশার বিবরণ। এরপর তারা বৃষ্টি এলে আনন্দিত হয়।

'অতএব আল্লাহর রহমতের সুফল দেখো।'.............

অর্থাৎ হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার করে দেখো। কিভাবে তা নির্জীব মনে ও নির্জীব মাটিতে জীবনের সঞ্চার করে। বস্তুত এটা একটা চাক্ষু সত্য। এর জন্যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হয় না। কেবল চোখ মেলে দেখা ও চিন্তা করাই যথেষ্ট, এ জন্যে এটাকে আখেরাতের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে একটা যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা কোরআনের যুক্তিতর্কের একটা বিশেষ পদ্ধতি। প্রকৃতির চাক্ষুস দৃশ্যাবলী ও জীবনের বাস্তব অংগন থেকে এর উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে।

'বস্তুত সেই আল্লাহ তায়ালাই মৃতকে জীবন দানকারী এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'

এই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রহমতের সুফল। এটা আখেরাতে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

ঈমানদাররাই শুধু আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায়

এই সত্যটা তুলে ধরার পর পানি আনয়নকারী বাতাস দেখে যারা আনন্দিত হয় এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হওয়ার সময় যারা আল্লাহর রহমতের সুফল লাভ করে আশ্বস্ত হয়, তাদের চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা যে বাতাস দেখেছে, তা যদি পানির পরিবর্তে বালি ও মাটি বহনকারী হতো, যা প্রাণী-উদ্ভিদ ও ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে দেয়, তাহলে তারা কী করতো, সে কথা বলা হচ্ছে।

'আর আমি যদি বাতাস পাঠাতাম এবং তা যদি তারা হলুদ দেখতো, তাহলে তারা কুফরীই চালিয়ে যেতো।'

অর্থাৎ ক্রোধ ও হতাশায় তারা কুফরী করতো। আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণও করতো না, বিপদ দূর করার জন্যে তাঁর কাছে কেঁদে কেদে দোয়াও করতো না। আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্টে যারা বিশ্বাস করে না, তাদের অবস্থাই এরকম হয়ে থাকে। আল্লাহর প্রত্যেকটা কাজের পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। প্রত্যেকটা ঘটনার পেছনে যে বিশ্বজগতের সমন্বয় বিধানকারী আল্লাহর হাত রয়েছে এবং সে হাতই যে সর্বাত্মক বিশ্ব সমন্বয়ের আওতায় প্রতিটা ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করে না।

মানুষ প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী মোতাবেক নিজেকে পরিবর্তিত করে, চারপাশের প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখেও তা দ্বারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করে। দেখা ঘটনাবলী ও দৃশ্যাবলীর পশ্চাতে আল্লাহর কী মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে তা উপলব্ধি না করে অধোপতনের কত নিম্নস্তরে পৌছতে পারে, এ পর্যন্ত তার বিবরণ দেয়ার পর এবার স্বয়ং রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে, উক্ত অধোপতিত মানব সমাজের অনেকের ক্ষেত্রেই তার হেদায়াতের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

'তুমি মৃতদের কথা শোনাতে পারবে না................' (আয়াত ৫২-৫৩)

এ দুটো আয়াতে তাদের চিত্রিত করা হয়েছে মৃত হিসাবে, যার জীবন নেই, চিত্রিত করা হয়েছে বধির হিসাবে যার শ্রবণশক্তি নেই, তাকে চিত্রিত করা হয়েছে অন্ধ হিসাবে, যার দৃষ্টিশক্তি নেই এবং যে পথের সন্ধান পায় না। বিশ্ব প্রকৃতি থেকে যার চেতনা ও অনুভূতির যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এবং ছিন্ন হওয়ার কারণে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মবিধি বোঝে না, সে যথার্থই মৃত। তার কোনো জীবনীশক্তি নেই। তার জীবন নিছক একটা পাশবিক জীবন– বরং তার চেয়ে ও ভ্রষ্ট এবং হীন। একটা পশুও তার জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি দ্বারা চালিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে তার স্বভাব কখনো তাকে বিপথগামী করে না বা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর

নিদর্শনাবলীর আওয়ায শুনতে পায় না, তার কান থাকলেও সে বধির। আর যে ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে ছড়ানো আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পায় না, তার পশুর মতো দুটো চোখ থাকলেও আসলে সে অন্ধ।

'তুমি তো শুধু তাকেই শোনাতে পারবে, যে আমার আয়াতগুলোতে বিশ্বাসী।'

বার্ধক্যে এসে শিশুর মতো হয়ে যাওয়া

বস্তুত এ জাতীয় লোকেরাই দাওয়াত শোনে। কেননা তাদের হৃদয় জীবন্ত, তাদের চোখ খোলা। তাদের বোধশক্তি নিখুঁত। তাই তারা শোনে ও ইসলাম গ্রহণ করে। দাওয়াত তো মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সচকিত ও সচেতন করে মাত্র। তাই সে দাওয়াত গ্রহণ করে।

পরবর্তী অধ্যায়ে একটা নতুন বিষয় আলোচিত হয়েছে, এটা চারপাশের প্রাকৃতির দৃশ্যাবলী সংক্রান্ত নয়, বরং মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্ত্বার সাথে এবং তার পার্থিব জীবনের ক্রমবিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতপর ইহকালীন জীবন থেকে আলোচনা পরকালীন জীবন পর্যন্ত গড়িয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এক দুর্বল অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন....।' (আয়াত ৫৪-৫৭)

এ এক সুদীর্ঘ সফর। এর প্রথমাংশ দেখা যায় জীবনের ইহকালীন অংশ। আর শেষাংশ এমনভাবে চিত্রিত দেখা যায়, মনে হয় যেন তা চোখের সামনেই রয়েছে। যার জীবন্ত মন, জাগ্রত শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি আছে, তার জন্যে এ সফর শিক্ষাপ্রদ।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুর্বল অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন' এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুর্বল করে বা দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন।' এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, দুর্বলতা হলো তাদের সত্ত্বার একেবারে প্রথম অবস্থা। আর আয়াতে যে দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে, তা মানবসত্ত্বার নির্মাণে বহু বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের আভাস দেয়।

প্রথমত এটা তার দৈহিক কাঠামোর দুর্বলতার আভাস দেয়। এই দুর্বলতা সেই ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম জীবকোষের মধ্যে নিহিত, যা থেকে ভ্রুণের জন্ম হয়। এরপর ভ্রূণে ও ভ্রুণের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। মানুষ এসব স্তরে দুর্বল থাকে। এরপর আসে তার শৈশব ও কৈশোর। শৈশব ও কৈশোর থেকে উত্তরণ ঘটে যৌবনে।

এছাড়া মাটিও মানুষ সৃষ্টির একটা দুর্বল উপাদান। আল্লাহ তায়ালা যদি এই মাটির ভেতরে প্রাণ ফুঁকে না দিতেন তাহলে তার জড় বা জৈব রূপই বহাল থাকতো, যা মানবীয় কাঠামোর দৃষ্টিতে খুবই দুর্বল।

বিভিন্ন রকমের ভাবাবেগ, ঝোঁক ও হুজুগের সামনে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাও তার দুর্বলতার অন্যতম উপাদান। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আধ্যাত্মিক উপাদান ফুঁকে দেয়া না হতো এবং মানব সত্ত্বার ভেতরে বিভিন্ন যোগ্যতা ও প্রতিভার সৃষ্টি করা না হতো, তাহলে মানুষ যে কোনো প্রাণীর চেয়ে দুর্বল ও অক্ষম হতো। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে বিরাজমান যে কোনো প্রাণী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত 'ইলহাম' বা প্রজ্ঞার অনুসারী।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুর্বল অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুর্বলতা থেকে সবলতার সৃষ্টি করেছেন,.......'

ইতিপূর্বে দুর্বলতা সংক্রান্ত আলোচনায় যে যে দিক দিয়ে দুর্বলতার উল্লেখ করেছি, এখানে সেসব দিক দিয়েই সবলতা ও সক্ষমতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দৈহিক কাঠামোর সবলতা, মানবিক সত্ত্বার সবলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সবলতা।

'সবলতার পর আবারো দুর্বলতা ও বার্ধক্যের সৃষ্টি করেছেন।'

এখানে দুর্বলতা দ্বারা মানব সত্ত্বার সার্বিক দুর্বলতা বুঝানো হয়েছে। বার্ধক্য জীবনের এমন একটা স্তর, যা শৈশবের দিকে প্রত্যাবর্তনের শামিল এবং বার্ধক্যের শুরু থেকেই মানুষের ভেতরে শৈশবের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দিতে আরম্ভ করে। কখনো কখনো এর সাথে যুক্ত হয় মানসিক অধোপতন, যা ইচ্ছার দুর্বলতা থেকে জন্ম নেয়। ফলে একজন বৃদ্ধও কখনো কখনো শিশুর মতো চপল, অস্থিরমতি ও আবেগোদ্দীপ্ত হয়ে থাকে এবং নিজের আবেগ সংযত করতে পারে না। এখানে 'শাইবা' শব্দ দ্বারা বার্ধক্যের জরাজীর্ণ অবস্থার দৃশ্য ও আকৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

যারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তাদের কারো জীবনের এই স্তরগুলো অতিক্রম না করে উপায় থাকে না এবং এ স্তরগুলো নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করেও আসে না। মানব জীবনে এই স্তরগুলোর অনিবার্যতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে এক মহা পরাক্রান্ত ও প্রাজ্ঞ সত্ত্বার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছা পরিকল্পনা করেন এবং নিজের নির্ভুল জ্ঞান ও নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যে আয়ুষ্কাল, জীবন মান ও জীবন স্তরসমূহ নির্ধারণ করেন। 'যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিশালী।'

আর এই সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সৃষ্টির একই রকম সুপরিকল্পিত বিলুপ্তি ঘটাও অবধারিত। এ বিলুপ্তিকে কোরআনের নিজস্ব রীতিতে কেয়ামতের একটা দৃশ্যের মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে।

'যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, অপরাধীরা শপথ করে বলবে, তারা এক ঘন্টার বেশী অবস্থান করেনি............।'

অর্থাৎ এই দিনটার আগের সব কিছুই তাদের অনুভূতিতে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশী সময় অবস্থান করেনি। এই কসম খাওয়া তাদের কবরে অবস্থানের মেয়াদকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকতে পারে, অথবা জীবিত ও মৃত অবস্থায় পৃথিবীর সার্বিক অবস্থানকাল সম্পর্কেও হয়ে থাকতে পারে।

'এভাবেই তারা প্রতারিত হতো।'

অর্থাৎ সত্য ও বিশুদ্ধ সময় নির্ণয় করতে ব্যর্থ হতো। অবশেষে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা তাদের প্রকৃত তথ্যের দিকে ফেরাবে,

'আর যাদের জ্ঞান ও ঈমান প্রদান করা হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধান অনুসারে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো ....।' (আয়াত ৫৬)

জ্ঞান ও ঈমানের অধিকারী এই লোকেরাও দৃশ্যমান পার্থিব জীবনের অপর পারের আখেরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখতো। তারাই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রজ্ঞাময় ঈমানের অধিকারী। তারা এ বিষয়টাকে আল্লাহর জ্ঞানের কাছে প্রত্যর্পণ করছে। তারা বলছে যে, এটা আল্লাহর বিধান দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ, তা দীর্ঘ হোক বা স্বল্প হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। ওটাই ছিলো নির্ধারিত মেয়াদ এবং তা কার্যকর হয়েছে।

'এ হচ্ছে কেয়ামতের দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না।'

এরপর আখেরাতকে যারা অস্বীকার করতো, তাদের পরিণতির কথা জানিয়ে সংক্ষেপে এ দৃশ্যের যবনিকা টানা হয়েছে,

'সেদিন অত্যাচারীদের কোনো ওযর আপত্তি তাদের উপকারে আসবে না ...। (আয়াত ৫৭)

অর্থাৎ তাদের কোনো ওযর আপত্তি, দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা গৃহীত হবে না এবং কাউকে ভর্ৎসনা করে ক্ষান্ত থাকা হবে না। কেননা সেদিনটা হবে শুধু শাস্তিদানের– ভর্ৎসনার নয়।

দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের গোয়ার্তুমি

এই হতাশাব্যঞ্জক ও শোচনীয় দৃশ্য থেকে এবার কাফেরদের বর্তমান গোয়ার্তুমি ও প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যে ফিরে আসা হচ্ছে। পূর্ববর্তী দৃশ্যটা ছিলো গোয়ার্তুমি ও প্রত্যাখ্যানের শাস্তির দৃশ্য।

'আমি এই কোরআনে মানব জাতির জন্যে সব রকমের উদাহরণ দিয়েছি। ......' (আয়াত ৫৮-৫৯)

উভয় দৃশ্যের মধ্যে স্থান ও কালের বিরাট ব্যবধান। তবে তা কোরআনে পাশাপাশিই বর্ণিত হচ্ছে, যেন উভয়ে উভয়ের খুব কাছে অবস্থিত। স্থান ও কালের ব্যবধান এখানে গুটিয়ে আনা হয়েছে। মানুষ এখন পুনরায় কোরআনের সামনেই অবস্থিত। এতে সব ধরনের উদাহরণ ও সব ধরনের সম্বোধন বিদ্যমান। মন মগযকে জাগ্রত করার সব উপকরণ এতে বর্তমান। এতে হরেক রকমের প্রভাব সৃষ্টিকারী পরশ বুলানো হয়েছে, সকল মন ও বিবেককে সব পরিবেশে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্বোধন করা হয়েছে মানব মনকে সব রকমের পরিস্থিতিতে এবং সকল পদ্ধতিতে, কিন্তু এসব কিছুর পরেও কাফেররা সব নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ অস্বীকার করে। শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারীদের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং বলে, তারা বাতিলপন্থী।

'তাদের কাছে তুমি যে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসো না কেন, তারা বলবে যে, তোমরাই বাতিলপন্থী।' (আয়াত ৬০)

৬১ নং আয়াতে এই ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এভাবেই এবং এ কারণেই এসব অজ্ঞ লোকের হৃদয়ে সিল মেরে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করার জন্যে তাদের মন উন্মুক্ত হয় না। তারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের ওপর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের বোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন এবং সিল মেরে দিয়েছেন। তারা এর উপযুক্ত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের মন ও বিবেকের খবর জানেন।

এবার আসছে সূরার সর্বশেষ বক্তব্য। ইতিপূর্বে মোশরেকদের প্রকৃতি, ইতিহাস, তাদের সত্ত্বার অভ্যন্তরের তথ্যসমূহ এবং তাদের সামষ্টিক জীবনের তথ্যসমূহ জানিয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এসব সত্তেও তারা কুফরী করেছে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তাই সূরার সর্বশেষ আয়াতে রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

'অতপর ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' ..... (আয়াত ৬২)

কষ্টকর দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার সময় কখনো কখনো মনে হয় এ পথের বুঝি শেষ নেই। এক্ষেত্রে মোমেনদের পথ চলার একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকে ধৈর্য, আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতিতে অটুট আস্থা এবং সন্দেহ-সংশয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা ঝেড়ে ফেলে স্থিতিশীল হওয়া। অন্যেরা যতোই অস্থির হোক, সত্যকে যতোই মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে যতোই সংশয় পোষণ করুক, মোমেনদের ধৈর্য, প্রত্যয় ও স্থিরতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ মানুষ প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। প্রত্যয়ের উপকরণ তাদের হস্তগত নয়। যারা মোমেন এবং যারা আল্লাহর রজ্জু ধারণ করে রেখেছে, তাদের পথ ধৈর্য, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের পথ। এ পথ যতো দীর্ঘ হোক এবং এর গন্তব্যস্থল যতোই দৃষ্টির আড়ালে থাকুক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

এভাবেই শেষ হচ্ছে সূরা আর রোম, যার শুরুই হয়েছিলো কয়েক বছর পর রোমকদের বিজয় ও মোমেনদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে। সূরাটা শেষ হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। অবিশ্বাসীদের সমস্ত উপহাস ও বিভ্রান্তিকর অপচেষ্টার ওপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশের মধ্য দিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এ সূরার সূচনা ও সমাপ্তি সুসমন্বিত। আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি– যা কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না, তা ঈমানদারদের অন্তরে বদ্ধমূল করা ও তাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে দৃঢ়তর করার মধ্য দিয়ে সূরা আর রোম সমাপ্ত হলো।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড

সূরা আল ফাতেহা ও

সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড

সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড

সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড

সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড

সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড

সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড

সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড

সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড

সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড

সূরা ইউনুস

সূরা হুদ

১১তম খন্ড

সূরা ইউসুফ

সূরা আর রা'দ

সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড

সূরা আল হেজ্‌র

সূরা আন নাহ্‌ল

সূরা বনী ইসরাঈল

সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড

সূরা মারইয়াম

সূরা ত্বাহা

সূরা আল আম্বিয়া

সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড

সূরা আল মোমেনুন

সূরা আন নূর

সূরা আল ফোরকান

সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড

সূরা আন নামল

সূরা আল কাছাছ

সূরা আল আনকাবুত

সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড

সূরা লোকমান

সূরা আস সাজদা

সূরা আল আহ্‌যাব

সূরা সাবা

১৭তম খন্ড

সূরা ফাতের

সূরা ইয়াসিন

সূরা আছ ছাফফাত

সূরা ছোয়াদ

সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড

সূরা আল মোমেন

সূরা হা-মীম আস সাজদা

সূরা আশ শূ-রা

সূরা আয যোখরুফ

সূরা আদ দোখান

সূরা আল জাছিয়া

سيّد قطب
في ظلال القرآن
باللغة البنغالية
المجلد الثانى
ترجمة القرآن
حافظ منير الدّين أحمد
AL-QURAN ACADEMY LONDON
إكاديمية القرآن لندن